বিশ্বভারতী • শ্রীনিকেতন

COMPLEMENTARY COPY

শিক্ষাসত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

বিশ্বভারতী • শ্রীনিকেতন

প্রকাশ : ১ জুলাই ২০০২

সংকলন ও সম্পাদনা : রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, চন্দনকুমার দাস, অম্বুজানন্দ রায়, অশোককুমার বাজারী

প্রকাশক : সুনীলকুমার সরকার, কর্মসচিব, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মুদ্রক : শান্তিনিকেতন প্রেস, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সৌরব্রত মুখোপাধ্যায় ও অম্বুজানন্দ রায়

দাম : পঞ্চাশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন সমিতি
শান্তিনিকেতন
বীরভূম

শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী
শ্রীনিকেতন
বীরভূম

সূচিপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড : ১-১৩২

চিত্রসূচী

তৃতীয় খণ্ড : ১৩৩-২১৪

প্রসঙ্গ : আলোচনা-চক্র

বিষয় : আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।

প্রাক্‌কথন

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা তাঁর জীবনভাবনারই অঙ্গীভূত। কবির সেই জীবনভাবনাকে সঠিকভাবে আত্মস্থ ক'রতে গেলে একদিকে যেমন কবির সুদীর্ঘ জীবনের বৈচিত্র্যনির্ভর সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক হ'তে হবে, অন্যদিকে তেমনই মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে কবির নির্দেশিত পন্থা-পদ্ধতি সম্বন্ধেও আমাদের সম্যক ধারণা থাকা চাই। যৌবনে পিতার নির্দেশে পূর্ববঙ্গের জমিদারী পরিদর্শনের মুহূর্ত থেকে শুরু ক'রে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশক ধ'রে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি মানুষের সম্মানজনক অবস্থান সম্পর্কে কবির নিরলস সন্ধান ও সংগ্রাম। পূর্ববঙ্গে পুত্রকন্যাদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনে গৃহবিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় যার সূত্রপাত, শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়কে অবলম্বন ক'রে শিক্ষাসত্রে তার পরিণততর রূপ। তৎকালীন আশ্রমবিদ্যালয় বা একালের পাঠভবন সম্পর্কে শিক্ষিত শহুরে মানুষের কৌতূহল-নিবৃত্তির সুযোগ থাকলেও শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান অত্যন্ত লজ্জাজনক। শিক্ষাসত্র তথা শ্রীনিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সাগ্রহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের নিদর্শন-স্বরূপ কিছু-কিছু লেখালেখির সন্ধান পাওয়া যায় : রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত সেইসব রচনা এতকাল পণ্ডিত-গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হ'য়ে থাকলেও সাধারণ পাঠকের কাছে তা ছিল দুষ্প্রাপ্য। সংরক্ষিত রচনাদি অনুসন্ধানের কাজ চ'লছিল দীর্ঘদিন ধ'রেই : ষষ্টিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম শিক্ষাসত্র-সম্পর্কিত যে সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি তারই পরবর্তী সংস্করণ। এই সংস্করণে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীতে আয়োজিত আলোচনা-চক্রের বিভিন্ন বক্তার ভাষণগুলিও প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী ভেবে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে।

আমি জানি, দেশে-বিদেশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা গুরুদেবের শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিপূরক রূপ শ্রীনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অন্তর্গত শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে জানতে সমান আগ্রহী। এই গ্রন্থে সেইসমস্ত কৌতূহলী অথচ শ্রদ্ধাবান পাঠকের জিজ্ঞাসার নিরসন হবে এই বিশ্বাস আমার আছে।

সবশেষে শিক্ষাসত্রের সেইসব অত্যুৎসাহী তরুণ অধ্যাপক কর্মীকে সাধুবাদ জানাই যাঁদের আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'ল।

২ জুন ২০০২

সুজিতকুমার বসু
উপাচার্য

নিবেদন

১৯৭৪ সালের পয়লা জুলাই শিক্ষাসত্রের পঞ্চাশদ্‌-বর্ষপূর্তি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। জন্মের পঞ্চাশ বছর পরে সেই প্রথম ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট শিক্ষাসত্র নামক বিদ্যালয়টিকে জনসমক্ষে আনার চেষ্টা করা হয়। তার আগে রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নজরে এলেও তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে উপেক্ষিতই ছিল।

এরপর ১৯৮৪ সালে পয়লা ও দোসরা জুলাই— দুদিন ধরে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষাসত্রের ষষ্টিবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে পল্লী, পল্লীর সেইসব মানুষের শিক্ষা— ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনাচিন্তা ছাড়াও সেকালের বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষের বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখিও সংকলিত হয়। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কবির 'A Poets School' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধের পাশাপাশি এল্‌ম্‌হার্স্ট, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, প্রেমচাঁদ লাল, কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রচনাও স্থানলাভ করে।

সেই গ্রন্থটি নিঃশেষিত হওয়ায় তা পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ ষষ্টিবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সেই গ্রন্থেই প্রথম শিক্ষাসত্রকে ঐতিহাসিকভাবে জানার চেষ্টা করা হয়। সময়াভাবে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে বর্ষব্যাপী পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উৎসবের শুরুতে মাত্র চারটি ইংরেজী প্রবন্ধ নিয়ে Siksha-Satra (vol-I) প্রকাশিত হয়। তারপর পূর্বতন গ্রন্থটির বাকি অংশ পুনর্মুদ্রণের মুহূর্তে নূতন কিছু রচনা সংযোজন করা হয় ও মুদ্রিত কিছু রচনা বর্জিত হয়। সেই হিসাবে স্মৃতিচারণ-মূলক রচনাগুলি বাদ দেওয়া হয় এবং আরও তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা (যার মধ্যে একটি বেশ দুষ্প্রাপ্য) নিয়ে শিক্ষাসত্র দ্বিতীয় খণ্ড পরিকল্পিত হয়।

পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষে যে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার বিষয়বস্তু ছিল 'আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।' সভায় কথিত ও পঠিত ভাষণগুলি 'শিক্ষাসত্র' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের অতিরিক্ত সংযোজন।

'শিক্ষাসত্র' রবীন্দ্রনাথের পরিণত শিক্ষাভাবনার বাস্তব রূপায়ণ— এর গুরুত্বটি ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। প্রথমে জমিদারি-পরিদর্শনকালে শিলাইদহ অঞ্চলে গৃহবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, তারপর তৎকালীন আশ্রমবিদ্যালয় বা একালের পাঠভবন এবং সবশেষে শিক্ষাসত্র— কবির এই যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও সাধনা, সেখানে শিক্ষাসত্রের যথার্থ ভূমিকাটি কী— কবির শিক্ষাভাবনায় শিক্ষাসত্রের গুরুত্বই-বা কতখানি তা আজও সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে পাঠভবনের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেলেও শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে পল্লী ও শহরের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের উদাসীনতা অত্যন্ত দুঃখের ও দুর্ভাগ্যজনক।

সেদিন পল্লীর মানুষের কথা ভেবে শিক্ষাসত্র স্থাপিত হয়েছিল। পল্লীর সেইসব মানুষের প্রতি শিক্ষাভিমানী শহুরে মানুষের অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার ভাবটি ভূয়োদর্শী শিক্ষাবিদ্‌ লক্ষ্য ক'রে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন :

> 'যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত, সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক ক'রে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয় নি। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ ক'রতে আসেন তাঁদের বলি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয়, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প। ওদের মনের মত ক'রে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা ক'রলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি।......'

এই বিশ্লেষণ থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মানবদরদী কবির শিক্ষাভাবনা তাঁর জীবনভাবনারই অঙ্গীভূত।

সেই হিসাবে কোনও বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নয়— অথবা পাঠভবনের সঙ্গে তুলনায় শিক্ষাসত্রের গুরুত্বকে খাটো ক'রে দেখলে তা ঐতিহাসিকভাবে সংগত হবে না।

শিক্ষাসত্র তথা শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে অগণিত শ্রদ্ধাবান ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের কথা ভেবে বিভিন্ন চিন্তাশীল মানুষের বিশ্লেষণধর্মী মুদ্রিত রচনা,— যার অনেকটাই প্রাচীন পত্রপত্রিকায় লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে— দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এই সংকলনগ্রন্থে পরিবেশন করা হ'ল। যাদের কথা ভেবে এই গ্রন্থের পরিকল্পনা, রবীন্দ্রানুরাগী সেইসব মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে ব'লে আমরা মনে ক'রব।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অধ্যাপক শ্রীসুমন সরকার, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রীসুবোধগোপাল নন্দী, শিক্ষাসত্রের অধ্যাপিকা শ্রীঅদিতি বসু গ্রীষ্মাবকাশে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তার জন্যে আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিশ্বভারতী প্রেসের সর্বস্তরের নিরলস কর্মীদের হার্দিক সহযোগিতায় যেভাবে গ্রন্থটির দ্রুত প্রকাশ সম্ভব হয়েছে, তার জন্যে আমরা তাঁদেরকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

শিক্ষাসত্র, বিশ্বভারতী
২৫ জুন,২০০২

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
অম্বুজানন্দ রায়

শিক্ষাসত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

বৈশাখ ১৩২৬

বিশ্বভারতী

... সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমোরের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্র. বৈশাখ ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪ সালে

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

প্রবন্ধ ও পত্রাবলী
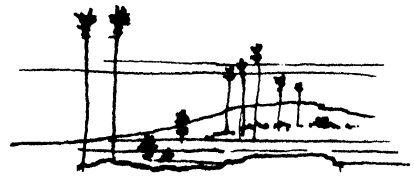
শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ

আমার যা বলবার ছিল তা অনেকবার বলেছি, কিছু বাকি রাখি নি। তখন শরীরে শক্তি ছিল, মনে ভাবের প্রবাহ ছিল অবারিত। এখন অস্বাস্থ্য ও জরাতে আমার শক্তিকে খর্ব করেছে, এখন আমার কাছে তোমরা বেশি কিছু প্রত্যাশা কোরো না।

আমি এখানে অনেক দিন পরে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়— আমার উপস্থিতি ও সঙ্গমাত্র তোমাদের দিতে পারি। প্রথম যখন এই বাড়ি কিনলুম তখন মনে কোনো বিশেষ সংকল্প ছিল না। এইটুকু মাত্র তখন মনে হয়েছিল যে, শান্তিনিকেতন লোকালয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন। দূর দেশ থেকে সমাগত ভদ্রলোকের ছেলেদের পাস করবার মতো বিদ্যাদানের ব্যবস্থা সেখানে আছে, আর সেই উপলক্ষে শিক্ষাবিভাগের বরাদ্দ কিছু বেশি দেবার চেষ্টা হয় মাত্র।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই-সব পল্লীতে যখন বাস করতুম তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। এক দিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির— আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।

আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হ'তে হ'ল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম হিসাবপত্র, খাজনা-আদায়, জমা-ওয়াশীল— এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলুম না ; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে প'ড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন ক'রে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময় আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ ক'রে রহস্য উদঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা ক'রে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র এমন ভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে ব্যক্তি বালককাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথ-নির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম ততদিন তাকে তন্ন তন্ন ক'রে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদীনালা-বিলের মধ্য দিয়ে— তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে— মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখদৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল, তার জন্যে কিছু ক'রব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্‌-বৃত্তি ক'রে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী ক'রলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী ক'রলে এদের মধ্যে জীবনসঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, ক'ষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'

আমি সেখানে থাকতে একদিন পাশের গ্রামে আগুন লাগল। গ্রামের লোকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল, কিছু করতে পারে না। তখন পাশের গ্রামের মুসলমানেরা এসে তাদের আগুন নেবালো। কোথাও জল নেই, তাদের ঘরের চাল ভেঙে আগুন নিবারণ করতে হ'ল।

নিজের ভালো তারা বোঝে না, ঘর ভাঙার জন্য আমার লোকেরা তাদের মারধর করেছিল। মেরে ধ'রে এদের উপকার করতে হয়।

অগ্নিকাণ্ড শেষ হয়ে গেলে তারা আমার কাছে এসে ব'ললে, 'ভাগ্যিস বাবুরা আমাদের ঘর ভাঙলে, তাই বাঁচতে পেরেছি।' তখন তারা খুব খুশি, বাবুরা মারধর করতে তাদের উপকার হয়েছে তা তারা মেনে নিল, যদিও আমি সেটাতে লজ্জা পেয়েছি।

আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম, এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে; খবরের কাগজ, রামায়ণ-মহাভারত পড়া হবে; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হ'ত; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের কেউ পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

ঘর বাঁধা হ'ল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হ'ল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না।

তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, 'ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।'

এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনও থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে, নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে পরের উপর নির্ভর করবার ব্যবস্থা চলে আসছে। একজন সম্পন্ন লোক গ্রামের পালক ও আশ্রয়; চিকিৎসা, শিক্ষার ভার, তাঁরই উপর ছিল। এক সময় এই ব্যবস্থার আমি প্রশংসা করেছি।

যারা ধনী, ভারতবর্ষের সমাজ তাদের উপর এইভাবে পরোক্ষ ট্যাক্স বসিয়েছে। সে ট্যাক্স তারা মেনে নিয়েছে; পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, মন্দিরনির্মাণ, তারাই করেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিজের সম্পত্তির সম্পূর্ণ ভোগ নিজের ইচ্ছামত করতে পারে নি। কিন্তু ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতিতে এর কোনো বাধা নেই। গ্রামের এই-সব কর্তব্য-সম্পাদনেই ছিল তাদের সম্মান; এখনকার মতো খেতাব দেওয়ার প্রথা ছিল না, সংবাদপত্রে তাদের স্তবগান বেরোত না। লোকে খাতির করে তাদের বাবু বা মশায় বলত, এর চেয়ে বড়ো খেতাব তখন বাদশা বা নবাবরাও দিতে পারত না। এই রকমে সমস্ত গ্রামের শ্রী নির্ভর করত সম্পন্ন গৃহস্থদের উপর। আমি এই ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি, কিন্তু এ কথাও সত্য যে এতে আমাদের স্বাবলম্বনের শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।

আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে, আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে, 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে— ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চ'লে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব!'

আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু ক'রে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পারো।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড় কঠিন।

আমাদের সমাজে যারা দরিদ্র তারা অনেক অপমান সয়েছে, যারা শক্তিমান তারা অনেক অত্যাচার করেছে, তার ছবি আমি নিজেই দেখেছি। অন্য দিকে এই-সব শক্তিমানেরাই গ্রামের সকল পূর্তকাজ করে দিয়েছে। অত্যাচার ও আনুকূল্য এই দুইয়ের ভিতর দিয়ে পল্লীবাসীর মন অসহায় ও আত্মসম্মানহীন হয়ে পড়েছে। এরা মনে করে এদের দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল, আবার জন্মান্তরে ভালো ঘরে জন্ম হ'লে তাদের ভালো হতে পারে, কিন্তু বর্তমান জীবনের দুঃখদৈন্য থেকে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। এই মনোবৃত্তি তাদের একান্ত অসহায় ক'রে তুলেছে।

একদিন ধনীরা জলদান, শিক্ষার ব্যবস্থা, পুণ্য কাজ ব'লে মনে করত। ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল। যেই তারা গ্রাম থেকে শহরে বাস করতে আরম্ভ করেছে অমনি জল গেল শুকিয়ে, কলেরা ম্যালেরিয়া গ্রামকে আক্রমণ করলে, গ্রামে-গ্রামে আনন্দের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আজকার গ্রামবাসীদের মতো নিরানন্দ জীবন আর কারও কল্পনাও করা যায় না। যাদের জীবনে কোনো সুখ কোনো আনন্দ নেই তারা হঠাৎ কোনো বিপদ বা রোগ হলে রক্ষা পায় না। বাইরে থেকে এরা অনেক অত্যাচার অনেক দিন ধরে সহ্য করেছে। জমিদারের নায়েব, পেয়াদা, পুলিস, সবাই এদের উপর উৎপাত করেছে, এদের কান মলে দিয়েছে।

এই-সব কথা যখন ভেবে দেখলুম তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম। মনে করতুম তাঁকে বাঁচাতে পারব না।

আমি কখনও গ্রামের লোককে অশ্রদ্ধা করি নি। যারা পরীক্ষায় পাস ক'রে নিজেদের শিক্ষিত ও ভদ্রলোক

মনে করে তারা এদের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ। শ্রদ্ধা করতে তারা জানে না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, দিতে যদি হয় তবে শ্রদ্ধা ক'রে দিতে হবে।

এই রকমে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলুম। কুঠিবাড়িতে বসে দেখতুম, চাষীরা হাল-বলদ নিয়ে চাষ করতে আসত; তাদের ছোটো-ছোটো টুকরো-টুকরো জমি। তারা নিজের নিজের জমি চাষ ক'রে চলে যেত, আমি দেখে ভাবতেম— অনেকটা শক্তি তাদের অপব্যয় হচ্ছে। আমি তাদের ডেকে বললুম, 'তোমরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করো; সকলের যা সম্বল আছে, সামর্থ্য আছে তা একত্র করো; তাহলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে তোমাদের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একত্র কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায়-আসে না; যা লাভ হবে তা তোমরা ভাগ করে নিতে পারবে। তোমাদের সমস্ত ফসল গ্রামে এক জায়গায় রাখবে, সেখান থেকে মহাজনেরা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে।' শুনে তারা বললে, খুব ভালো কথা, কিন্তু করবে কে? আমার যদি বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকত তা হ'লে বলতুম, আমি এই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। ওরা আমাকে জানত। কিন্তু উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না। অশিক্ষিত উপকারের মতো এমন সর্বনেশে আর-কিছুই নেই। আমাদের দেশে এক সময় শহরের যুবক ছাত্রেরা গ্রামের উপকার করতে লেগে গিয়েছিলেন। গ্রামের লোক তাদের উপহাস করত; বলত, 'ঐ রে চার-আনার বাবুরা আসছে!' কী ক'রে তারা এদের উপকার করবে— না জানে তাদের ভাষা, না আছে তাদের মনের সঙ্গে পরিচয়।

তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে, পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে। এইরকম নানা ভাবে চেষ্টা ও চিন্তা করতে লাগলুম।

ঠিক সেই সময় এই বাড়িটা কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম, শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি, এখানেও তাই করব। ভাঙা বাড়ি, সবাই বলত ভুতুড়ে বাড়ি। এর পিছনে আমাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তার পর কিছুদিন চুপ করে বসেছিলুম। অ্যাণ্ড্রুজ বললেন, 'বেচে ফেলুন।' আমি মনে ভাবলুম, যখন কিনেছি, তখন তার একটা-কিছু তাৎপর্য আছে— আমার জীবনের যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে। কবে হবে, কেমন ক'রে হবে, তখন তা জানতুম না। অনুর্বর ক্ষেত্রে বীজ পড়লে দেখা যায় হঠাৎ একটি অঙ্কুর বেরিয়েছে, কোনো শুভলগ্নে। কিন্তু তখন তার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নি। সব জিনিসেরই তখন অভাব। তার পর, আস্তে-আস্তে বীজ অঙ্কুরিত হতে চলল।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্ আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হ'ত না। এল্‌ম্‌হার্‌স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।

সব-শেষে একটি কথা তোমাদের বলতে চাই— চেষ্টা করতে হবে যেন এদের ভিতর থেকে, আমাদের অলক্ষ্যে একটা শক্তি কাজ করতে থাকে। যখন আমি 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন এই কথাটি আমার মনে জেগেছিল। তখন আমার বলবার কথা ছিল এই যে, সমগ্র দেশ নিয়ে চিন্তা করবার দরকার নেই। আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোটো গ্রাম। এদের মনকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো

আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনও সেই কথা মনে হচ্ছে।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে. গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি ক'রে দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হ'লেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

১৩৪৬
শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

পল্লীসেবা

ইউরোপ নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই ইউরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হ'য়ে চ'লছে। কিন্তু এটা লক্ষ্য ক'রতে হবে যে,শহর ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে, শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ ক'রতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ্য করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের যা-কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে-গ্রামে— শিক্ষার জন্য, আরোগ্যের জন্য, শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হ'ত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল তা গ্রামে-গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল তা ছিল হাতের কাছে, বৈদ্য-কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী, আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল, একটা বড় ইমারতের মধ্যে বদ্ধ ক'রে বিদেশী ব্যাকরণের নিয়মের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের পরিচালিত করবার রীতি ছিল না। সংস্কৃতি-সম্পদ যা ছিল তা সমস্ত দেশের মনোভূমিকে নিয়ত উর্বরা ক'রেছে— পল্লী ও শহরের মাঝখানে এমন কোনো ভেদ ছিল না যার খেয়াপার করবার জন্য বড়-বড় জাহাজ প্রয়োজন। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না, শিক্ষা আনন্দ সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রলে তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হ'ল। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ-বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হ'তে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হ'তে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে। দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

... যে জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক্ ক'রে রাখা হ'য়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয়নি, পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলছেন, তাঁরা জ্ঞানের এমন পংক্তিভেদ কোথাও করেন নি, পরিবেশনের পাতা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ ক'রতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মত ক'রে যা-হয়-একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা ক'রলেই চ'লবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই-যে প্রকাণ্ড বিভেদ এ'কে দূর ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কী পল্লী কী নগর, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে— সর্বসাধারণের কাছে সুগম ক'রে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত-প্রেত-ওঝা, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনোরকম আয়োজন ক'রলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার

ভেদ থেকে। মন অহংকৃত হয়; বলে, 'ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা ক'রব দূর থেকে, উপর থেকে।' এর ফলে অনেক সময় শিক্ষিত পল্লীহিতৈষীরা চাষীদের কাছে এমন-সব বিষয়ে মুখস্থ-করা উপদেশ দিতে আসেন, হয়তো যে বিষয়ে চাষীরা তাঁদের চেয়ে ভালোই জানে।...

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীদের কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান ক'রো না, যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত ক'রতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হ'তে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে-গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড় দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি, কিন্তু এ-ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দ'বি মেটাতেই হবে।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই ক'খানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা ক'রেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল ক'রেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড় আদর্শ, বড় উদ্দেশ্য আছে, তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই; এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০
শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

আমার আদর্শ

ছোটবেলায় আর পাঁচজনের মত আমাকেও ইস্কুলে পাঠানো হয়। ইস্কুলে ছাত্রজীবনের সূচনায় কী দুর্বিপাক ঘটেছিল তা হয়তো আপনারা কেউ-কেউ আমার জীবনস্মৃতির অনুবাদ প'ড়ে জেনেছেন। সে এক অত্যন্ত শোচনীয় জীবন, আমার পক্ষে তা একেবারে অসহনীয়। কেন যে পীড়া বোধ ক'রছি তার কারণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা সে সময় আমার ছিল না। যখন বড় হ'লুম তখন পরিষ্কার বুঝতে পারলুম বাবা মা আমায় যে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন সেখানে বাধ্য হ'য়ে ক্লাশে ব'সে থাকতে অত্যন্ত মর্মান্তিক কষ্ট কেন পেতেম।

স্বভাবতই আমি ভালবাসি জীবনকে, ভালবাসি প্রকৃতি আর যেখানে আমার আপনজনেরা র'য়েছেন সেই পরিবেশটিকে। এই যে স্বাভাবিক পরিবেশটির সঙ্গে আমার অন্তরের নিবিড় যোগ সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমায় পাঠানো হ'ল নির্বাসনে ইস্কুলের ক্লাশ ঘরে, সেখানকার সাদা ন্যাড়া দেয়ালগুলোর মরা চাউনি প্রতিদিন আমায় ভয় দেখাত। আমার মনে হয়, ওই দেয়ালগুলোর মাঝখানে গিয়ে পড়াটা স্বাভাবিক নয়। এ হ'ল জীবন থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া একটা টুকরো। এই কারণেই অত্যন্ত কষ্ট পেতেম। কারণ আমায় নিজের জগৎ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেখানে পাঠানো হ'ত, সে এক মৃত, অকরুণ সঙ্গতিহীন অসহ্য একঘেয়ে পরিবেশ।

এই নিষ্পাপ ছকবাঁধা পরিবেশে কোনো শিশুমন কখনো কিছু গ্রহণ ক'রতে পারে না। আর শিক্ষকরা সজীব গ্রামোফোনের মত প্রতিদিন একই পড়া অত্যন্ত নীরসভাবে আউড়ে যেতেন। আমার মন আমার শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো কিছুই নিতে চাইত না। আমার সামনে যা-কিছু ধরা হ'ত সে-সবই আমি গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে ফিরিয়ে দিতেম। কোনো-কোনো শিক্ষক আবার একেবারেই সহানুভূতিহীন: তাঁরা ছোট ছেলের সংবেদনশীল মনটি মোটেই বুঝতেন না, নিজেদের অপরাধের জন্যে শাস্তি দিতে চাইতেন ছাত্রদেরই। এই সব নির্বোধ শিক্ষকেরা জানতেন না কীভাবে পড়াতে হয়, কী ক'রে শেখাতে হয় একটি সজীব মনকে। নিজেদের ব্যর্থতার জন্যে তাঁরা ভুক্তভোগীদেরই শাস্তি দিতেন। ইস্কুল-জীবনের বছরগুলিতে আমি এইভাবে কষ্ট পেয়েছি।

তেরো বছর বয়সে আমি ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করি। বড়দের হাজার চাপ সত্ত্বেও আমি ইস্কুলে প'ড়তে যাই নি।

তারপর থেকে আমি নিজেই শিক্ষালাভ ক'রেছি, সে প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত র'য়েছে। আমি যা-কিছু শিখেছি সে সবই ক্লাসের বাইরে। অল্প বয়সেই ইস্কুল মাস্টারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি— এ ঘটনাকে আমি নিজের জীবনের একটি সৌভাগ্য ব'লে মনে করি। পরবর্তী জীবনে যা-কিছু ক'রেছি, যদি কোনো বিশেষ স্বকীয়তা দেখিয়ে থাকি তবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার কারণ হ'ল কোনও শিষ্ট শিক্ষার জাঁতাকলে আমি পিষ্ট হইনি— সাধারণত সব ভালো ছেলে, ভালো ছাত্রকে যা মেনে নিতে হয়।

... আমাদের শিশুদের জন্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার সাহসও আমার কী ক'রে হ'ল, সে-ও আমার কাছে একটা বিস্ময়, কারণ এ বিষয়ে আমার কোনোই অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস ছিল। আমি জানতেম শিশুদের প্রতি গভীর দরদ আমার আছে; তাদের মনটাকে যে আমি জানি সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত ছিলেম। মনে হ'ল, মামুলি যে শিক্ষকেরা— তাঁদের প্রয়োজনীয় তালিম আছে— এই মোহয় ভুগতেন, তাঁদের চেয়ে শিশুদের আমি বেশি সাহায্য ক'রতে পারব।

বেছে নিলেম একটি সুন্দর জায়গা। ... সেইখানে কা .কটি শিশুকে জুটিয়ে আমি পড়াতে থাকি। আমি ছিলেম

তাদের সঙ্গী। তাদের গান শুনিয়েছি। রচনা ক'রেছি সঙ্গীত অপেরা, নাটক, সেই নাটকে তারা অভিনয় ক'রেছে। আমাদের মহাকাব্যগুলি প'ড়ে শুনিয়েছি তাদের। এইভাবেই শুরু হয় এই ইস্কুল। তখন ছাত্র ছিল কেবল পাঁচ-ছ'য়টি।

কবির উপর লোকের ভরসা ছিল না, শিশুদের মানুষ ক'রে সনাতন রীতিতে তাদের ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার কাজে আমার দক্ষতায় সন্দেহ করার অধিকার তাঁদের ছিল বৈকি। তাই আরম্ভে খুব কম ছাত্রই পাই।

... সংক্ষেপে আমার আদর্শ ছিল এই— শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হ'তে হবে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক নির্বস্তুক কিছুতে পরিণত হওয়া তার উচিত নয়। তাই শিশুদের আমার কাছে এনে তাদের সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ দিলেম। তাদের ইচ্ছামত সবকিছু করারই স্বাধীনতা ছিল। যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা তাদের দিয়েছিলেম। সবসময় চেষ্টা ক'রেছি তাদের সব কাজে এমন কিছু তুলে ধরতে যা তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক।

চেষ্টা ক'রেছি তাদের মনে সবকিছু সম্বন্ধেই ঔৎসুক্য জাগাতে— প্রকৃতির সৌন্দর্যে, আশপাশের গ্রামে, অভিনয়ের মাধ্যমে সাহিত্যে, সঙ্গীতে। প্রকৃতির রাজ্যের সবকিছু দিয়ে, শুধু ক্লাসের পড়া দিয়ে নয়, পর্যবেক্ষণ ও সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে।

আমি যখন নাটক লিখতেম কতদূর লেখা হ'ল, কীভাবে নাটকটা এগোচ্ছে, সে বিষয়ে গভীর ঔৎসুক্য জাগত তাদের। নাটকের মহড়ার সময় তারা বারবার নাটক প'ড়ত, তাই তারা ব্যাকরণ-পাঠ আর ক্লাসের পড়ার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান পেত। এই ছিল আমার পদ্ধতি। শিশুদের মন আমি জানতেম। তাদের সচেতন মনের চেয়ে অবচেতন মনই বেশি সক্রিয়। তাই সবচেয়ে বড় কথা হ'ল তাদের নানা রকমের কাজকর্মে টেনে আনা যা তাদের মনকে নাড়া দিয়ে ক্রমশ তাদের মনে চারপাশের জগতের প্রতি ঔৎসুক্য জাগাবে।

শুধু গানের ক্লাস নয়, সন্ধ্যায় গানের আসরও বসত। যে ছেলের গানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না, তারাও কৌতূহলবশত ঘরের বাইরে থেকে আমাদের গান শুনত। ক্রমে তারা এসে বসত ঘরের ভিতর। সংগীতের রুচি গ'ড়ে উঠত তাদের।...

সবচেয়ে বড় কথা একটা পরিবেশ গ'ড়ে তোলা হ'য়েছিল। এই গ'ড়ে তোলাটা পাঠক্রম গ'ড়ে তোলা নয়, এমন একটা কিছু গ'ড়ে তোলা যা ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে— অর্থাৎ পরিবেশ। তাতে অনেক সময় লেগেছে। প্রথমে সে কাজ সহজ ছিল। তখন অল্প কয়টি ছাত্র, আমিই তাদের প্রায় একমাত্র সঙ্গী ও শিক্ষক।... কিন্তু ক্রমে ছাত্র বাড়ল, সেই সঙ্গে আমার শিক্ষাদর্শ-অনুযায়ী ইস্কুল চালাবার খরচাও। তখন একাজ খুব কঠিন হ'ল। প্রথমত, আমাদের দেশের এই একটা ঐতিহ্য ছিল যে আগত শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব গুরুর, গুরুগৃহে তারা বিনামূল্যে থাকবে, খাবে, বিদ্যালাভ ক'রবে। কারণ গুরুরাই স্বেচ্ছায় তাঁদের এ দায়িত্ব মেনে নিয়েছিলেন। জ্ঞানলাভের সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন সমাজের কাছ থেকে, তাই সমাজের কাছে নিজ শিষ্যদের সহায়তা করার দায় ছিল তাঁদের আর তার জন্যে কোনোরকম বেতন বা প্রতিদান নেওয়া চ'লত না।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের এই রীতি চ'লে আসছে। আমিও এইপথেই শুরু করি। প্রথমে মাইনে আর থাকা-খাওয়ার খরচ লাগত না, আমিই আমার দীন সম্বল থেকে তাদের খরচা মেটাতেম। কিন্তু বোঝাই যায় এযুগের জীবনে এভাবে চলা সম্ভব নয়, কারণ অন্য শিক্ষক রাখতে হ'লে তাঁদের মাইনে দিতে হবে, অন্য খরচও আছে। আমার পক্ষে তা মেটানো অসম্ভব হ'য়ে উঠল। ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়াটা যে শিক্ষকেরই দায়িত্ব, তাতে লেনদেন আর দোকানদারি, টাকা দিয়ে জিনিস কিনছি এই ভাবের কিছু থাকবে না— এই আদর্শ আর বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হ'ল না। সে আদর্শকে বাধ্য হ'য়েই বিসর্জন দিতে হ'ল আর আমার বিদ্যালয় ক্রমেই একটি সাধারণ ইস্কুল হ'য়ে উঠল।

কেবল চেষ্টা করলেম এই ইস্কুলে এমন কিছু যেন থাকে যা চলতি ইস্কুলে পাওয়া যাবে না। শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে একই জীবনযাপন ক'রতেন। গ'ড়ে উঠল একটা গোষ্ঠিজীবন, খেলাধূলায় উৎসবে সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষক-ছাত্ররা

মিলেমিশে যোগ দিতেন। খাঁচার মত নয়, যেখানে বাইরে থেকে খাবার জোগানো হয় পাখিকে, বরং বলা উচিত একটা নীড়ের মত। ছাত্ররা নিজেরাও গ'ড়ে তুলল তাদের জীবনযাত্রা, ভালবাসা, প্রতিদিনের কাজ, তাদের খেলাধূলা প্রভৃতি যা-কিছু এই বিদ্যালয়কে গ'ড়ে তুলতে পারে তা দিয়ে। প্রতিষ্ঠানের এইটেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

আদর্শটা এখনও আছে, যদিও ঘটনাচক্র ও যুগধর্মে জীবনের সঙ্গে তার কিছু বিচ্ছেদ ঘটেছে। তবু আমার ধারণা একটি পরিবেশ গ'ড়ে উঠেছে আর তা এখনও বজায় র'য়েছে। বিদ্যালয় এখন বড় হ'য়েছে। ছাত্র-সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে, অবশ্য সেটা যে সবসময় ভালো তা নয়। কিন্তু উপায় নেই।

পরে আরেকটি দিক দেখা দিয়েছে, মেয়েদের সংখ্যা বেশ বেড়েছে।... এই কো-এডুকেশনের ব্যবস্থাটিও ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নোতুন ব্যাপার। কিন্তু তা নিখুঁতভাবেই কাজ ক'রছে। অভিযোগের কোনো কারণ আমাদের ঘটে নি।...

আরেকটি জিনিসও আমি প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি। আমি সবসময় চেষ্টা করি দেশের বাইরে থেকেও— ইউরোপ থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে গিয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করার। এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকেও তা ক'রতে পারলে ভালো হ'ত। বিদ্যালয়ের পরিবেশের এটিও একটি অঙ্গ। এই বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে আমাদের ছেলে-মেয়েদের ব্যবহার খুবই সহজ স্বাভাবিক। আমার আদর্শ হ'ল— মনের সর্বপ্রকার মুক্তি। আমাদের ছেলেবেলাকার শিক্ষার ফলে আমরা স্বদেশ, স্বজাতি, আমাদের মহাপুরুষ আর ইতিহাস আর কুসংস্কারকে একধরণের বেড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছি। বড় হ'য়েও তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়, এমনকি আমাদের ইস্কুলপাঠ্য বইগুলোতেও তার সোৎসাহ চর্চা চলে, আর সে কাজ করেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা অন্য দেশকে ছোট ক'রে ছেলেদের মনে নিজেদের কীর্তিতে গর্ব জাগাতে চান। এর ফলে আসলে জাতীয়তার নামে কতগুলো কুসংস্কারকেই আঁকড়ে ধরা হয়। বিদেশীদের ডেকে এনে আমি আমার ছেলেদের মনে অতিথিদের প্রতি প্রীতি জাগাতে চেয়েছি, মনে হয় তাতে সফলও হ'য়েছি।

অন্যান্য ধরনের কাজও আছে। আমাদের পাশের গ্রামগুলিতে আদিবাসীদের বাস। তারা আমাদের সাহায্যের প্রত্যাশী। আমরা কয়েকটি সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা ক'রেছি, আমাদের ছাত্ররা সেখানে চাষীদের পড়ায়। তারপর আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামসেবার ব্যবস্থাও আছে। ছেলেরা তার ফলে গ্রামজীবনকে জানতে পারে। কৃষি ও স্বাস্থ্যরক্ষার আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে গ্রামবাসীদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা তারা শেখে। আমার মতে প্রকৃত শিক্ষা হ'ল শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, পূর্ণ জীবনযাপন।

আমাদের ছাত্রদের একটি জিনিস কেবল দিতে পারি নি, তা হ'ল গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। তার কারণ বিপুল খরচ, আমাদের দরিদ্র দেশে তার সংস্থান খুবই কঠিন। আমি এখনও তার ব্যবস্থা ক'রতে পারি নি। আমাদের ছাত্ররা আর আমি এই আশাই পোষণ করি যে, একদিন এ ত্রুটি দূর করা সম্ভব হবে। এই কথাই সব সময় ভাবছি। আমার অর্থাভাব ও দৈন্যসত্ত্বেও কিছু কাজ ক'রতে পেরেছি। আমাদের বিদ্যালয় যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন, গ্রামাঞ্চলে আমরা কী সাহায্য দিতে পেরেছি। কিন্তু গ্রামসেবাই নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছেলেদের পড়াশুনো ও কাজের সঠিক সমন্বয় প্রয়োজন, কারণ গ্রামের কোলেই আমাদের জীবনযাত্রা। তার প্রাপ্য যদি তাকে না দিতে পারি, তবে আমরা নিজেদেরই মারব। সভ্যতা সেটাই ক'রছে, গ্রামকে তার প্রাণরস থেকে বঞ্চিত ক'রছে, তার সবকিছু শুষে নিয়ে চালান দিচ্ছে সোহাগের শহরে।

এই বিশ্বাসবশেই আমার ছাত্রদের আমি এই গ্রামের কাজে টেনে এনেছি। এই কাজ শুরু ক'রেছি কারণ আমার ছাত্রদের পক্ষে গ্রামকে ঠিকভাবে সাহায্য ক'রতে শেখাটা প্রয়োজন। আমার ইস্কুলকে আমি যে আদর্শ মনে রেখে গ'ড়তে চেয়েছি তা সংক্ষেপে এই।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
মস্কোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনাকালে কবির ভাষণ।

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

কবির ইস্কুল

পাশের গ্রামগুলোতে যে আদিবাসীরা থাকে তাদের থেকে কিছু ছাত্র নেবার চেষ্টা ক'রেছিলেম। কিন্তু আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে তাদের রাখা খুবই কঠিন। ছাত্ররা যে আপত্তি করে তা নয়। বরং ঐ ছেলেদের পেয়ে তাদের খুব আনন্দই হ'য়েছিল। কিন্তু তারা (আদিবাসী ছেলেরা) কোনো শৃংখলায় অভ্যস্ত নয়, হয়ত ছোটবেলায় আমি যেমন ছিলেম ওরাও ঠিক সেইরকমই। পড়াশুনা দেখলেই তারা পালাতে চায়। আমার ওখানে যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা পেলেও তা তাদের পছন্দ হয়নি।

কিন্তু পাশের যে গ্রামে আমরা কাজ ক'রছি সেখানে গ্রামবাসীদের জন্য একটি বিশেষ ইস্কুল খোলা হ'য়েছে। এই তফাৎটা কেন ক'রলেম, এ প্রশ্ন আপনারা ক'রতে পারেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের জন্য যে ইস্কুল, গ্রামের ছেলেমেয়েদের কেন সেখানে প'ড়তে দিলেম না? তার কারণ অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকানির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ ক'রে ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন হাতের কাজ এমন কি সংগীত আর শিল্পকলায় তারা সময় নষ্ট ক'রতে চায় না। তারা চায় পড়া মুখস্থ ক'রে কোনোরকমে পাশ ক'রে বেরিয়ে যেতে। আমাকে এ-ব্যাপার কিছুটা মেনে নিতে হ'য়েছে, তা না হ'লে আমার ইস্কুলে একটি ছাত্রও থাকত না। এর একটি কারণ হ'ল, আমাদের দেশ অত্যন্ত দরিদ্র, তাই স্বভাবতই ছেলেরা বড় হ'য়ে জীবিকা অর্জন ক'রে পরিবারের ভরণপোষণ ক'রতে চাইবে। তাদের পরীক্ষা পাশের সুযোগ দিতেই হবে। সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর ইস্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা-কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা ক'রছি। অনতিকাল পরেই এই গ্রামের ইস্কুলটিই সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হ'য়ে উঠবে, অন্যটি তখন পাবে অবহেলা।

১৩সেপ্টেম্বর ১৯৩০
মস্কোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনাকালে কবির ভাষণ।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

[১]

মস্কৌ

কল্যাণীয়েষু

রথী, ...চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প'রে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায়-কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে— জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে— উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হ'য়েছে এর কোনো উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতেই পারে না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকা-নির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম ক'রে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যেসব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নীচের তলায় কাজ ক'রতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

মুশকিল এই, দয়া ক'রে কোনো স্থায়ী জিনিস করা চলে না; বাইরে থেকে উপকার ক'রতে গেলে পদে-পদে তার বিকার ঘটে। সমান হ'তে পারলে তবেই সত্যকার সহায়তা সম্ভব হয়। যাই হোক, আমি ভালো ক'রে কিছুই ভেবে পাইনি— অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ ক'রে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চে তাকাবে, একথা অনিবার্য ব'লে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে।...

প্রত্যেক সমাজের নিজের ভিতরেও এই একই কথা। যে মানুষকে মানুষ সম্মান ক'রতে পারে না, সে মানুষকে মানুষ উপকার ক'রতে অক্ষম। অন্তত যখনই নিজের স্বার্থে এসে ঠেকে তখনই মারামারি কাটাকাটি বেধে যায়। রাশিয়ার একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা-সমাধান করার চেষ্টা চ'লছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয়নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে প'ড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হ'চ্ছি। আমাদের সকল সমস্যার সব চেয়ে বড় রাস্তা হ'চ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত— ভারতবর্ষ তো প্রায় সম্পূর্ণই বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কী আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হ'চ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হ'য়ে না থাকে, এজন্যে কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত-রাশিয়ার জন্যে নয়— মধ্য-এশিয়ার অর্ধ-সভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মত বেগে শিক্ষা বিস্তার ক'রে চলেছে— সায়ন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এইজন্যে প্রয়াসের অন্ত নেই। এখানে থিয়েটারে ভালো-ভালো অপেরা ও বড়-বড় নাটকের অভিনয়ে

বিষম ভিড়, কিন্তু যারা দেখছে তারা কৃষি ও কর্মীদের দলের। কোথাও এদের অপমান নেই। ইতিমধ্যে এদের যে দু-একটা প্রতিষ্ঠান দেখলুম সর্বত্রই লক্ষ্য ক'রেছি এদের চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দ। আমাদের দেশের জনসাধারণের তো কথাই নেই, ইংলণ্ডে মজুর-শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা ক'রলে আকাশ-পাতাল তফাত দেখা যায়। আমরা শ্রীনিকেতনে যা ক'রতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই ক'রছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা ক'রে যেতে পারত, তাহ'লে ভারী উপকার হ'ত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা ক'রে দেখি আর ভাবি— কী হ'য়েছে আর কী হ'তে পারত। আমার আমেরিকান সঙ্গী হ্যারি টিম্বর্‌স্ এখানকার স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা আলোচনা ক'রছে— তার প্রকৃষ্টতা দেখলে চমক লাগে— আর কোথায় প'ড়ে আছে রোগতপ্ত অভুক্ত হতভাগ্য নিরুপায় ভারতবর্ষ! কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল— এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে— আমরা প'ড়ে আছি জড়তার পাঁকের মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন।

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলিনে— গুরুতর গলদ আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হ'চ্ছে, শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে। কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনও টেঁকে না— সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তাহ'লে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হ'য়ে, কিম্বা কলের পুতুল হ'য়ে দাঁড়াবে।

আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হ'চ্ছে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। একটুখানি ছিঁটেফোঁটা শেখানো না— গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।... কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া ক'রে এইটে ঘোচানো চাই। সমবায়প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ক'রতে হবে; তারপরে শারীরবিজ্ঞান।

এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ ক'রে কর্মের ভার দেওয়া হ'য়েছে দেখলুম; ওদের আবাসের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানারকম তদারকের দায়িত্ব নেয়, কর্তৃত্ব সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি— কেবলই নিয়মাবলী-রচনা হ'য়েছে, কোনো কাজ হয়নি। তার অন্যতম কারণ হ'চ্ছে, স্বভাবতই পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হ'য়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব-কিছুই উপলক্ষ্য অর্থাৎ হ'লে ভালোই, না হ'লেও ক্ষতি নেই— আমাদের অলস মন জবরদস্ত দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তাছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথিমুখস্থ-বিদ্যাতেই অভ্যস্ত। নিয়মাবলী রচনা ক'রে কোনো লাভ নেই— নিয়ামকদের পক্ষে যেটা আন্তরিক নয়, সেটা উপেক্ষিত না হ'য়ে থাকতে পারে না। গ্রামের কাজ ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আমি যে-সব কথা এতকাল ভেবেছি এখানে তার বেশি কিছু নেই, কেবল আছে শক্তি, আছে উদ্যম, আর কার্যকর্তাদের ব্যবস্থাবুদ্ধি। আমার মনে হয়, অনেকটাই নির্ভর করে গায়ের জোরের উপর— ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ অপরিপুষ্ট দেহ নিয়ে সম্পূর্ণ বেগে কাজ করা দুঃসাধ্য; এখানকার শীতের দেশের লোকের হাড় শক্ত ব'লেই কাজ এমন ক'রে সহজে এগোয়। মাথা গুন্‌তি ক'রে আমাদের দেশের কর্মীরা সংখ্যা নির্ণয় করা ঠিক নয়— তারা পুরো একখানা মানুষ নয়। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

আমাদের সর্বাংশের কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন। এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। অনুমান করি ছেলেদের লেখাপড়া নয় — গোড়া থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া দরকার — বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান। [illegible] ওখানে আমাদের ইলেকট্রিসিটি ও জল দেবার কথা আছে, এই কলযন্ত্রের কাজে ছেলেদের হাত পাকাতে হবে। আমাদের ওখানে যে ছুতোরখানা আছে তাতেও ভাল করে ছেলেদের শিক্ষাপরিধি করা উচিত, ও ছুতোর মিস্ত্রির কাজ — শুধু গাড়ি চালানো নয়, ও যন্ত্রতন্ত্র। কলে তৈরি ছুতোর মাল সব দিলে আমাদের ছেলেদের হাত দুটো থাকে অকেজো, সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে বোঝাবার চাই। সমবায় প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হবে; তার পরে শারীর বিজ্ঞান। এখানকার ছেলেদের মধ্যে বিভাগ করে কর্মের ভার দেওয়া হয়েছে দেখলুম, ওদের আহারের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে, একদল স্বাস্থ্য, একদল ভাণ্ডার ইত্যাদি নানা রকম ব্যবহারের দায়িত্ব নেয়, প্রায় সবই ওদের হাতে, কেবল একজন পরিদর্শক থাকে। শান্তিনিকেতনে আমি চিরকাল এই সমস্ত নিয়ম প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছি — কেবলি [illegible] রচনা হয়েছে কোনো কাজ হয় নি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে ওখানকার পাঠবিভাগের চরম লক্ষ্য হয়েছে পরীক্ষায় পাস করা, আর সব কিছুই উপলক্ষ্য — অর্জিত হলে ভালই, না হলেও ক্ষতি নেই — আমাদের অলস মন সরকারী দায়িত্বের বাইরে কাজ বাড়াতে অনিচ্ছুক। তা ছাড়া শিশুকাল থেকেই আমরা পুঁথি মুখস্থ বিদ্যাতেই অভ্যস্ত, ঐ ছাপা পুঁথির পাতা ছাড়িয়ে যা কিছু জ্ঞান সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষকদের এত বেশি অনাসক্তি যে তারা সেটা মানতে পারে না। বিশ্বভারতী [illegible] কোনো লাভ নেই — ছাত্রদের পক্ষে সেটা আনুষঙ্গিক নয় সেটা উপেক্ষিত না হয়ে থাকতে পারবে না। (শুধু এই কারণেই, তোমার হাতে কো-অপারেটিভ পাঠ ওর কেবল [illegible] মাত্র আটকে পড়ে ছিল, কিছুতেই ছাত্রদের প্রচার লাভ করতে পারল না। অথচ গ্রামের কাজের পক্ষে কো-অপারেটিভ সর্বপ্রধান ভূমিকা, আমাদের বিপুল দৈন্য সমস্যা সমাধানের

রথীন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ
[রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল চিঠির তৃতীয় পৃষ্ঠা]

১৯১৩

[২]

508 W. High St.
Urbana.Ill

কল্যাণীয়েষু,

...তোমাদের ছেলেরা সব্‌জির বাগান ক'রেছে এ খবরটি পেয়ে আমি বড় খুশি হ'য়েছি। আমি যখন ফিরে যাব তখন আশা ক'রছি আমি দেখতে পাব, আমাদের বিদ্যালয়ের চারিদিকের ভূমি প্রসন্ন এবং গাছপালা প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে— তখন আশ্রমের কোথাও কোনো অনাদরের চিহ্ন দেখতে পাব না। ততদিনে তোমাদের রাস্তাগুলি পরিপাটি এবং গাছের তলা পরিষ্কৃত হ'য়ে গেছে। সবচেয়ে আমি আশা ক'রে আছি, আমাদের আশ্রমবাসীদের সমস্ত দৈনিক কর্তব্যগুলি সুবিহিত সুশৃঙ্খল হ'য়ে এসেছে। ছাত্ররা যাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কর্মকে প্রণালীবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে, সেইদিকে তাদের উৎসাহিত ক'রো। বাইরের শাসনে নয়, কিন্তু নিজের কর্তৃত্বে তারা সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা উদ্‌ভাবন ক'রবে এইটেই সবচেয়ে প্রার্থনীয়। কী ক'রলে সবচেয়ে সুব্যবস্থা হ'তে পারে, এই সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই দাও এবং তাদের ব্যবস্থামত চলবার জন্যে তোমরাও প্রস্তুত হও। সমস্ত জিনিস গ'ড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাকো— কেননা এই গ'ড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা, এবং এটা বিশেষভাবে ছাত্রদেরই জন্যে আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে তোমরা কোনো সংকোচ রেখোনা— এই ছাত্র-রাজক শাসন-প্রণালীকে যদি তোমরা পাকা ক'রে তুলতে পার, তবে সে এক মস্ত জিনিস হবে। শিবাজি যেমন তাঁর গুরুর প্রতিনিধি হ'য়ে তাঁর রাজ্যভার ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছিলেন, তেমনি আমাদের ছাত্ররা গুরুর প্রতিনিধি হ'য়ে বিনম্রভাবে যখন শাসন বিস্তার ক'রতে শিখবে তখন আমরা ধন্য হব। প্রথমে অনেক বাধা ও বিশৃঙ্খলতা ঘটতে পারে, কিন্তু তাতে তোমরা ভয় ক'রো না— ভুল ক'রতে দাও, তা হ'লেই ভুল সমূলে নষ্ট হবে। ভুল থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভুলকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়, এ কথা নিশ্চয় মনে জেনো।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র

১৭ মার্চ ১৯২৯

[৩]

কল্যাণীয়েষু,

রথী,

...পাঠভবনের হাতের কাজ, কলের কাজ, ইন্দ্রিয়বোধচর্চা, সামাজিকতা-চর্চা, গৃহসামগ্রীর পারিপাট্য, পরিবেশের সৌষ্ঠবসাধন প্রভৃতির ব্যাপারে যে-সব খরচ অত্যাবশ্যক সেইগুলো জোগাবার জন্যেই আমি বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট্ ফণ্ড্ খুলেছিলুম। ঐ কাজগুলো যেন মনোযোগ বা উপকরণ-অভাবে বন্ধ না থাকে,— এবং যেন ঐচ্ছিকভাবে না হ'য়ে আবশ্যিকভাবে করানো হয়। মাঝে-মাঝে ইংরেজি নাটক অভিনয় ভাষাশিক্ষার পক্ষে উপযোগী এ-কথা যেন মনে থাকে— অবশ্য এই সুযোগে উচ্চারণ এবং অ্যাক্সেন্টের উপর দৃষ্টি রাখা উচিত। অভিনয় উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে শ্রীনিকেতনের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ছেলেদের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা অবশ্যকর্তব্য— এমন কি সাঁওতালপাড়া ও ভুবনডাঙ্গার ছেলেদেরও কোনো-কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে এদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত। গ্রামের অবস্থা পর্যবেক্ষণ শিক্ষায় কালীমোহন যদি ছেলেদের সাহায্য করে, তাহ'লে ভালো হয়— আমি বারংবার ব'লেছি এই শিক্ষা খুবই দরকারি। ১৭ মার্চ ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯

১০ মার্চ ১৯২৯

[৪]

কল্যাণীয়েষু,

তনয়, যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে চাই সেটা মনে রেখো। প্রধান কথাটা হ'চ্ছে ছাত্রেরা যেটুকু শিখবে তার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটুকু প্রকাশ করবার সাধনা প্রতিদিনই করা চাই। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের ভাবাতে হবে। যা কিছু প'ড়েছে সে সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্নোত্তর করানো চাই— এমনকি তারা যদি পুঁথিগত বিষয় সম্বন্ধে সাহস ক'রে প্রতিবাদ ক'রতে পারে তা হ'লেই বুঝব তাদের যথেষ্ট শিক্ষা হ'চ্ছে। জীবনযাত্রার নানা সমস্যা ওদের কাছে উপস্থিত ক'রে তার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করা চাই। তোমাদের নোট বইয়ে এইরকম অনেকগুলি সমস্যা টুকে রেখো। তাছাড়া ওরা শ্রীনিকেতন দেখতে যায়— বাইরে থেকে দেখে, কিন্তু শ্রীনিকেতনের মূল সমস্যাগুলি কী সে তারা জানেই না। সেগুলি তাদের কাছে উপস্থিত ক'রে তাদের কাছে উত্তর চাওয়া উচিত। গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি কোথায়— সমবায়-নীতির মানে কী, আমাদের দেশের পক্ষে কেন তার প্রয়োজন, গ্রামের লোকদের স্বভাবে অভ্যাসে ও রীতিতে কী অভাব আছে যাতে তারা অন্নকষ্টে জলকষ্টে রোগে তাপে মরে যাচ্ছে সে কথা ওরা যাতে বিচারপূর্বক আলোচনা ক'রতে পারে সেটা দেখা চাই। জমিদার প্রজার সম্বন্ধের মধ্যে কোথায় গলদ আছে, তার ফল কী, কী ক'রে তার প্রতিকার হবে, এ সমস্ত কথা এখন থেকেই সুস্পষ্ট ক'রে ওদের চিন্তা করা চাই। মনে রেখো ক্লাসের শিক্ষার চেয়ে এগুলো বড় শিক্ষা।

সিঙ্গাপুরে জাহাজ পৌঁছল। হয়তো নামবার উদ্যোগ ক'রতে হবে। ইতি ১০ই মার্চ ১৯২৯

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত পত্র

৩১ অক্টোবর ১৯৩০

[৫]

... জমিদারির অবস্থা লিখেছিস্। যেরকম দিন আসছে তাতে জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চ'লবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে-মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হ'য়েছে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে ব'সেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হ'য়েছি।...

এদিকে দেশের ইতিহাসে একটু নূতন অধ্যায় দেখা দিয়েছে, অনেক কিছু উলট-পালট হবে। এই সময়ে বোঝা যত হালকা ক'রতে পারব সমস্যা ততই সহজ হবে। জীবনযাত্রাকে গোড়া ঘেঁষে বদল করবার দিন এল। সেটা যেন অনায়াসে প্রসন্ন মনে ক'রতে পারি। যারা যত বেশি নানা জালে জড়িয়ে আছে তারা তত বেশি কষ্ট পাবে। দুঃখের দিন যখন আসে তখন তাকে দায়ে প'ড়ে মেনে নেওয়ার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মেনে নেওয়া ভালো— তাতে দুঃখের ভার কমে যায়, বৃথা ঝুটোপুটি ক'রতে হয় না। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে— এখনি পাচ্ছে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল। নূতন অভ্যাসের সঙ্গে নিজেকে বনিয়ে নেওয়া কিছুই শক্ত নয়, যদি অন্তরের দিকে প্রস্তুত হ'য়ে থাকি, যদি পুরাতনের বাঁধন আপনা হতে আলগা ক'রে দিই— টানাটানি ক'রতে গেলেই বাঁধন হ'য়ে ওঠে ফাঁসি।

... এটা খুব ক'রে বুঝেছি, আমাদের সবচেয়ে বড়ো কাজ শ্রীনিকেতনে। সমস্ত দেশকে কী ক'রে বাঁচাতে হবে ঐখানে ছোট আকারে তারই নিষ্পত্তি করা আমাদের ব্রত। যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এ সম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হ'ত। যাই হোক্, কিছু মাল-মসলা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, দেশে গিয়ে আলোচনা করা যাবে। নিজেদের কথা সম্পূর্ণ ভুলতে হবে; তার চেয়ে বড়ো কথা সামনে এসেছে।

৩১ অক্টোবর ১৯৩০
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

১৯৩০

[৬]

...ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হ'য়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ ক'রতে হবে। তাছাড়া নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষী প্রজাদের 'পরে আর চাপাতে না হয়। একথা আমার অনেকদিনের পুরোনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা ক'রেছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি ক'রতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো, কিন্তু দিনে-দিনে দেখলুম জমিদারি-রথ সে রাস্তায় গেল না— তারপরে যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চ'লল তখন মনের থেকেও সঙ্কল্প সরাতে হ'ল। এতে দুঃখ বোধ ক'রেছি— কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনা শোধ হয় তাহ'লে আর-একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা ক'রব।

আমি যা বহুকাল ধ্যান ক'রেছি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে; আমি পারিনি ব'লে দুঃখ হ'ল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত ক'রেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা র'য়ে গেছে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?...

১৯৩০
প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র

৪ জুন ১৯৩৫

[৭]

শুনলুম, ধীরেন ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছে শান্তিনিকেতনে লণ্ডন ম্যাট্রিক তরানোর একটা খেয়াঘাট বসাবে। শুনে একটুও ভালো লাগছে না— শান্তিনিকেতনের আদর্শ যে ক্রমশই বিগড়ে চ'লেছে এ তারই একটা নিদর্শন— ষোল আনা ইঙ্গবঙ্গ Snobbish ভাবে যে স্বর্গলোক কামনা করে আমাদের মধ্যে সেই নেশা যদি প্রবেশ করে, তাহ'লে কোথায় গিয়ে উত্তীর্ণ হব। কলেজ ব্যাপারটা ক্রমশই শান্তিনিকেতনের মধ্যে বিজাতীয়তার পথ প্রশস্ত ক'রতে ব'সেছে। ব্যারিস্টার মহলের ছেলেদের সাহেবি দীক্ষা দেবার ভার আমাদের নিতে হবে নাকি? যে শিক্ষার শেষ লক্ষ্য বিলাতের দিকে শান্তিনিকেতনে তারি বড় রাস্তা বানাতে হবে? ভবিষ্যতের হাওয়া যদি এই দুরাশার দিকেই বয়, আমি কোনো কথা ব'লব না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই এর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'য়েছে ব'লেই মনে জানব।...

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

Correspondence File L.K. Elmhirst
No.- 1, Letter No.-2

Santiniketan, Dec. 19, 1937

Dear leonard,

You know how for a long time I have been cherishing my hope of establishing an ideal centre of education at Santiniketan— an ideal which is not curtailed to the strictest measure of a *narrow village environment,* which is not specially set apart to be doled out as a famine ration, carefully calculated to be just good for an emaciated life and a dwarfed mentality. It is well known that the education, which is prevalent in our country, is extremely, meagre in the spread of its area and barren in its quality. Unfortunately this is all that is available for us, and the artificial standard set up is proudly considered as respectable. Outside the *bhadralogue* class, pathetic in their struggle for fixing a university label on their name, there is a vast, obscure multitude who cannot even dream of such a costly ambition. With them we have our opportunity if we knew how to use it. There, and there only, can we be free to offer to our country the best kind of all-round culture, not multilated by official dictators. I have generally noticed that when the charitably-minded, city-bred politicians talk of education for the village folk, they mean a little left-over in the bottom of their cup, after diluting it copiously. They are callously unmindful of the fact, that the kind and the amount of the food, that is needful for mental nourishment, must not be apportioned differently according to the social status of those that receive it.

I am therefore all the more keen that Siksha-Satra should justify the ideal I have entrusted to it, and should represent the most important function of Sriniketan, in helping students to the attainment of manhood complete in all its various aspect. Our people need more than anything else a real scientific training, that can inspire in them the courage of experiment and the initiative of mind which we lack as a nation. Sriniketan should be able to provide for its pupils an atmosphere of rational thinking and behaviour, which alone can save them from stupid bigotry and moral cowardliness. I myself attach much more significance to the educational possibilities of Siksha-Satra than to the school and college at Santiniketan which are every day becoming more and more like so many schools and colleges elsewhere in this country: borrowed cages that treat the students' minds as captive birds, whose sole human value is judged according to the mechanical repetition of lessons, prescribed by an educational dispensation foreign to the soil. It would indeed give me great joy if Sriniketan could at last make use of its opportunities to realize my dream, and I would welcome Dhiren with his vigorous masterfulness to rouse up Siksha-Satra to a new course of fruitful adventure. In that case not only will he have my

blessings, but as much guidance as is possible for me to offer him with the last flicker of my life.

With love for you and Darothy,

Affectionately yours,
Rabindranath Tagore

"Educaton specially

Labeled as rural education is not my ideal– Education should be more or less of the same quality for all humanity needful for its Evolution of perfection."

'Labeled' as in the MSS

পরিশিষ্ট ১

প্রসঙ্গপরিচয়

'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধটি 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থের ১ -সংখ্যক বক্তৃতার শেষ দুটি অনুচ্ছেদ। বক্তৃতার তারিখ পাওয়া যায়নি ব'লে রচনা-শেষে 'প্র' কথাটির দ্বারা প্রকাশের তারিখ বোঝানো হ'য়েছে।

'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত এই ভাষণটি প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'পল্লীসেবা' শীর্ষক রচনাটি শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসবে কথিত ভাষণ; প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

'আমার আদর্শ' ও 'কবির ইস্কুল' প্রবন্ধ দুটি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ মস্কোয় ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের কাছে কবির ভাষণের অংশ-বিশেষ। ওই সভায় কবির কাছে জানতে চাওয়া হয় ঃ 'আপনার ছাত্ররা সমাজের কোন্ অবস্থা থেকে এসেছে? চাষী-মজুর প্রভৃতি ঘরের শিশুরা আছে কি?' 'কবির ইস্কুল' প্রবন্ধে কবি ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

'আমার আদর্শ' ও 'কবির ইস্কুল' শিরোনাম দুটি সম্পাদকের।

বর্তমান গ্রন্থের রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা প্রথম পত্রটি 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থেরও প্রথম পত্র। ওই পত্রটি 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের পত্রাবলী অংশের ২ - সংখ্যক পত্র।

'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে উক্ত পত্রের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি বর্জিত হ'য়েছে :

'আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হ'চ্ছে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না— গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।... কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট, সর্বদা কল নাড়াচাড়া ক'রে এইটে ঘোচানো চাই। সমবায়-প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ক'রতে হবে; তারপরে শারীরবিজ্ঞান।'

'রাশিয়ার চিঠি'র সকল সংস্করণে এবং রবীন্দ্ররচনাবলী (বিশ্বভারতী প্রকাশিত) বিংশ খণ্ডের সর্বশেষ মুদ্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি বর্জিত হ'য়েছে ঃ কোনো সংস্করণেই 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে বর্জনের কারণ উল্লেখ করা হয়নি। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে অনুচ্ছেদটি মুদ্রিত আছে।

ব্যক্তিপরিচয়

'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' শীর্ষক বক্তৃতায় যাঁদের কথা উল্লেখিত হ'য়েছে তাঁদের পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল।

কালীমোহন ঘোষ (১৮৮২-১৯৪০) ঃ শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারীতে গ্রামোন্নয়নের কাজ প্রথম শুরু করেন, তখন কালীমোহন প্রধান সহযোগী হিসাবে গুরুদেবের সঙ্গে কাজ ক'রতেন। স্বদেশী কাজকর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের কু-নজরে পড়ায় তিনি শান্তিনিকেতনে চ'লে আসেন ১৯০৮ সালে। পরে শ্রীনিকেতনে গ্রাম-সংগঠনের কাজ শুরু হ'লে কালীমোহন হ'লেন তার প্রধান প্রাণ-পুরুষ।

কবি-পরিকল্পিত পল্লীর পুনর্গঠনকার্যে কালীমোহন ঘোষ ছিলেন কবির প্রথম সহায়ক। কবি ব'লেছেন ঃ 'যারা বহুকাল ধ'রে দুর্বলতার চর্চা ক'রে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়ই কঠিন। তবুও আরম্ভ ক'রেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে প্রধান সহায় ছিলেন কালীমোহন।' প্রধান সহায়ক হিসাবে পাশে থাকায় তৎকালে শিক্ষিত মানুষের নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কবির পক্ষে পল্লীসংগঠনের কাজ করা সহজ হ'য়েছিল। একজন সত্যিকার 'সমাজকর্মী' হিসাবে তিনি শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন-বিভাগে কর্মরত অবস্থায় গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কবি তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতি শিখে আসার জন্যে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষণপ্রাপ্ত হ'য়ে কবির চিন্তাকে বাস্তবে যথাযথ রূপদান ক'রতে থাকেন কালীমোহন।

প্রসঙ্গত প্রমথনাথ বিশীর বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য ঃ 'শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন পরস্পর পরিপূরক। শ্রীনিকেতনের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া দেশের মধ্যে শিকড় সঞ্চালন করিয়া দিয়া যাহা ব্যক্তিগত তাহাকে দেশগত করিয়া তুলিবে।

কালীমোহনবাবু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পুরুষ। তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল নিরক্ষর নিঃসহায় গ্রামের লোকেদের অনায়াসে তিনি কাছে টানিতে পারিতেন। এ এক রকমের প্রতিভা। কালীমোহনবাবুর মত কর্মী না পাইলে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পল্লী-উন্নয়ন-ব্যবস্থা এত অল্প সময়ে এমন সার্থকতা লাভ করিত কিনা সন্দেহ।' (রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ঃ প্রমথনাথ বিশী)

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৬-১৯২৬) ঃ কবির বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচজন ছাত্রের অন্যতম। কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকা পাঠান 'কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা' শিখে আসতে। তদনুসারে ১৯০৬ সালে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যায় স্নাতক হ'য়ে ফিরে আসেন। আমেরিকা থেকে ফিরে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে সন্তোষচন্দ্র প্রথমে আশ্রমবিদ্যালয়ে ও পরে কবির শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরবর্তী ক্ষেত্র শিক্ষাসত্র স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই তার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কবির শিক্ষা-ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্যে যে ছ'টি ছাত্র সেদিন শিক্ষাসত্রে এসেছিলেন, তাঁদের সকলের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষাব্রতী প্রমদারঞ্জন ঘোষ জানিয়েছেন ঃ 'এ-কাজে সন্তোষচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্র-ভক্ত শিক্ষকই যে যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ কি? উৎসাহের সঙ্গে তিনি তাঁর শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের নিয়ে কাজ ক'রছিলেন।'

১৯২৪ সালের পয়লা জুলাই থেকে ১৯২৬ সালে ৩ নভেম্বর অকাল-মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মাত্র আড়াই বছরেরও কিছু কম সময়ে সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্রে প্রাণ-সঞ্চার ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন ঃ 'সন্তোষবাবু ছেলেদের সঙ্গে সকল কাজে সমান অংশ নিতেন। শুধু মৌখিক নির্দেশ দিতে নয়, সব কাজই নিজে হাতে ক'রে ছেলেদের শিখিয়ে দিতেন। তার সঙ্গে পড়াশুনা ও সঙ্গীত-চর্চাও চ'লত, শরীর-চর্চার জন্যে ব্যায়ামও শেখাতেন। ছেলে ক'টিকে যেমন শিখিয়েছেন পড়িয়েছেন, তাদের দিয়ে কাজ করিয়েছেন, তেমনি তাদের আনন্দেও রেখেছেন।'

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) ঃ কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচজন ছাত্রের অন্যতম। পিতার নির্দেশে তিনি সতীর্থ সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমেরিকা যান। সেখানে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯০৯ সালে কৃষিতত্ত্বে বি.এস্. সি. পাশ ক'রে ফিরে আসেন। আমেরিকা থেকে ফিরে কিছুদিন শিলাইদহে কুঠিবাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে আশি বিঘা জমির উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বভারতীর নিদারুণ অর্থকষ্টের দিনেও পিতৃদেবের স্মৃতিরক্ষার্থে রবীন্দ্র-ভবন সংগঠনে তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আজ রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে রবীন্দ্র-ভবন যে পরিচিতি লাভ ক'রেছে তার মূলে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ।

তাছাড়া বিশ্বভারতী সোসাইটির যুগ্ম-সচিবের অন্যতম প্রধান রথীন্দ্রনাথ ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'লে তার প্রথম উপাচার্য হন। কবির সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভ্রমণকালে কবির সেক্রেটারির কাজ করেন। বিশ্বভারতীর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। দারুশিল্পসহ সাহিত্য তথা শিল্পকর্মে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তাঁর মধ্যে একটি উঁচুদরের মার্জিত শিল্পী-মন লক্ষ্য করা যায়।

রথীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'পিতৃস্মৃতি।'

চার্ল্‌স্ ফ্রিয়র্ অ্যাণ্ড্রুজ (১৮৭১-১৯৪০) ঃ রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের কাজের সঙ্গে যে-সকল বিদেশী মানুষ নিজেদের যুক্ত ক'রেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চার্ল্‌স্ ফ্রিয়র্ অ্যাণ্ড্রুজ অন্যতম। ১৯১২ সালে লন্ডনে বিখ্যাত চিত্রকর রোটেনস্টাইনের বাড়িতে গীতাঞ্জলির অনুবাদ-পাঠের এক আসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই প্রথম দর্শনেই তিনি অনুভব করেন গভীর আত্মিক যোগ; তিনি খুব দেরী না ক'রে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

১৯১৪ সালে অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে এলেন আশ্রম-বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিতে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি ইংরেজী পড়াতেন; কিন্তু কেবল শিক্ষার্থী পড়ানোর কাজেই তিনি নিজেকে যুক্ত রাখেন নি— স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বভারতীর পরিচালন-কর্মের মধ্যে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনিই ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন করাইয়া দেন, এবং শেষ পর্যন্ত এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র ছিলেন। কিন্তু কখনো এই দুইজনকে অতিক্রম করিয়া আত্মপ্রাধান্যস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই।' (রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ঃ প্রমথনাথ বিশী)

রবীন্দ্রনাথও এই নিঃস্বার্থ ত্যাগী মানুষটিকে খুবই গভীর শ্রদ্ধা ক'রতেন।

তিনি শুধু আশ্রমেরই বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারত-বন্ধু। 'ভারতবর্ষে আসার পর থেকে এ-দেশকেই তিনি নিজের দেশ ব'লে মনে ক'রতেন; পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল।' গরিব দুঃখী নিপীড়িত মানুষের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবক— তাই এ-দেশের মানুষ অ্যাণ্ড্রুজের নমে দিয়েছিলেন 'দীনবন্ধু'।'

অ্যাণ্ড্রুজের চিঠিগুলিতে তাঁর প্রীতিপূর্ণ মনটিকে চেনা যায়।

লেনার্ড্ নাইট্ এল্‌ম্‌হার্‌স্ট ঃ ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেরিকায় ভ্রমণ ক'রছিলেন, তখন তিনি এল্‌ম্‌হার্‌স্টের কথা প্রথম শোনেন। এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্ তখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান প'ড়ছিলেন। সেই সময়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের পল্লী-উন্নয়নের আদর্শের কথা শোনেন এবং ভারতে এসে গ্রামের সমস্যাগুলি জানতে খুবই আগ্রহী হন। কবি এমনই আদর্শবাদী একজন তরুণকে খুঁজছিলেন যাঁর গ্রাম-সম্পর্কিত কাজে সত্যকার বিজ্ঞান-নির্ভর তালিম নেওয়া আছে। তাই এই তরুণবয়স্ক ইংরেজ মানুষটির সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইলেন; কবির আমন্ত্রণে এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ও সাড়া দিলেন। নিউইয়র্কে দুজনের সাক্ষাৎ হ'ল।

ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে কৃষিবিজ্ঞানের পড়া শেষ ক'রে এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্ শান্তিনিকেতনে প্রথম এলেন। ১৯২২ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন বিভাগ খোলা হ'লে এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্ প্রথম তার ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নয়ন- বিভাগের প্রধান হিসাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ ক'রে এই বিভাগটিকে দাঁড় করানোর প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য-সহ ব্যক্তিগত শিক্ষা শ্রম পরিকল্পনা সকল দিক থেকেই যে দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রেছেন, তার তুলনা নেই।

এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্ অতঃপর তাঁর দেশে ইংলণ্ডের ডেভনশায়ারে ডার্টিংটন হল স্থাপন করেন। ভারত সরকারের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শ-দাতা হিসাবে এদেশের কৃষি-সংক্রান্ত উন্নয়নে মূল্যবান্ পরামর্শ দিয়ে আমৃত্যু তিনি এ দেশের সেবা ক'রে গেছেন। বিশ্বভারতী তথা ভারতবর্ষের জন্যে তিনি যে কাজ ক'রে গেছেন, তারই স্বীকৃতিতে বিশ্বভারতী ১৯৬০ সালে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' প্রদান করে।

তাঁর লেখা দুটি অমূল্য গ্রন্থ ঃ 'Rabindranath Tagore : Pioneer in Education' এবং 'Poet and Plowman'.

Students other than orphans may be admitted whose guardians fully approve of this kind of Education.

Rabindranath Tagore

প্রসঙ্গ : শিক্ষাসত্র

তৎকালীন রচনা-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মদিন উপলক্ষ্যে রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করায় যাহা বলিয়াছিলাম তাহা অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পনেরো মিনিটে তো সব কথা সংক্ষেপেও বলা যায় না। তাই বিবিধ প্রসঙ্গের অন্যত্র অধিকন্তু কিছু বলিয়াছি। আর-একটা অল্প-জানা কথাও বলি; কারণ কলিকাতায় অনেক কাগজ-ওয়ালাই কিছু-না-কিছু বলিতেছেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার একটি প্রধান মন্ত্র : 'From the start the child enters the Siksha-Satra as an apprentice in handicraft as well as house-craft. In the work-shop as a trained producer and as a potential creator, it will acquire skill and win freedom for its hands; whilst as an inmate of the house, which it helps to construct and furnish and maintain, it will gain expanse of spirit and win freedom as a citizen of the small community.'

তাৎপর্য। প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্পে ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবিসরূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দু'টির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে, সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে।

বিশ্বভারতীর ৯ সংখ্যক বুলেটিনে শিক্ষাসত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত আছে। তাহাতে দেখা যায়, গৃহকর্ম ও নানাবিধ শিল্পের ভিতর দিয়া বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় শিখাইবার ব্যবস্থা আছে। ছোট শিশুদিগকে ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েদিগকে কী কী শিল্প শিখান যাইতে পারে, তাহার তালিকা আছে। লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থাও অবশ্য আছে। যাঁহারা শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিতে চান তাঁহারা বিশ্বভারতী বুলেটিনের ৯ ও ২১ সংখ্যা দেখিবেন।

বিশ্বভারতী বুলেটিন দু'টিতে শিক্ষাসত্র স্থাপন কেন করা হইয়াছে, তাহা এবং ইহার মূলগত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং শিশুস্বভাব, বালকস্বভাব ও মানবমন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আছে। তাহা সত্ত্বেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশের লোকেদের ও নেতাদের দৃষ্টি কেন আকর্ষণ করে নাই, কেন ইহার আদর্শ বহুস্থানে অনুসৃত হয় নাই, তাহা চিন্তনীয়। এ-বিষয়ে আমাদের দু-একটি অনুমান লিখিতেছি।

প্রথম অনুমান এই যে, ইহার পশ্চাতে কোনো রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও আন্দোলন এবং বড় কোনো রাজনীতিকের নামের প্রভাব নাই;— ইহাতে বলা হয় নাই যে, শিক্ষাসত্রের অনুযায়ী শিক্ষা দিলে পূর্ণস্বরাজ পাওয়া যাইবে ও দেশ স্বাধীন হইবে। মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত ওয়ার্ধা স্কীমের উক্ত সুবিধাগুলি আছে।— যেমন তাহার চরখা ও খাদি প্রচারের সমর্থক, অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে চরখা ও খাদি দ্বারা দেশ স্বাধীন হইবে, এই রাজনৈতিক উক্তিও আছে।

শিক্ষাসত্রের আদর্শের সাফল্যের ও প্রসারের অন্য একটি বাধা বৈয়ক্তিক, বহু মনুষ্যঘটিত। তাহার আলোচনা করিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান আমাদের নাই। নিরপেক্ষভাবে তাহা করাও কঠিন।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ । সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন।
'প্রবাসী'র ওই একই সংখ্যায় লেখকের বেতার-ভাষণ 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রকাশিত হয়।

শিক্ষাসত্র ও সন্তোষচন্দ্র

এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ সাহেব এসে শ্রীনিকেতনের কাজের পত্তন করেন। তিনি গুরুদেবের কাছে সন্তোষবাবুকে চেয়ে নিলেন। সন্তোষচন্দ্র শ্রীনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। গুরুদেব যখন তাঁর শিক্ষার আদর্শকে বিনা বাধায় রূপ দেবার জন্যে শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রলেন, তখন সন্তোষচন্দ্রের উপরে তার ভার দেওয়া হ'ল। গুরুদেব স্থির ক'রেছিলেন, শিক্ষাসত্রে এমন সব ছেলে নেবেন, যাদের অভিভাবকদের তরফ থেকে পরীক্ষা-পাশ করানোর দাবী উঠবে না। তিনি ভাবলেন, এইভাবেই তাঁর শিক্ষার আদর্শ সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত করা যাবে। এ-কাজে সন্তোষচন্দ্রের মতন রবীন্দ্রভক্ত শিক্ষকই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। সন্তোষচন্দ্র উৎসাহের সঙ্গে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের নিয়ে কাজ ক'রতে লাগলেন। সেই কাজ ক'রতে-ক'রতেই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে ১৯২৬ সালে তিনি মারা গেলেন।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ডেয়ারী ক'রেছিলেন শান্তিনিকেতনে। রথীন্দ্রনাথের বন্ধু সন্তোষচন্দ্র। তিনিই প্রাণ ঢেলে শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন ক'রলেন। কমিউনিটি প্রজেক্টে —এখন যা সকলেই চাইছেন, গুরুদেব আগেই তা শুরু ক'রে গেছেন সন্তোষ মজুমদারকে নিয়ে। হাতের কাজের সব শিক্ষা যা ডাইরেক্ট মেথডে শেখানো হ'ত তা এখানেই, এই শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনেই, প্রথম আরম্ভ হ'য়েছিল।

শিক্ষাসত্রে গ্রামের ছেলেদের জন্যে শিক্ষার রুটিন্‌ শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের ছেলেদের রুটিনের মত হবে না। এগ্‌জামিনেশনের জন্যে পড়াবার দরকার নাই। তাদের দিতে হবে হাতে-কলমে পূর্ণ শিক্ষা। আশ্রমবিদ্যালয়ের ওপর ক্লাস-এগ্‌জামিনের রুটিন অনুমোদন ক'রেছিলেন আশুবাবু। তাঁদের সিলেবাস-মতোই আমাদের পড়াতে হবে। আশুবাবু সিলেবাস চেঞ্জ ক'রতে সম্মত হন নি। কিন্তু, গুরুদেব ভেবেছিলেন, আমাদের সিলেবাস আমাদেরই থাকবে। সেইজন্যেই শিক্ষাসত্রের পত্তন করা। গুরুদেব আর এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ মিলে শিক্ষাসত্রের ডিটেল্‌ড্‌ সিলেবাস্‌ তৈরী ক'রলেন।...

১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে ছ'টি ছেলেকে নিয়ে শিক্ষাসত্র আরম্ভ হ'য়েছিল। বালকদের রান্না-বান্না, বাগান-করা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখা, সন্তোষচন্দ্র তাদের শেখাতেন নিজ হাতে-হাতে ক'রে। তাছাড়া গীতিনাট্য, কলাচর্চা, ব্যায়ামও শেখাতেন তাদের। ১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল শ্রীনিকেতনে সন্তোষচন্দ্রের ১৯২৬ সালে মৃত্যুর পরে।... গুরুদেব চেয়েছিলেন শিক্ষাসত্রের ছাত্রেরা স্বাবলম্বী হবে। তবে ছাত্রদের উপার্জিত অর্থে কোনো প্রতিষ্ঠান চ'লবে, সে-চিন্তা কবি কোনোদিনই করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, শিক্ষাসত্রে শিক্ষা পাবার পর ছাত্রেরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিজেরাই বেছে নেবে। এই বিষয়ে গুরুদেব আর এল্‌ম্‌হার্‌স্টের তৈরী-করা শিক্ষাসত্রের বুলেটিন দেখলেই সব বুঝতে পারা যাবে।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসত্র স্টার্ট হবার বছর দেড় পরে সন্তোষচন্দ্র কলকাতায় মারা গেলেন টাইফয়েডে। ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক সন্তোষচন্দ্রের শ্বশুর ছিলেন। এই ইন্দুমাধব মল্লিক হ'লেন ইক্‌মিক্‌ কুকারের উদ্ভাবক। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে মারা গেলেন সন্তোষচন্দ্র। সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুতে শিক্ষাসত্র কানা হ'য়ে গেল।

এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ লণ্ডন থেকে আমাকে টেলিগ্রাম ক'রলেন, 'তুমি শিক্ষাসত্রের ভার নাও।'—'you must take the charge of Siksha-Satra,' কিন্তু আমার বিদ্যে নাই, তবে influence আছে। আমি answer দিলুম। ব'ললুম,—'কলাভবন আর শিক্ষাসত্র একসঙ্গে চালাব কী ক'রে?' এ হ'ল বোধহয় ১৯২৬ সালের কথা। ইন্দুসুধা ছাত্রী ছিলেন কলাভবনের; আমার তরফ থেকে তিনি নিলেন charge। অনেক সাহায্য করলেন আমাকে। শ্রীনিকেতনে ছেলেদের থাকার বাড়ী হ'ল। শেষে ধরা প'ড়লেন বিপ্লবীদলের সঙ্গে যোগ থাকায়। বোধহয় কলকাতার এক বোমার কেসে।

হিজুলি জেলে পাঠানো হ'ল তাকে। এখন (১৯৫৫) সে কমিউনিস্ট। তারপরে শিক্ষাসত্রের ভার নিলেন আমার তরফ থেকে আমাদের মাসোজী। কিন্তু, অথরিটির সঙ্গে তার খিটিমিটি বাধল। হিসেব-নিকেশ ক'রতে হ'ত দিনরাত। ও হিসেবী লোক নয়। আমি শিক্ষাসত্রের কাজ ছাড়লুম। মাসোজী আবার কলাভবনে জয়েন ক'রলেন। এ-সব ঘটনার চিঠি আছে, দেখো।

অনেক পরে চারুবাবু কর্তা হ'লেন শ্রীনিকেতনের। তিনি ব'ললেন,— 'আমরা এতদিন এখানে ছেলেদের না পড়িয়ে পণ্ডিত ক'রেছি; এবার পড়িয়ে পণ্ডিত করা যাক।' তাঁর আমলে নিয়ম হ'ল গ্রামের ছেলে চাই, এবং উপযুক্ত হ'লে ম্যাট্রিক দেওয়ানো অন্তরায় হবে না। কিন্তু সেই হ'ল হিন্‌ড্রেন্স্।

এখন (১৯৫৫) চার্জে আছে সমীরণ। উদ্দেশ্য হ'ল, শিক্ষাসত্র থেকে গ্রামের গরীব চাষী-গৃহস্থের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। চারুবাবু ব'ললেন,— 'গ্রামের লোক এসব চায় না।' অর্থাৎ তিনি নিজে এ-সব সাপোর্ট ক'রতেন না। একটা সহ-শিক্ষার প্রাইমারী বিভাগও তিনি এর সঙ্গে জুড়ে দিলেন। কিন্তু, শিক্ষাসত্রে গ্রামোন্নয়নের যা-কিছু activity সবই ঐ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে। চাষ-আবাদ থেকে শুরু ক'রে পুকুরে মাছ জন্মানো, মাছ ধরবার জাল তৈরী, গোরু রাখা, পোলট্রি করা, ইত্যাদি একজন গেরস্থের সংসারে সারা বছরে যা দরকার লাগে, সবই করা হ'ত ওখানে। গ্রামের জমিদার বাড়ীর মেয়েরাও মেঝেনদের মতন ধান ঝাড়তে কুণ্ঠাবোধ ক'রতেন না। কিন্তু, দেশ সে-শিক্ষা নিতে পেলে না; কারণ অথরিটি অবহেলা ক'রলেন। বাগচী মহাশয়ের সময়ে শান্তিনিকেতন পাঠভবনের সিলেবাস শিক্ষাসত্রে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। ফলে প্রাণ যেটুকু ধুক্‌ধুক্ ক'রছিল তাও থেমে গেল। চাষার ছেলে ছকে-বাঁধা শিক্ষা পেয়ে বাবু হ'য়ে যাচ্ছে। চাষবাস হ'চ্ছে নমো নমো ক'রে, আর চেয়ার-টেবিলে ব'সে কাজ করার জন্যে গুরুদেবের মূল আদর্শ ফেঁসে গেল। ব্যয়বাহুল্যের সঙ্গে-সঙ্গে দুরবস্থাও বাড়তে লাগল। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা 'হাতের কাজে' যথাসম্ভব সুদক্ষ হ'তে পারল না। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নিতে লাগল। উভয়ের মিল না হওয়ায় জীবনের ছন্দ ভেঙ্গে গেল।

নন্দলাল বসু

ভারতশিল্পী নন্দলাল ঃ ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল। সবিতা, মাঘ ১৩৭৪ পৃষ্ঠা ২৬-২৯।

General Running

5.30–6.30 . The strictest discipline shall be observed in the performance of certain vital duties,- rising, washing, sweeping up, time for silent meditation, preparation and taking of refreshment, and a captain of the 5 boys and sub-captain of the 5 girls shall be responsible for this under,- at first the closest discipline .

7-9 . The same discipline in the performance of the days preliminary duties i.e. 2 huts,- 2 in kitchen; 2 grinding or pounding rice; 2 at the well; 2 on the farm and garden and latrine work. (If possible a boy and a girl in couples)

9-11.30 Complete freedom within certain limits in the workshop under supervision.

A. Diary writing

B. Record keeping
- Cows
- Hens
- Chickens
- Rainfall
- Garden
- Farm
- Kitchen supplies

C. Craftsmanship
- Durree making
- Blankets making. Brick making
- Wicks and band making
- Weaving
- House construction
- Carpentry
- Smithy
- Dyeing
- Designing
- Decorating

Supply of musical instruments in work room, make their own single string, comb, own drums and flutes.

Stimulation here- Dinu Babu and Gurudev.

Meal- served and cleaning up by children and washing own cups and saucers; thalas (talis)

Afternoon Rest

Then,- story telling and reading with simple hand ...

Games - supervised, but also invented.

Evening - Meal preparation, meal taking, washing up.

Stimulate invention,- let all ideas and suggestions be thrashed out in common.

Excursions - twice a week at local, e.g. Post Office and Telegraph Office, Police Station and lock up, Rice factory, wheel wright and carpenter, Weaving school (Jatin Babu's), Tobacco making station, Watch Repair, Law Court, Dispensary.

..., vegetables ... every ... and stores.

এল্‌মহার্স্ট-কৃত সিলেবাসে রবীন্দ্রনাথের সংযোজন।
—শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত

রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্‌স্ট

OUR EXPERIMENTS WITH RURAL EDUCATION

"Villages are like women. In their keeping is the cradle of the race. They are nearer to nature than towns and therefore in closer touch with the fountain of life. They have the atmosphere which possesses a natural power of healing. It is the function of the village, like that of woman, to provide people with their elemental needs, with food and joy, with the simple poetry of life, and with those ceremonies of beauty which the village spontaneously produces and in which she finds delight. But when constant strain is put upon her through the extortionate claim of ambition, when her resources are exploited through the excessive stimulus of temptation, then she becomes poor in life and her mind becomes dull and uncreative."—

In these touching words the Poet Sage of India has given expression to his love and admiration for the (now decaying) rural culture of our country the revival of which has been one of the greatest passions of his streneously creative life. The foundation of his world-famous International University was therefore laid in one of the poorest rural districts of Bengal and from the very start of the Santiniketan Ashram it has been our lookout to emphasise on our pupils' minds the necessity of keeping touch with the villagers who compose the major part of the population of our country. Not satisfied with simply making the middle class students of Santiniketan merely rural-minded the Poet, later on, started an Institution for the Reconstruction of our Rural life at Santiniketan. In the language of the Poet, "the task that lies before us today is to make whole the broken-up communal life, to harmonise the divergence between village and town, between the classes and masses, between pride of power and spirit of comradeship."

The incorporation of two such institutions as Santiniketan (with children of rather well-to-do town-dwelling parents) and Sriniketan (with children of poor and destitute villagers) within the scope of the activity of Visva-Bharati is the most emphatic demonstration of our will to translate into action the (above-quoted) ideal enunciated by the Founder President of Visva-Bharati. The aims and objects of the Institute of Rural Reconstruction at Sriniketan as adumbrated in the Visva-Bharati Bulletin No. 6, are as follows:

(1) To win the friendship and affection of the villagers and cultivators by taking a real interest in all that concerns their life and welfare, and by making a lively effort to assist them in solving their most pressing problems;

(2) To take the problems of the village and the field to the classroom for study, discussion and experiment in the farm,

(3) To carry the knowledge and experience gained in the classroom and farm to the village and thereby to help the villagers in their moral and material progress,

(4) To work out an all-round system of elementary education in the villages with the ultimate object of developing ideas of citizenship,

(5) To put the students in the way of acquiring practical experience in cultivation, dairying, animal husbandry, poultry-keeping, weaving, and in the art & spirit of co-operation.

With this (rather) ambitious project we started our Institute of Rural Reconstruction some 15 years ago. The farm-lands of the Institute till 1929 amounted roughly to 25 acres of land—consisting workers lodgings, cattle-sheds, gardens and tanks. Since some 700 acres of land has

been acquired. It should however be borne in mind that most of this land eroded and waste.

The activities of the Institute may be classified under the following heads : Agriculture, Dairy, Industries (including Weaving, Shoe-making and other leather works, Carpentry, Lacquer works, Pottery, Book-binding, Embroidery,) Health and Sanitation, Village Organisation and Rural Education.

It is a well-known fact that our trouble in India is essentially economic. Our main problem is our *Poverty* and our chief enemies are ignorance and superstition. It is a truism that no effective step can be taken for the amelioration of the hardship and wretchedness of the masses unless they possess intructed minds. Education of the rural population is the crying need of the hour. This too the unpractical Poet of Santiniketan was able to perceive prophetically years ago when the political Pundits were merely beating about the bush in search of the unobtainable Philosophers' Stone.

Accordingly on the 1st July 1924 an Experimental School for village boys, the Siksha-Satra, was started under the guidance of one of the teachers of Santiniketan (the Late Santosh Chandra Mojumder.) It was felt necessary to have a separate school for village boys (whom we expect and encourage to go back and enrich the life of the village) because the students who joined the institutions at Santiniketan came from city-dwelling well-to-do families. It was also felt that because these students were paying for their board and tution, it would not have possible to make them cook their own food or wash their own clothes which we wanted the Siksha-Satra boys to do for themselves. Moreover they had to pass examinations whereas the Siksha-Satra boys were never troubled with such mental preoccupations. For these and other reasons the Siksha-Satra which began its career at Santiniketan was later on removed to Sriniketan.

This Experimental school was started with half-a-dozen village boys—either orphans or children of destitute parents.

The first batch consisted of :

Benukar Bhattacharjee	(10 years & 6 months)
Chittaranjan Kar	(9 years)
Satyendra Saha	(9 years)
Atul Ghose	(7 years)
Kiriti Prosad Kar	(7 years)
Rameswar Lall	(9 years)

Rameswar who came from Behar left after 4 months and in his place Prasad Bardhan, a six years old Khasia boy was taken in. All the boys belonged to the Birbhum district except Chittaranjan and Prasad who came from East Bengal.

Our object was not to make them pass examinations ; but to help them to be self-reliant and to be able to live in a better way when they go back to their villages and thereby not only improve their own lots but also inspire in others the feeling of self-reliance and eagerness to do work in an organised way.

In the beginning only one hour was devoted to the study of the three R'S. The rest of the time was spent in gardening, excursions, studying nature, collecting wild flowers and medical herbs

and learning to do household works with their own hands. No time-table was hung on the board, only the teacher kept a watchful eye that no part of the day was mis-spent or idly spent. He was to keep them engaged in some kind of profitable, i.e. creative work.

After working out the scheme for one year and 10 months the talented first Superintendent of Siksha-Satra was able to write in his official diary the following :

"Physical vitality was our first concern. The gain of the boys in height, weight and strength has been very remarkable, now they are better off than most boys of their age even in Santiniketan......The boys have made considerable progress in gardening, weaving, and construction, they cut and sew and make their own garments, their own tables and boxes, can cook well as well as paint, write a neat hand in Bengali, recite poems, know addition, subtraction, multiplication and division, not mechanically but in relation to life situations. They have began to feel in their own little way that the individual's effort is not purely individual but invariably has social reactions. They are realising the value of mutual *aid* have acquired the social habits of kindliness and brotherliness."

It will be obvious that from the very beginning it had been our endevour in the Siksha-Satra to give an all-round education to village children with the object of not only enabling them to earn a decent living for themselves but to so train their mental and physical faculties as would enable them to improve the rural life of Bengal when these boys become grown up and responsible members of society. It is our high ambition, *to manufacture in our little Educational Laboratory, village leaders by scores.* We do not claim to have succeeded in realising this objective but we do claim that we have made a good start.

Today there are 20 boys in the Siksha-Satra, 2 Mahommedans, 2 Santals, and the rest Hindus of the poorest class--all sleeping in the same dormitory, and boarding in the common mess. The school has been organised as a miniature community and except cooking (which is ordinarily done by a cook) the boys have to do everything—washing, sweeping, marketing, cleaning utensils, keeping accounts, all for themselves. There is no servant engaged for them. They elect their own captains and leaders for various activities.

The framing of a curriculum for the Siksha-Satra has been an ever-elusive task and that must be necessarily so. I must confess that (like my predecessors in office) I have not been able to frame a fixed curriculum for the Siksha-Satra. I am however not very much disappointed over the matter. Perheps I shall never stick to a fixed curriculum so far as the Siksha-satra is concerned and yet it is to be borne in mind that we could not have proceeded successfully so far into the troubled waters without any compass whatsoever.

The truth is that though we did not fix up a rigid curriculum to be followed mechanically at any cost we had in our mind a rough idea of what we wanted our boys to become. We wanted them to attain real manhood and that in such a way as would enable them to become ideal house-holders in an Indian—rather a Bengali village. We wanted them to get rid of sloth, helpessness and the spirit of defeatism. We wanted them to develop self-reliance, self-help, courage, leadership and the spirit of co-operation. We wanted them to learn to respect manual labour and to develop their creative faculties. We wanted them to develop a fresher, wider and heal-their outlook in life. And whatever appeared to us to have any power to help them in

bringing about this transformation in the character of our boys, that we called our curriculum. For sometimes we had perhaps groped in the dark and even now, we are not absolutely certain about having found the light but we have the faith that to the earnest seeker it invariably comes. However we might have erred, we have tried hard, learnt much and perhaps have achieved a little bit too.

We did not ignore altogether the literary side of education but more attention is given in building up the character of the boys. The extra-academic activities of the Siksha-Satra consist of:

(1) Industry (Weaving, Carpentry, Book-binding, Leather work), (2) Gardening, (3) Health and Sanitation, (4) House crafts and general management, (5) Sports, Games, drill and Brati-Balaka Activities (our own Scout Movement), (6) Collection (of wood, wild flowers, seeds, manures, soils, cattle-feeds, medicinal herbs, maps and charts etc.) (7) Educational trips to places of interests, (8) Literary Society, (9) A monthly manuscript Magazine "Chesta".

On the purely academic side I have tried to draw up a rough curriculum for a term of seven years and we shall try to give effect to it (with necessary modifications whenever there should arise any necessity for the same) from the beginning of the next year.

A summary sketch of the same is given below :

(Knowledge of the three R'S presumed).

1st Year : Bengali (Reading and writing)
Arithmetic—Division, L.C.M. & G. C. F. Multiplication Table. Elementary Hygiene, Nature Study, Elementary Drawing.
English—Alphabets and some common words.

2nd Year : Bengali (More advanced course).
Arithmatic—Upto fraction and Subhankari.
Hygiene, Nature Study, Drawing—more advanced course.
English—First reader.
Geography—The Earth, the Solar System, Topography of Sriniketan and a rough idea of the district of Birbhum.
Indian History—Ramayan, Mahabharat and the life and teaching of Buddha.

3rd Year : Bengali—(Reading and writing)—More advanced course.
English—More advanced course, sending telegrams, money-orders etc.
Arithmetic—Area, Interest, Zemindari & Mahajani accounts.
Geometry—Elementary Geometry—specially definitions and idea of plane figures.
Hygine, Nature Study, Drawing—More advanced course.
Geography—Season, Tide etc. Broad outline of India with special reference to Bengal.
Indian history—From Buddha to 1600 A.D.

4thYear : Bengali—More advanced course.
English— " " "
Arithmetic—Percentage, Ratio problems etc.
Geometry—Hall & Stevens 1st. book (in Bengali).
Algebra—Simple addition, subtraction & multiplication.
Hygiene, Nature Study, Drawing—More advanced course.

Geography—Asia & Europe (Political and commercial).
Indian History—1600 to the present time. Story of the Great War—Its main causes and its relation with the world affairs of the time.

5th Year : Bengali—More advanced course.
English— " " "
Arithmetic—Stock, Brokerage, Profit & loss.
Geometry—Upto the end of Book 1.
Algebra—Upto Factorisation.
Hygiene, Nature Study, Drawing—More advanced course.
Geography—A rough idea of World Geography.
History—Modern Europe—with special reference to the Colonial and Commercial expansion of European countries.

6th Year : Bengali—More advanced course, Tagore's literature on education.
English—More advanced course.
Geometry—Book II.
Algebra—Upto Equation.
Hygiene, Nature Study & Drawing.
History—The effects of the Industrial and the French Revolutions on the Economic and Political life of the world.
The evolution of the Indian National Congress.
The Cultural Renaissance in India—with special reference to the revival of Indian Art, Science, Music, the history of Bramha Samaj, Arya Samaj, the Evolution of the Calcutta University, and the Study of important personalities like Rammohan Roy, Vidyasagar, Rabindranath Tagore, Vivekananda, Gandhi as harbingers of the renaissance. Elementary Civics.

7th Year : Bengali—Tagore's Literature on Education.
English—More advanced course.
Civics—Including Indian administration.
Logic.
History— (i) Social and cultural movement in modern India.
(ii) History of Indian Art & Philosophy.
(iii) Main political currents in Europe—with special reference to Capitalism, Socialism, Fascism, the far Eastern Problem.
(iv) General trend of world Politics and India's position in the world setting.
(v) Economic History of India.

The theoretical classes are held in the afternoon (2 to 4-30 p.m.) and evening (7 to 8 p.m.). The morning is kept entirely free for crafts and gardening classes. Every student of Siksha-Satra has to master one of the following handicrafts: Carpentry, Weaving or Leather works.

So far we have paid entirely for the boarding, lodging and tution for these boys. Those who were able to contribute in kind were asked to bring rice from home and the total amount of rice thus received never exceeded one-tenth of the total annual consumption. But now some of the senior students have become quite expert weavers and carpenters and we propose paying them daily wages. At the end of the month the whole amount due to a student will be paid

to him and he will be asked to pay for his food. This, we hope, would help to emphasise on the students mind the fact that they are not living on our charity and will also enable us (with the extra money thus received) to admit a larger number of boys in the Siksha-Satra than it had hitherto been possible.

Very soon we hope to add to the strenth of the teaching staff and then we shall be able to include the following extra subjects in our curriculum for the advanced students of Siksha-Satra.

1. Rural Economics.
2. Co-operative Organisations.
3. Scientific Agriculture.
4. Music.

Not withstanding many rebuffs our progress so far has not been disappointing. The success we have already acheived emboldens us to say that, in the main, the lines on which we have worked have been correct and our activities have yielded pretty satisfactory results. No doubt with greater encouragement and help better results may easily be achieved.

Apart from the Siksha-Satra there are two more educational institutions under the Supervision of the Rural Education Department at Sriniketan : The Siksha-Charcha Bhavan (Training School for Primary School Teachers) and the Sriniketan Girls' School (a primary school for local village girls).

In the Siksha-Charcha Bhavan there are at present 20 students of whom six are Mahommedans. They dine in the same hall, sleep in the same dormitory and sing the same national song. Their age ranges from 18 to 32. As a special case we have been allowed to extend the training course to 2 years instead of the usual one year's course as we think that as teachers their education would remain incomplete if they do not know something more than what is included in the Guru-Training Course. The extra subjects which they learn here (as students of Visva-Bharati) are Civics, Psychology, Village welfare and in addition they have to learn well one of the following Crafts : Leather works, Weaving, Book-binding or Carpentry, Gardening, games and drill are compulsory subjects.

We hope to be able to give them regular instruction also in Music, and History of Indian Art and Philosophy soon. From January next a fresh batch of twenty students will join the Siksha-Charcha Bhavan in the 1st year class when the present batch will be promoted to the 2nd. year. In future we have decided not to take in any student who has not read upto the Matriculation Standard. It has been felt that unless the students in the class have a uniform general standard of preliminary education it is difficult to make any systematic progress especially in the more advanced studies like Civics & Psychology.

The Sriniketan Girls' School is just a primary school which we want to present to the other schools of similar class as their model. We regret, due to continuous changes in the management and staff we have not been able to achieve that success which it had been our ambition to achieve. The new Head-mistress has joined the school newly and we are optimistic that under her able guidance we shall realise our ideals soon.

The school has 39 students on the rolls, (32 girls and 7 boys). Apart form the standard

course the students receive instructions in sewing, embroidery, clay-modelling, Alpana etc. We hope to introduce Music soon.

These are the three institutions which are maintained by us, so to say at the head quarters, at Sriniketan. But the need of spreading education in our country is so great that we could not rest satisfied by running a few schools at our place. For the proper regeneration of our country we felt that Education has to permeate into the lowest stratum of society. The searchlight of knowledge has to be focussed into the darkest dungeons of our country sides. With this aim in view we started opening schools in the outlying villages of this district —some night schools, some Girls' schools but most of them primary schools for villages boys. The running cost of these schools are paid by us and in some cases a part of the cost is also borne either by the District Board or the School Board. There are *fifteen* such schools now which are supervised by our Rural Education Department. The following table will show in some detail the actual position of these schools:

Name	Children of school going age in the village	No. of students attending school Boys-Girls	Reasons for not attending ·hool	School Income	Remarks
1. Paruldanga School	91	68 49 19	Poverty—they have to work	Sriniketan 2/- D. Board 3/- fees 6/- p.m. Rs. 11/-	
2. Sitalpur Night School	27	22 17 5	" "	Sriniketan 5/- D. Board 2/- p.m. Rs. 7/-	All Students are free
3. Bablabuni Santal School	35	22 17 5	" "	Sriniketan 3/- SchoolBoard 10/- p.m Rs. 13/-	All Students are free
4. Sehalai Santal School	38	23 22 1	" "	Sriniketan 2/- SchoolBoard 10/- p.m. Rs. 12/-	All Students are free
5. Noadanga Night School	52	31 29 2	" "	Sriniketan 4/- p.m.	10 Students go to neighbouring school. Our school is free
6. Goalpara Girls' School	26 girls	20 girls	Poverty and negligence of parents	Sriniketan 5/- p.m.	
7. Bonerpukur Santal School	29	21 boys	They have to work at home	Sriniketan 6/- p.m.	All the Students are free
8. Goalpara Night School	53	18 boys	Poverty and negligence of parents	Sriniketan 5/- p.m.	All are free

Name	Children of school going age in the village	No. of students attending school Boys-Girls	Reasons for not attending school	School Income	Remarks
9. Ballavpur School	24	13 8 5	Poverty and negligence of parents	Sriniketan 4/- (for School) Sriniketan 10/- (for weaving work at the village) p.m. Rs. 14/-	(a) Students are free (b) The teacher gets free board from his pupils
10. Bhubandanga Prasad Memorial School	68	47 36 11	" "	Sriniketan 4/- School Board & U. Board 12/- p.m. Rs. 16/-	Students are free. There are 2 teachers
11. Supur Santal School	114	69 62 7	" "	Sriniketan 3/- School Board 10/- p.m. Rs. 13/-	Students are free
12. Surul Santal School	66	21 19 2	Work and negligence of parents	Sriniketan 3/- School Board 10/- U.Board 2/- p.m. Rs. 15/-	
13. Kashipur School	80	55 35 20	They have to work at home	Sriniketan 2/- School Board 7/- U. Board 4/- p.m. Rs. 13/-	(a) Students are free (b) There are 2 teachers
14. Benuria Night School	188	27 21 6	They have to work at home	Sriniketan 3/- p.m.	Some students attend the day school at Bahadurpur
15. Mahidapur School	212	74 49 26	" "	Sriniketan 4/- School Board 8/- Fees 2/- p.m. Rs. 14/-	There is a separate girls' school in the villege. 25 girls attend it. Our school has 2 teachers
15 Schools	1103	531 403 128		Total cost Rs. 115/- p.m. out of which Rs. 62/- p.m. are paid by the Institute of Rural Reconstruction (Sriniketan).	

It will be seen that the total number of children of school going age (in those localities where we have started schools) amounts to 1103 out of which we have been able to capture & to bring under the discipline of school-life 531 children (403 boys and 128 girls). The total running cost of the schools amounts to Rs. 151/- p.m. out of which Rs. 62/- p.m. are paid by Sriniketan.

In all the schools except two the students receive instructions free of any charge. The Mohidapur School and the Paruldanga School are the only two schools where the students pay tution fees which amounts to Rs. 11/- p.m. The total number of students in those two schools being 142 it follows that on an average each student pays a tution fees of just over *one anna* per month.

Over and above the money grant we provide these schools periodically with black-boards, lanterns, slates and maps. The teachers of these village schools assemble at Sriniketan every Sunday-morning when they receive instructions on the methods of teaching. Local grievances, inconveniences and complaints are also heard by the Superintendent of Education on these occasions.

It is our ambition to open more such schools in the outlying villages of this district. Dearth of men of the right type and funds have often obliged us to work within very modest limits. Many village schools from outside our own district have applied for affiliation in our University but so long been obliged to refuse affiliation to far away schools because before we can take up such responsibilities we must be in a position to engage suitable and qualified men to go to inspect these schools and see if actually our scheme is being carried out there. The same reason—lack of funds, has obliged us to make our experiments within a narrow compasss. *Wanted a hundred thousand Rupees and a band of half a dozen devoted workers immediately for pushig forward our Rural Education Scheme.*

We claim to be the first institution to have tried to push forward a systematic, consistent and rational policy of mass Education in the villages and however we might have erred we do claim *experience* and *expert knowledge* of a most complicated problem which most other public bodies (which are now starting schemes of village Education under more favourable conditions) lack. We have therefore every reason to hope that the thinking public which has the interests of the masses at heart would readily respond to our appeal for men and money.

It is a happy augury of time that the Governments of many provinces of India have taken the problems of mass Education in right earnest and within a short time the Congress Provinces will surely enjoy the benefits of a system of free, compulsory Primary Education. Will Bengal lag behind?

Krishna Prasanna Mukerji

Reprint from Our Experiments with Rural Education (A pamphlet)

'কবির নীড়' : শ্রীনিকেতনে শিক্ষাসত্রের প্রথম কার্যালয়।
শিল্পী : শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

পরিশিষ্ট ২

Siksha-Satra
An Experiment in Rural Education
at

SRINIKETAN

I

INTRODUCTION

The following chapters will attempt to set forth the activities of the Siksha-Satra together with the main results achieved so far from the experimental methods of education on which the school is run.

The aim of Rabindranath Tagore in founding the Siksha-Satra was to have a school that would equip boys for a full civic life. The boys must have their intellect developed as well as their aesthetic imagination; they must imbide an *esprit-de-crops,* or team spirit, on which to build a harmonious social life in their home villages. The Siksha-Satra was founded as a model school run on model methods for the building up of the ideal villager. Tagore's own words best explain his aims. 'The primary object of an institution of this kind," he said, "should be to educate one's limbs and mind not merely to be in readiness for all emergencies, but also to be in perfect tune in the symphony of response between life and the world,"

In working out the scheme for a socio-educational institution of this kind, the founder was enthusiastically seconded by his distinguished associate, Mr. Elmhirst's special contribution was his desire to have village boys trained through modern science in the different rural handicrafts and in agriculture; this school, according to him, was to train boys in such a way that with their knowledge and practical experience they would naturally play a leading part in the reconstruction of their home villages, and thus make for a renaissance of rural life. The boys would be drawn from the neighbouring villages and live in the "Home School" for a length of time during which their talents and capacities would have the oppertunity of developing fully under the guidance—as distinct from the pressure—of the teachers. The school aims were to lead the students to discover things for themselves, to encourage sponteneous curiosity in the laws of Nature, and to encourage too, love of work and creation through work. This would fit the boys to earn their living by crafts, agricultural science and business methods, and at the same time develop the body by physical culture. Lastly, the aim was to foster an active interest in the welfare and common good of society, and by original thinking and imaginative understanding to help the boys to develop their latent powers of leadership.

Tagore was driven to express his educational ideas in a practical form by the stilted education system current in the country which made academic degrees the final test of intellectual attainments and crippled the possibilities of self-expression. Naturally, the founding of a school

for broader education was something of a revolutionary move and was fraught with difficulties. "For me", said Tagore, "the obstacles were numerous. The tradition of the community which calls itself educated, the parents' expectations, the up-bringing of the teachers themselves, the claim and constitution of the official University, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished."

The two pre-requisites for an institution of this kind were first, a quiet locality, and secondly boys who did not think of education merely as a means of passing examinations so as to find work in cities. Sriniketan, surrounded by an unsophisticated and not job-minded rural population, seemed to Tagore an eminently suitable spot for putting his scheme into practice. There was a heartening response from the villagers themselves, and the experiment was not only inagurated but followed up successfully.

The Siksha-Satra accords an important place to crafts of economic value, and also to fine arts. Tagore considered aesthetic culture, as a medium of self-expression and as a source of inner happiness, to be of immense value in the education of children. The students are encouraged, after having had the opportunity of learning and appreciating the arts and music, to pass on their feeling for the aesthetic to their village homes and thus add a richer quality to rural life.

The succeeding chapters show how the school works, what problems face the staff, and what has so far been achieved, thus providing a basis for a balanced estimate of the value of the work.

II

STAFF AND STUDENTS

The Siksha-Satra accomodates twenty-one students only. This number is determined by several factors. In the first place, the school is an experiment and does not want unlimited numbers of any one type of boys; further, as the ideas and the methods of teaching are different from the usual methods, only such parents and guardians as are able to appreciate the value of such an institution can be expected to enrol their boys. It is therefore essential to make a very thorough selection, and this considerably reduces the number of suitable candidates. Secondly, the cost of maintaining a large number of pupils in a residential school is very heavy, and to house them would require considerable outlay on buildings. Thirdly, during the five to seven years of training each pupil must receive individual attention from the teachers, and it is obviously impossible to deal with more than a small number of boys at a time, if the methods of the Siksha-Satra are to be followed. As the boys come from diverse kinds of homes and have different back-grounds, each one must be treated on his own merits and each one presents a different set of problems. Hence a detailed study of the life and background of each boy is most important to enable the teacher to discover the aptitude of the individual pupil, and devise for his guidance an appropriate technique.

Fourthly, contact with students does not end with the termination of the course, but continues during the extremely important post-training period. The trained boys go out to establish themselves in their villages, and it is for the school to give them every possible aid to enable them to make a good start. It would therefore be impossible for the staff to deal adequately with each individual case where large numbers of trained boys to issue from the school every year. It is also the opinion of the staff that a small, well-trained group will give better results and do the institution more good than would larger but less efficient numbers.

Only boys above eight years of age are admitted. Younger boys might well find it difficult to adapt themselves to life away from home and, moreover, the course of training is not for the younger age group. The course generally takes seven years, but for boys who join at the ages of thirteen or forteen (the maximum age for admission), and who have already been through school, a five-year course has been planned.

Preference is usually given to boys of poor homes from the neighbouring villages. No admission is given to boys who merely intend matriculating for the purpose of securing employment in a city; the Siksha-Satra only takes in boys who intend returning to their villages and working for the welfare of the village community; they must be prepared to become self-sufficient through their training and to face hardships, if necessary.

No caste distinctions are observed by the inmates of the school; the whole community dines and lives together as one social group. Most of the boys come from Hindu families of the lower castes, though there are a number of Brahmins and high-caste non-Brahmins from poor homes that own small landed property. These students pay towards their school fees agreed amount of rice from their fields; the amount varying from half a manued to ten seers per month according to the resources of the family. Those who are too poor to pay even that much are given "free-ships", provided their record is good.

At the beginning, no school fees whatsoever were charged, but the results, owing to some psychological factors, were unsatisfactory. The parents tended to hold a "free" education in contempt, while the boys felt they were given charity; the tendency in the parents to underestimate the value of the training was reflected in the boys by a feeling of inferiority. All these factors induced the Siksha-Satra to change its practice, and the present system is found satisfactory; for while the students feel the independence that paying their fees gives them, the parents and guardians tend to respect more an education on which they have to spend, and consequently they demand and expect good returns from their children. This has greatly improved the attitude of the students towards the school's method. When a boy is admitted he must go through a trial period of one month when, if he is found unsuitable, he is sent home. Parents and guardians have to make a declaration to the effect that, if they remove the student before the end of the course, they are morally bound to compensate Visva-Bharati for the expenses incurred so far in the maintenance of the boy.

Before selection of the candidate a thorough medical examination is held, as it is most undesirable for anyone carrying infectious diseases to be admitted to live and eat with others. The Medical Officer keeps a record of each boy's health and physical progress, and any defects

are carefully treated.

The members of the staff live in the Sriniketan Colony and their help and advice are always available to the students; this intimate association between teacher and pupil is invaluable for the intellectual development of the boys. Teachers work as a team so that life in the Siksha-Satra becomes a harmonious whole.

III

METHOD OF TRAINING AND PROGRAMME

The Siksha-Satra does not follow any set rules or methods of education, rather does it suggest lines along which education may best be imparted. The one rule, perhaps, is that no learning by memorizing text-books is allowed.

Whereas the boys are treated as personal entities, the problems they bring are approached in an impersonal and, as far as possible, scientific manner. The teachers do not instruct but rather guide and suggest, so that a fast bond of affection is created between teachers and pupils.

The classes are generally held in the open air, and the senior, or more advanced, group works separately from the junior. The pupils are encouraged to read and understand their books by themselves and endeavour to solve any difficulties or problems in the light of their own original thought. The teachers are there to consult and discuss with. The school has no set text-books; the pupils may refer to any book they like in the study of a subject that has aroused their interest. It is then, when interest is aroused and eagerness keenest, that the teacher with discussion and suggestion leads his pupils to further search and investigation, always encouraging them to bring to him the progress or results of their study.

As many opportunities as possible for the kindling and development of the spirit of investigation offered. For instance, the boys of the Siksha-Satra have each a plot of land on which to grow vegetables; and it is natural that a boy should ask himself why plants grow, what manure is, why water is so important to the growth of vegetation, and so on. These questions are the point from which the study of botany, biology, geology, and other subjects start. Again, every boy must go to market to buy some commodities; he spends money and must keep an account of the expenses. From this springs his study of arithmetic and, quite possibly, there may arise an interest in economics based on his observation of barter and business transactions in the market.

Further, rambles across the undulating country around Sriniketan with its rivers, soil erosion, stones and various formations bring the study of geography home to the students in a far more fascinating and vivid way than do text-books. Nor is history "taught" in the accepted sense of the word. The boys are given newspapers to read and gather from the news items what is happening all over the world; it is here that the teacher has the opportunity, while explaining the meaning of the events, to give the first elements of history and thus inspire his pupils with

a desire to know something of the past. Likewise, when celebrated personalities from various countries visit Sriniketan, the boys are anxious to learn about them and their people. Apart from excursions to places of historical interest, the boys are told to give the story of their own villages; the aim always being to lead any spontaneous interest in people towards the study of history and to make the students realize its value.

Study of natural sciences, of course, springs out of the observation of living being such as the dairy, the poultry, the fishes in the tanks, which usually arouse the curiosity of children. So do this stars, the sun and moon, the clouds bring the boys to enquire into their mysteries. Physics comes through the handling of tools in the workshops, the working of an oil-engine or a motor-bus; while manures and disinfectants lead to chemistry. Visits to the neighbouring villages are planned for the boys to make a detailed study of the conditions, and to devise for themselves methods of lessening or eradicating such evils as rivalry, litigation, lack of co-operation among villagers, idleness, dearth of drinking water, ignorance of scientific agriculture, the prevalence of malaria, and the deplorable state of hygiene. The very fact of their conscious observation of these conditions instils in the boys a desire to get at the root of the troubles and eradicate them; the search for a solution of these problems also brings the boys to the study of civics, politics, hygiene, agronomy, and other allied subjects.

Both Santiniketan and Sriniketan offer a vast scope for the study of literature and fine arts. The students are told about the poetry of Tagore and about the poet himself; they visit the Rabindra Memorial Museum, the Kala-Bhavana and Sangita Bhavana where they can nourish their aesthetic sense. Apart from this there are performances by talented musicians, dramatic shows, and exhibitions of paintings, all of which not only please the students immensely, but often help them in their appreciation of the arts and make them turn to the study of these subjects. In the arts or literature classes, again, no direct instruction is given, but the students are helped and guided, and often left to express themselves quite unhindered, so as to give their creative urge as full a scope as possible for development.

These example of the methods of the Siksha-Satra show how they are based on the intelligent and imaginative observation of the boys' environment and background. A boy's subjective experience gives the impulse to learn and is, therefore, precious material on which the teachers work; personal experience is the text-book and initiative the motive power.

No coercion is employed to enforce discipline among the boys; they must come to realize of their own accord what is anti-social and what is desirable. Co-operation here again is encouraged and any disputes that arise are dealt with first in the *vicharsabha,* or court of justice, where they are settled or punishments meted out to the offenders. A record is kept of these cases, the offences and punishments. Should, however, the *vicharsabha,* find itself incompetent to settle a dispute, the matter is taken to the teacher, who is addressed as *dada* (Elder Brother), and who takes this as an opportunity of demonstrating how useless, wasteful, and disturbing to fruitful work are dissensions and quarrels.

Corporal punishment is avoided as much as possible, as the school wants its boys to acquire a sense of self-discipline and to correct themselves by reasoning and understanding what is really

for their own good. Psychological methods have been applied with good results. For instance, two boys who had quarrelled were taken for a walk and as they went, the teacher talked about an "ideal boy"; self-criticism followed with salutary effects. A notable instance of how the boys cured a fellow-students of his laziness is interesting: one morning there appeared a placard which read "Umapati is not wanted; he is a lazy fellow". The remark proved most effective.

Another way of dealing with indiscipline is to discover what psychological cause gives rise to this state; boys who have means of self-expression through an occupation or interest are often unruly. Whereas in some homes the children are repressed, in the Siksha-Satra they find themselves free to expand. There is so much for them to do, so much to occupy their minds with, the workshop, gardening, fishing, cooking their own food, singing, playing, painting, going for walks, in all of which they are unobstructed and receive sympathetic response to their creative demands. Many psychological complexes are thus eliminated and indiscipline or "naughtiness" seldom occurs.

To train the boys to shoulder civic responsibilities in later life, a Captain who holds office for one month is elected from their number. As he is the leader, all must obey him; he is responsible for the internal functioning of the Siksha-Satra and must answer for any irregularity. A Store-keeper in charge of food stuffs is also elected every fortnight; he maintains accounts of the purchases and decides what will be eaten at each meal. There are, moreover, a Sports Conductor, in charge of games and recreation, a Supervisor of Livestock who feeds the cattle, poultry, and fish; he must also be able both to prevent and cure animal diseases. This system of co-operative work by allotting responsibilities, not only keeps the boy busy, but gives them a serious interest in their work. Because each boy knows he may one day himself be elected Captain or Supervisor, he feels impelled to obey the present heads in order to expect and demand in his turn.

The school wants everybody to realize that when living together in a corporate body, each member must help and take his share of the work. The boys, then, serve food, wash their dishes, sweep the floors and ever so often, cook the meals. There is a cook, of course, for the establishment, to save the boys from spending precious time at the daily routine of cooking; moreover, the smaller boys would really not be able to cope with so arduous a task.

Each boy of the senior group in turn edits the Daily News Bulletin, DAINIK, sets up in his own way important piece of news from the newspapers, and inserts notes of local news or news of local interest. A typical specimen is:

DAINIK

January 3, Thursday, 1946.
Poush 19, 1352 (Bengali Year)

1. General Chiang-kai-Shek has invited the American ambassador, General George Marshall, to act peace-maker between the Central Government and the Communist Party.

2. Mr. A.D. Mani Brahma, the editor of *Hitavada* told the representatives of the United Press that, in Burma and Malaya, nobody believes that Subhas Chandra Bose is dead.
3. Mr. Pethick Lawrence, Secretary of State for India, has declared in a radio talk that the year 1946 will be very important for India.

LOCAL NEWS

1. Yesterday, a new boy named Madhusudan Kumar joined the Siksha-Satra.
2. Phalguni Pal was invited, yesterday, by Sreejukta Pratima Devi in Uttarayana to receive some suggestions for increasing the yield of milk in the local dairy.
3. Our duck has laid an egg of unusually large size.
4. We offer for sale vegetables as *begoon, lanka, lau.* Please enquire from the Captain.

Bijoy Kumar Bhandari
Editor
Sriniketan Siksha-Satra.

The value of this editorship is not only that it develops a writing ability, but a keen interest in politics, history, and current affairs. Moreover, the boys appreciate having a vehicle for expressing their views, and for informing the public of their activities.

The students go to the Silpa-Bhavana of Sriniketan for training in crafts. They are advised first to see all the departments; study them carefully and then make their choice of subject. The masters of every section have special arrangements, unlike those for ordinary apprentices, for training the Siksha-Satra boys, who are allowed to devise and make their own models, and they love the work. They find satisfaction in the creativeness, and feel that, apart from learning to become self-supporting financially by being skilled craftsmen, they are also learning to become artists in their craft.

That financial self-support is a major object, however, will be seen from the last section of this report dealing with the after-careers of old students. The value of manual training in any good all-round education has long been recognized, but in the the Siksha-Satra the craft plays a much larger part than in a school with a literary outlook. As has been shown by the description of its approach to the formal educational subjects, all its teaching is life-inspired and life-centred. The craft is the means of livelihood. As soon as the boys have learned to make marketable goods, they are paid, as other apprentices are, in proportion to the value of their work. The sense of self-respect which their growing capacity for self-support gives them is a valuable element in their training. With experience of earning practice in wise spending, which is acquired through the marketing for daily needs. With the capacity to earn comes also an interest in saving and the value of capital; the school "bank" lays the foundation of the village co-operative bank; the small capital laid by from the boy's own school earnings may prove both a material and a moral asset when he comes to strike out for himself.

As punctuality is essential in the boys' training, the daily routine is scrupulously observed. The boys rise early in the morning when the Captain rings the bell; they have a wash and then assemble for morning prayers. After this they sit down to an hour's study, then go to breakfast consisting of rice or *souji* pudding, or some other milk-preparation. After breakfast the teachers come for about three hours' work to help the boys in their studies. The teachers attend to each individual pupil according to his ability, capacity for understanding, backwardness, or progress. Lessons are followed by a bath and the mid-day meal that consists of rice, *dal,* fish or eggs and vegetables. After an hour's rest, work starts again; first one hour of individual study, then two periods in craft training at the Silpa Bhavana, followed by gardening. Tiffin of puffed rice, milk, and *gur* is followed by games and drill. In the evening they assemble for prayers, then go to the study-room for about one and a half hours to read or write; here the tutor comes among the boys, answers their questions and helps any who need him. Supper of rice or *ketcheri,* or whole-meal bread with vegetables and chutney is then eaten. Now the day's work is over and, as the boys get ready for bed, the Superintendent comes to discuss with them any difficulties they may have found in the course of their work, any success or failure that may have attended their efforts. The boys have been found to talk freely and enthusiastically during these evening gatherings.

The curriculum does not contain any religious instruction as such, but the Superintendent at the nightly gatherings starts the boys off on such questions as the first cause of the universe, what happiness is, what is the goal of life, and so on, which the boys attempt to answer in their own words and according to their own light; no specific school of thought is advocated so that they may approach rationally the ethical problems of life and avoid dogmaticism.

First aid and nursing also form part of the Siksha-Satra training under the Medical Officer. The boys must do nursing and observe the patients who come for first aid to the Dispensary. If a student falls ill, he is nursed by his fellow-students, and if anybody in the Colony is reported ill the boys volunteer to serve in the capacity of health visitors and assist in every way they can.

The idea of social service is fostered and developed by co-operation with the Village Welfare Department that helps the poor village people. The boys work hard and are invaluable at *utsavas* and *melas* (festivals and fairs); they must learn through applied service the value of a co-operative social life; all of which equip them to become leaders in their villages. It is through the application of the principles on which the Siksha-Satra was founded that the school hopes to give balance and poise to the character of its students.

The way to achievement is never smooth and the following section will show something of the difficulties that arise and how they are faced.

IV

OBSERVATIONS AND PROBLEMS

The thing that first strikes the observer in the Siksha-Satra is the happy and enthusiastic air of its boys. The atmosphere of self-reliance, decency and freedom of expression, and the absence of needless restrictions seem to have removed shyness and made them able to converse with visitors.

Trouble does sometimes arise with boys who have difficulty in ridding themselves of bad habits learnt at home. It happens, too, that although a boy improves in health, learns well and joins in co-operative group-work while at the Siksha-Satra, a few weeks' stay in his home runs him completely down both in health and mentality; unhygienic conditions and the poor and irregular food account for this deterioration which entails starting all over again. Bad home habits in manners and language are all too easily re-learnt during a short holiday at home.

Some of the boys, when they first join the Siksha-Satra, are dirty, jealous, selfish, secretive, and callous; they shirk responsibilities and telling the truth. They are an unfortunate mirror of the dismal side of rural society. Slowly, with years of training, these boys change and become clean, tidy, sociable, and truthful. Other boys may bring with them some memorized texts, but can write nothing and have a bad hand-writing, and practically no general knowledge at all. When asked to solve a problem they can answer nothing, or just refuse to speak at all. With Siksha-Satra methods they gradually improve in language, composition and, what is most important, in confessing their ignorance. A *satra* student, having been cured of pretentiousness, will frankly confess that he does not know some particular thing.

The most malignant enemy of the villager is malaria. In their homes the boys especially are subject to this and other diseases, whereas at the Siksha-Satra nutritious food and regular doses of quinine act as safeguards. The problem may well bring the school to reduce drastically the visits to families.

From another point of view, too, long visits to the homes are undesirable. Although at first most boys feel home-sick when they join the school, they soon learn to love their new life as they make friends and find themselves; when they go home, however, they stop studying, learn vulgar language, and often become aggressive and unmanageable. All these undesirable traits of the environment leave their impress on the boys, and it takes a long time considerable tact and training to wipe them out.

The attitude of parents is sometimes most vexing, too, because they have not yet come to realize the value of a Siksha-Satra education. The intelligent boys are usually sent to the H.E. School, and their dull brothers are sent to the Siksha-Satra; this, even though the peasants can see for themselves every day the miserable plight of matriculates who are reduced to beg for fifteen-rupee jobs in the V.P. Schools. Nevertheless, the prestige attaching to a Matriculation Certificate is still great. Parents fear that their boys may be "degraded" by manual labour and any non-academic activities; they cannot understand how a dairy, poultry, and fish farm can

be part of a school,and wonder when the boys have the time to study. One of the students reported the remark of a senior man of his village who said: 'In the Siksha-Satra you are turned into *munish* (labourer) and not into a *manush* (man)". This, unfortunately, is still the sort of prejudice that has to be met. An unhappy example of this is the case of two intelligent boys who joined the school; after a few months they went home and met some High School boys who tested their knowledge of English. They were asked questions out of a text book designed for passing the matriculation, and which students, usually memorize; of course the Siksha-Satra boys failed and were severely censured by the others. Much against their will they were forced to leave the school.

The boys display immense interest in the dairy, poultry, and fish farms. On the occasion of the purchase of a fine new cow the boys garlanded it, washed its hoofs, and rubbed its horns with oil, in fact, everybody took pride in tending the cow, and the birth of its calf was a tremendous event. A leaf from the Superintendent's diary dated 2-9-45 reads:

"Everybody is anxious; when will the calf be born? Day follows night; Bejoy and Phalguni insist on somebody's watching the cow at night, and themselves volunteer to do so; the others agree with them. They keep watch at night in turn; early next morning they come running to me with the great news, and shout: We will celebrate the birth of our calf!"

This same student, Phalguni, is especially keen on dairy work, and has learnt to milk the cow that yields ten to eleven seers of milk a day—in itself quite an achievement for a lad of his age. When this same cow went down with a dangerous septic disease, it was he who nursed it and assisted the doctor in administering medicines.

The junior group is very interested in the poultry; it gathers the eggs, dates them and writes on them the name of the keeper. The hens, however, are of the ordinary local breed and, up to the present, it has not been possible to improve the stock.

When Dr. S.L. Hora, Director of Fisheries to the Government of Bengal, visited the Siksha-Satra in 1945, he remarked after seeing the institution, that a pond for pisciculture was needed to complete the picture. Consequently, the Sukhsagar was given over to the school for a fish farm, which caused a great deal of excitement among the boys. Dr. Hora sent an Officer to train the students in fishery, and they constructed the feeding arrangements themselves and manured the tank. An entry from the diary dated 18-9-45 reads:

"It is raining. The Fisheries Officer has instructed the boys to feed the fish regularly. Some of the boys are preparing cow-dung and grass to carry to the pond; I am surprised to see Gurupada and Bejoy taking spades and filling the baskets with manure. Out they go, drenched with rain, carrying the stuff to the pond." In his article: "Fish Farms: Objectives and Requirements". Dr. Hora wrote the following remarks about the Siksha-Satra fish farm: "After my lectures at Sriniketan on Fish Farming in March-April, 1945, the boys of the Village Welfare School, all under 14 years of age, expressed a desire to carry out my suggestions in a practical way and asked their enthusiastic teacher to get a tank attached to the school... During my next visit in August, 1945, the boys were eager to show me their tank, explain what they had been doing, and ask for suggestions for future. The boys had put up a board on a tree showing their proprietory

right to the tank, had set up manure pits and cleaned the sides of tank vegetation... I gave the boys a personal gift of 1,000 fries by paying ten rupees to the Fishery Overseer to cover the cost of the same... In October the previous year's fish had grown to 4 to 5 seers and this year's fish to over a seer. In connection with a feast, the boys sold half-a-dozen older fish and joyfully paraded their catch, as fish over 2 seers had never been taken out of that tank. The boys had gone home for the Puja holiday, but only after making an arrangement with one or two senior boys to look after the tank and fish during their absence. The happiest news that I received from the teacher on this occasion was that the boys were determined to put up manure pits and carry out fish cultural practices in the home tanks during the holidays..."

The boys also enjoy gardening; they work hard and draw the water from a well. In 1945 they won a prize at the Agricultural Exihibition of Sriniketan. Some of the boys have increased the area of their plots and show a spirit of competition. The new-comers are not enthusiastic because their people look down on agricultural work. An interesting trait of the boys is that they will work hard at their own plots, but will slack over a common plot. Last year a large area had been alloted for co-operation farming, but the results were disappointing; each boys was eager over his own, but worked grudgingly on the common property.

Of all the cottage crafts, weaving seems to be the most popular, though clay-moulding with artistic designs is also much enjoyed. It is interesting to notice how new-comers, at first lethargic and hesitant over their clay are gradually imbued with the urge to create. Each boy has his own aptitudes, and many examples might be cited to show how the Siksha-Satra is able to develop the students' individual ability. Boys who probably have seemed very mediocre if subjected to a purely literary education, become engrossed in gardening or the care of livestock, or the practical responsibilities of marketing, and thus become enthusiastic and self-reliant, while at the same time these natural interests form the avenue of approach to the necessary intellectual pursuits.

It has been asked whether so much freedom for the boys is justified. The answer is, of course, *yes*, provided freedom is acquired gradually, each one of the students enjoys freedom to a different degree. Boys come to the school at the age of eight and the years already spent at home make them "problem children"; they already exhibit complexes from having been beaten and suppressed. To such material, freedom cannot be given from the start. It is limited at first, and then gradually extended, as the boys earn the right to freedom by their capacity to use it.

Music is not a popular subject and the boys make but little progress. The music teacher says that their ears are not trained from early life and that there is, moreover, a resistance against music which is said to be a "bad boy's" pastime. But, as time passes and the boys hear good songs, their taste develops and attitude changes, and some want to learn music. The influence of commercially minded parents goes far to account for such poor response.

Dramas, on the other hand, are much liked and the boys are very efficient at staging them, and love taking parts. Painting and drawing have a useful place, though, here again, a resistance has first to be overcome in the new boys. On the other hand, languages, mathematics, sciences, hygiene, etc., are eagerly learnt; there is no resistance to overcome here, though the methods

are at first disliked. The boys start by wanting "ready-made" lessons and only come to love the Siksha-Satra way after a struggle.

The Alochana Sangha (Discussion Group) which holds its meetings once a month, was established for the students to recite poetry, read their own essays and short stories on various subjects, and talk on the lives of great men.

This is a popular institution and often gives the teachers valuable insight into the thoughts of the pupils and their opinions of the value of their school work.

V

OLD STUDENTS

As has already been said, many of the students were obliged to leave the school before completing the prescribed course of training owing to the attitude of their parents; these boys, of course, have lost touch with the school. With regard to those who stayed on at the Siksha-Satra and completed their training, the following notes are of interest:

1. Jnanendra Ghosh, Lal-daha, is now a leader in his own village and has already made for himself a good name for his activities in Welfare and Social Service. He is an organizer of the Visva-Bharati Co-operative Bank, and has started a fish farm; he is also a successful agriculturist.

2. Atul Chandra Ghosh, Lal-daha (younger brother of Jnanendra Ghosh), learnt weaving while at the Siksha-Satra; at present he weaves in his own house and earns a decent living thereby. He has organized a Weavers' Association in his locality and is also a cultivator.

3. Khagendra Nath Ghosh, Lal-daha (younger brother of the other two), learnt carpentry, and has now opened a carpentry shop in his village; he trains apprentices. He is a social worker of great repute; Sriniketan always remembers him during ceremonies and functions where he used to be indispensable.

4. Kalidas Ghosh, Jadavpur, has become a teacher in his old school and is highly respected by everybody. He is most valuable in sports, excursions, dramas, and class work. He is a devoted worker and, thanks to his efforts, his village has progressed very far.

5. Haricharan Acharya, Sattar, has become a well-known organizer in his locality, and is at present the Secretary of the Food Committee of the Sattar Union Board, and the organizer of Home Guards. He, too, is successful agriculturist.

6. Tarapada Majumdar, Kurumba, is now a teacher in the village school and holds many honourable positions.

7. Lakshminarayan Ghosh, Nachan-shaha, has been looking after his land and property, increased his agricultural assets, and is an important person in his neighbourhood.

8. Nanda Dulal Sutra Dhar, Ikshudhara, learnt carpentry at the Siksha-Satra, opened a workshop after going home, and is prospering in his work.

9. Kali Marandi, Balipara, comes of a Santal family and, considering his home environment, it must be admitted that he has improved wonderfully in every way. He is a good sportsman and carpenter, and is the *Sarder* of his *bustee.*

10. Badda Hasta, Bandhlodanga, is also a Santal: he is now a teacher in the village school for Santal children, and earns an extra income by weaving.

11. Urugendra Pal, Bogdora, learnt weaving at school and now works his own loom and earns a decent living with it, He has recently organized a co-operative store and has charge of it; he is, moreover, a good musician and leads the dramatic society of his village.

12. Khagendra Nath Sen, Sonarong, works at present in the office of the *Ananda Bazar Patrika.* He is a good sportsman and plays in A Division of the East Bengal Club.

13. Benukar Bhattacharya, Darandha, has become a very efficient tailor in his village. He is very keen on improving the health of his locality and works enthusiastically for imparting a sense of community hygiene to the villagers.

14. Sirish Chandra Saha, Goalpara, has also become an efficient tailor in his village, and an important person.

15. Gopal Chandra Devanshi, Sarbanandapur, is practising agriculture on his own lands and is also a very good weaver.

16. Abdul Ohab Mulla, Jadavpur, is a teacher in the village M.E. School and the local doctor. He is also the leader of his community.

17. Bamapada Ghosh, Sitalpur, is now a teacher in the local Night School. He has organized a co-operative store of which he is in-charge; he also does leather work and weaving apart from his other avocations.

18. Gurupada Mandal, Narayanpur, is a successful cultivator and earns a good living from his weaving.

19. Dayamay Pal, Ramanagar, has devoted himself entirely to agronomical activities and has considerably improved his financial position.

20. Shekh Alkas, Jadavpur, is an agriculturist and has recently started a business which is thriving. He is, moreover, an important member of his community.

From the above it can be seen that many ex-students have done well, and hold important positions in their own villages and areas. But these are only the senior people who are well-established, while there are many more who are still young and struggling to make a successful career. Others are still pursuing their studies and are developing some special technical knowledge; of these latter, it is hoped the next Bulletin will be able to give an encouraging account.

VI

CONCLUSION

It will be evident from the fore-going chapters that Rabindranath Tagore's school has served the neighbouring rural population in divers ways. While evaluating the results, however, it should be remembered that the founder was much in advance of his times, and that the villagers, to say nothing of the townspeople, must of necessity be slow in appreciating the principles on which the Siksha-Satra was founded.

It must also be confessed that the staff has experimented with new methods and techniques that have not always been successful. The staff is making ceaseless effort to explore the as yet untravelled regions of the human mind at its awakening, on the lines indicated by Tagore. The journey has not yet come to an end, the staff is still exploring and, as time elapses, it is hoped the technique will be perfected and that public mentality will also change with the achievement of national self-government.

In the next few decades one hopes to see the Siksha-Satra of Rabindranath Tagore, taking a leading part in evolving a national system of education; then will the dream of a poet-educationist become a reality.

Reprinted from VIsva-Bharati Bulletin No. 21, January, 1949.

SIKSHA-SATRA
(A Home School for Village Boys)

Siksha-Satra is the natural outcome of some years of educational experiment at Santiniketan and at the Institute of Rural Reconstruction at Sriniketan. Principles upon which it is based are little more than common-sense deductions from the failures and successes of the past.

It is a residential school for village boys drawn from the neighbourhood.

The boys are all from very poor homes and most of them came from the so-called low castes. There are a few Mohomedan students as well.

Here an attempt is being made to give an all-round education to village children and provide them with training which will not only enable them to earn a decent livelihood but also to equip them with the necessary training and creative imagination with which they may help to improve the rural life of Bengal in all its aspects.

The school has been organised as a miniature community. The boys help in cooking their meals, they wash their own clothes, sweep their house, do their marketing on Hat days and keep accounts, they keep a flower garden and all of them learn some trade according to their interests, aptitudes and physical fitness. They elect their own captains and leaders of various activities (commisariat, sports etc.). In fact, they do everything that a village householder is expected to do on a small scale but with greater understanding and efficiency.

The curriculum for the students has been prepared on the basis of our experiences and in many ways, it is fundamentally different from that of the standardised rural school. The literary education is not ignored but more attention is given to the building up of the whole man. The students come from the villages and the fact is never lost sight of that they must go back to their villages after their education in the Siksha-Satra is over.

The extra-curricular activities of the Siksha-Satra are:

1. Industry (Weaving, Carpentry, Book-Binding & Leather work). 2. Gardening. 3. Health and Sanitation. 4. Housecraft & General Management. 5. Sports, Games & Brati-Balaka activities. 6. Educational trips to places of interest. 7. Literary Society. 8. A monthly manuscript magazine– 'Chesta'.

It is between the ages of six and twelve that the growing child is most absorbed in gathering impressions through sight, smell, hearing and taste but more especially through touch and the use of the hands. From the start, therefore, the child enters the Siksha-Satra as an apprentice in handicraft as well as house-craft. In the workshop, as a trained producer and a potential creator, it acquires skill and wins freedom for its hands; whilst as an inmate of the house, which it helps to construct and furnish and maintain it gains expanse of spirit and wins freedom as a citizen of the small community.

Only after it has stored up a certain amount of experience in these different fields, does the child begin to feel a need for their co-ordination, and therefore for the time to record to

relate, to dramatise and to sythesise the discoveries of the senses. Until the child has had intimate touch with the facts and demands of life, it is unfair to demand long hours of concentrated attention upon second-hand facts and figures wholly unconnected with anything it has hitherto encountered and taken note of in real Life.

Industry:

Each boy takes up a craft according to his interest and aptitude and according to the extent to which he can succesfully follow it and earn a decent living. Each craft is considered as a project and treated accordingly; each project is further divided into units of work according to the different processes of the particular craft. For example in Weaving the different processes such as ginning, carding, spinning and the weaving of different cloths are considered as unit. With all these is connected the history and evolution of the weaving.

Industry–even the evolution of man in the use and manufacture of different kinds of cloths–where their raw materials are to be found, how and by whom they are produced— there production in India (the raw materials and finished articles)—the import and export of raw materials–the countries to which they are exported–the people living in these countries etc.

In the carrying out of these crafts, some art, some science, some element of business also enters in. Anyone of the crafts may offer an avenue of approach to the ultimate high road of self-preservation and to self-confidence in his own capacity to achieve economic stability in the future. Without such feeling of confidence in the power to face the fight for livelihood through the skill of trained fingers and hands, it is impossible to achieve that freedom of spirit upon which the fullest enjoyment of life is dependent.

There are few crafts which are not in some way intimately bound up with the life of the country-folk. With each of them there is a grammar of procedure which has to be learnt, *but it is a grammar which is not detached from life* and which has to be learnt at the beginning by trial and error and the bitterness of failure.

Gardening:

Gardening is also run on the same lines as any of the crafts. The inclusion of gardening in rural education is but natural and quite obvious.

The Indian village boy is accustomed to take his part in the duties and privilages of family life, the herding of the cows, the watering and feeding of them. The inclusion of a small Garden within his home compound, properly supervised provides an ample basis for the widest and best form of education by experience. So in the Siksha-Satra it is the individual plot of ground which the basis of much of their reading, of their writing, and of most of their arithmetic.

From the first the child feels that this plot is play-ground as well as experimental farm, where it will try its own experiments as well as carry out the planting, tending and harvesting of some difinitely profitable crop. Under such as system, text books, class-room and formal laboratory go by the board. There remain the garden plot, the plotting shed and the workshop. Records are

kept and reports and accounts written up, revised and corrected, giving scope for *literary training* in most interesting form. *Geology* becomes the study of fertility of the plot; *Chemistry* the use of lime and manures of all kinds, of sprays and disinfectants; *Physics* the use of tools, of pumps, the study of water-lifts and oil-engines; *Entomology* the control of plant pestes (ants, caterpillars, beetles) and diseases (leaf, curl, wilt and bacterial attacks); *Ornithology* the study of birds in their relation first to the garden plot and then to the world in general. There is no room in the Siksha-Satra for Nature-Study as an abstract subject, divorced from life.

Health & Sanitation:

Great stress is laid in the health of the boys. They are taught to form proper health habits, about malaria and its control, First Aid and Village Sanitation.

Housecraft & General Management:

In managing their mess boys learn the value of different foods and about balanced rations. In India, while most of the people suffer from under-nourishment, a great many suffer from malnutrition and it is very necessary that the village boys should know something about the principles of nuitrition and the balancing of food constituents.

Sports Games & Brati-Balaka Activities:

Regular exercise is one of the important features in keeping one's health. Sports & Games are included in the programme for teaching the boys how to use their leisure.

Brati-Balaka activities also improve the physique of the children, foster team spirit and produce an all-round development of the body and creat in their minds the spirit of social service.

Educational Trips to Places of Interest:

These trips have been found to be very important in the education of village children. They provide for a knowledge of the outside world and give them a broader outlook on life. They also give the opportunity to come in contact with people outside their own villages. During these excursions, the boys learn a good many valuable lessons which can not be taught in the class room.

Literary Society:

The boys arrange and hold bi-monthly meetings of their literary society. They conduct their own meetings. The teachers attend these meetings but as mere visitors. Thus they get an opportunity in the art of public speaking.

A Monthly Manuscript Magazine– 'Chesta':

A monthly manuscript magazine called 'Chesta' comes out every month. It provids for creative work of all kinds and gives the boys opportunity to express themselves through writing on different subjects.

Collections:

In order to encourage Nature Study and develop their sense of observation boys are asked to make collections of various things which interest them and which are to be found in the neighbourhood. In doing this they get intimate knowledge of their surroundings— the nature and use of intimate objects and the names and life habits of the plants and animals— and thus begin to take living interest in everything connected with their lives.

Wood

Collection of different specimens of wood. There as so many kind of trees growing around us, but people hardly ever stop to think what *different* purposes they serve. Many cannot distinguish the wood of one tree from that of another. Each kind of wood has its own particular grain—wood rays—hardness, use and value. It is necessary that village boys should get acquainted with all different kinds of wood found in their localities.

Wild flower

Our students as a rule, are very poor at observation. Very often they do not know as to what different trees and plants there are in their villages. They see different kinds of birds at different season of the year, but cannot tell anything about their habits and very often do not even know their names. What particular period different trees come in flower or in fruit, they have but very vague ideas. As regards the wild flowers, they hardly ever notice them. While collecting these flowers, boys not only learn the value of observation—but also begin to appreciate some the beauties of Nature.

Seeds

Every village can distinguish the seeds of different plants—and a few can identify the seeds of the varieties of rice—but hardly any of them are aware of the potentialities of these tiny seeds—the different parts of seeds and their functions—the manner of their germination and the different stages they go through before being fruit—and finally their function in the maintenance of human life.

Manures

One of the reasons why our crops give such poor yields is insufficiency of manures. Acres and acres of land are being impoverished because while crops are being grown on them—they have not been replenished with plant food.

Our farmers do not know how to preserve their manures. There are so many things that are allowed to go waste and which can be used as manures. By making a collection of manures of different kinds, the boys learn the resources that are in the village of plant food.

Soils

In making a collection of soils, the boys learn their properties and the crops that can be grown on them and the manures with which they have to be treated. They also learn how to tell one kind of soil from another as well as their elementary physical and chemical properties.

Cattle feeds

In the villages, the cattle are given very poor food. Except rice straw which even as a roughage is very poor, they are hardly given anything. Only during the ploughing season a bit of oil-cake is added to the straw.

There are no fodder crops raised for the cattle. The result is that the cattle are the poorest in the whole of India. While making a collection of cattle feeds boys are taught the elements of feeding and how to make up a balanced ration at a minimum cost.

While collecting specimens of Concentrates, the opportunity occurs of giving the boys an idea of Commercial Geography.

Leaves & Herbs

India is rich in herbs, but unfortunately, except for a few Kavirajas, very few people can identify them, and as to the medical properties, they are being forgotten. There are hardly any plant, shrub or herb, some parts of which are not used as medicine. This side of rural environment needs to be made most use of and our boys, by collecting leaves and herbs, are being initiated into the elements of Ayurvedic medicine.

Maps & Charts :

Geography is not taught as a separate subject, but is so coordinated with their gardening, wood-work, weaving or other crafts. They visit places of interest in the locality—prepare maps—some have prepared maps of Sriniketan, then of their villages indicating the village lanes, pits and dobas which they realise ought to be filled up—others have prepared maps of this district indicating important places of business—of pilgrimage—administrative and educational centres.

Community & Life :

Students enjoy almost complete self-government and it must be said to their credit that this freedom is never misused. The senior students play the real brother to the young ones, and guide them in their work in the initial stages. Barriers of caste and of religion disappear almost unnoticed, though there is no pressure from the authorities. Boys coming from orthodox homes at first find it rather strange to sit to a meal with others whom they know to be of different caste. Some at the beginning even have their meals separately but such isolation does not last long. They themselves come out and join the others before-long in full cooperative life. One of the biggest problems of our national life is thus being tackled most unobstrusively. We hope, in this and in many other respects, *this small school may effective help in the great work of national regeneration.*

Reprinted from Visva-Bharati Bulletin No. 21, February 1936

লেখক পরিচয়

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্গভূমির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৬৫ সালে বাঁকুড়া জেলার পাঠকপাড়া শ্রীনাথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৩ সালে বাঁকুড়া ইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রথমে সেন্ট্ জেভিয়ার্স এবং পরে সিটি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ সালে তিনি ইংরেজিতে অনার্সসহ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এর এক বৎসর পূর্বে ১৮৮৯ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক হিসাবে রামানন্দের খ্যাতি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। তাঁর মতো নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ সাংবাদিক আমাদের দেশে খুব কমই জন্মেছেন। তিনি 'ধর্মসিন্ধু', 'দাসী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি নানা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় তিনি শিশুপত্রিকা 'মুকুল' প্রকাশ করেন। ১৯০১ সালে সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'র প্রকাশনা এবং সম্পাদনা তাঁর জীবনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্ম ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশনে 'প্রবাসী' যে ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিল তা' সত্যই প্রশংসার্হ। ১৯০৭ সালে রামানন্দ-সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশিত হয়।

সকল বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য সে-যুগের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনেকসময় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ ক'রেছেন। বিশ্বভারতীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করার পর নিজের করণীয় নির্ধারণ ক'রতেন। শান্তিনিকেতন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সব হতে আপন' স্থান ছিল। তাঁর দুই কন্যা সীতা দেবী এবং শান্তা দেবী বিশ্বভারতীর ছাত্রী ছিলেন। ১৯২৬ সালে লীগ অফ নেশনস্ কর্তৃক তাঁর আমন্ত্রণের ঘটনাটিতে ভারতবাসীগণ বিশেষ গর্ববোধ করেন।

আচার্য নন্দলাল বসু ঃ আচার্য নন্দলাল বসু বিহারের খড়গপুরের ১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ক্ষুদিরাম বসুর সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট ইস্কুলে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন ক'রে ১৯০২ সালে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৫ সালে তিনি কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হন। এইসময় তিনি রামায়ণের বিষয়বস্তু অবলম্বন ক'রে নানা চিত্র অঙ্কন করেন এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে 'ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর প্রথম প্রদর্শনীতে তাঁর 'চিতার উপর আরোহণরতা সতী' এবং 'সতীর দেহত্যাগ'- চিত্র দুখানি প্রদর্শিত হয় এবং তিনি ৫০০ টাকার পুরস্কার লাভ করেন।

১৯০৯ সালে আচার্য নন্দলাল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন। এইসময় লেডি হেরিংহামের দলের সঙ্গে তিনি অজন্তায় যান এবং অজন্তার ভিত্তি-চিত্রাবলীর অনুকৃতি অঙ্কনে সহযোগিতা করেন। ১৯১০ সালে শিক্ষা শেষ হবার পর অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় নন্দলালকে শিল্পচর্চার সর্বপ্রকার সুযোগ দান করেন। ঠাকুর পরিবারের কলা এবং কলাবিষয়ক সামগ্রী-সংগ্রহের সূচী (catalogue) প্রস্তুত করার কাজে তিনি আনন্দ কুমারস্বামীকে সাহায্য করেন এবং কুমারস্বামী ও ভগিনী নিবেদিতা-বিরচিত 'Myths and Legends of the Hindus and Buddhists' গ্রন্থখানির জন্য বেশ কিছু চিত্র অঙ্কন করেন। এই সময় নন্দলাল রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজের সংস্পর্শে আসেন এবং বিশিষ্ট শিল্পী ওকাকুরার সাক্ষাৎ লাভ করেন। ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নন্দলাল বসু এবং তাঁর তিন সহকর্মী অসিতকুমার হালদার, বেঙ্কটাপ্পা ও সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত অজন্তায় তাঁদের করণীয় সব কাজ সম্পন্ন ক'রে ফিরে আসেন।

১৯১৪ সালে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ করেন এবং আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা প্রদান করেন। শান্তিনিকেতনে পুরোপুরি কর্মজীবনের আরম্ভ ক'রতে আরো কয়েক বৎসর লাগে। ১৯১৯ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৯২২ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৯২৮ সালে আচার্য নন্দলাল শ্রীনিকেতনে প্রথম হলকর্ষণ উৎসবের বিখ্যাত প্রাচীর চিত্রটি অঙ্কন করেন।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সারা জীবন অগণিত চিত্র অঙ্কন ক'রে গেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের নানা স্থানে, কলিকাতা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে, বরোদার কীর্তিমন্দিরে এবং আরো নানা জায়গায় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর প্রাচীর-চিত্রগুলি আজো তাঁর অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন ক'রছে। ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী আচার্য নন্দলালকে 'দেশিকোত্তম' এবং ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি প্রদানে তাঁকে সম্মানিত করেন। আচার্য নন্দলাল একজন আদর্শস্থানীয় শিক্ষক ছিলেন। মহাপ্রাণ লেনার্ড এল্ম্‌হার্স্ট ঠিকই ব'লেছিলেন, "নন্দলাল নিজেই একটি institution।" দীর্ঘকাল শ্রীনিকেতনের শিল্পসদনের কর্মকাণ্ডে তিনি নানাভাবে সাহায্য ক'রে গেছেন। আচার্য নন্দলাল নিয়মিতভাবে শান্তিনিকেতন থেকে পদব্রজে শ্রীনিকেতনে এসে পরম স্নেহে শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের ছবি-আঁকা শেখাতেন— এ কথা স্মরণ ক'রে শিক্ষাসত্রের সকলেই গর্ববোধ করেন। ১৯৬৬ সালের ১৬ এপ্রিল এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নন্দলালের 'শিল্পকথা' ও 'শিল্পচর্চা' প্রভৃতি গ্রন্থ সুধীসমাজে অত্যন্ত সমাদৃত হ'য়েছে।

লেনার্ড নাইট এল্ম্‌হার্স্ট ঃ লেনার্ড নাইট এল্ম্‌হার্স্ট ১৮৯৩ সালের ৬ জুন ইংলণ্ডের লিট্‌ন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় Y.M.C.A.-এর সদস্যরূপে ভারতবর্ষে আসেন। এইসময় একদিকে যেমন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে, অন্যদিকে তেমনই এই দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে হৃদয় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে উঠেছিল। এরপর ইনি কৃষিবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য আমেরিকার বিখ্যাত কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯২০ সালে আমেরিকা সফরকালে নিউইয়র্কে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই শিক্ষার্থী ইংরেজ যুবকের পরিচয় ঘটে। এইসময় তিনি গুরুদেবের গ্রাম-উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালে তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল। সেই বৎসর ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে এবং মিসেস্ ডরোথি স্ট্রেটের (ডরোথি স্ট্রেট পরে ডরোথি এল্ম্‌হার্স্ট হ'য়েছিলেন) অর্থানুকুল্যে লেনার্ড এল্ম্‌হার্স্ট একদল যুবককে সঙ্গে নিয়ে শ্রীনিকেতনে পল্লীপুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করেন। তিনিই শ্রীনিকেতনের প্রথম ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ। তিন বৎসর একনিষ্ঠভাবে কাজ করার পর তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীনিকেতনের আদর্শ সামনে রেখে সেখানে 'ডার্টিংটন হল' প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এল্ম্‌হার্স্টকে তাঁর ইংরেজি 'রক্তকরবী' 'Red Oleanders' উৎসর্গ ক'রেছিলেন। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারত সরকার গ্রামোন্নয়ন পর্বের কর্মযজ্ঞের সূচনার সময় তাঁর মূল্যবান উপদেশ গ্রহণ ক'রেছিলেন। ১৯৬০ সালে বিশ্বভারতী এই বন্ধুকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিদানে সম্মানিত করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'Rabindranath Tagore: Pioneer in Education' এবং 'Poet and Plowman' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৪ সালে মহাপ্রাণ এল্ম্‌হার্স্ট্ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শ্রীনিকেতনের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীর Political Philosophy-র একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে তিনি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে আসেন এবং শ্রীনিকেতনের শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শকরূপে কাজ আরম্ভ করেন। সেইসময় শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত তিনটি প্রতিষ্ঠান ছিল। সেগুলি হচ্ছে ঃ (১) শিক্ষাসত্র, (২) M.E. বালিকা বিদ্যালয় এবং (৩) একটি প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। কৃষ্ণপ্রসন্ন ১৯৩৭ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শিক্ষাসত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান-গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর 'Our Experiments with Rural Education' প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতন প্রেস থেকে মুদ্রিত হ'য়েছিল। ওই পুস্তিকায় প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায়নি।

প্রেমচাঁদ লাল ঃ ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে যখন লেনার্ড এল্ম্‌হার্স্ট্ শ্রীনিকেতনে পল্লীপুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ ক'রলেন, তখন দেশ-বিদেশের বহু গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি এখানে এসে এই কর্মযজ্ঞে যোগদান ক'রলেন।

সেই সময় প্রেমচাঁদ লাল এসেছিলেন পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে। তিনি ১৯২৩-২৪ সালে শ্রীনিকেতনে আসেন এবং শ্রীনিকেতন ডেয়ারির ভারপ্রাপ্ত অফিসাররূপে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ১৯২৯ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তাঁর উপর শিক্ষাসত্রের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে আবার শ্রীনিকেতনে ফিরে আসেন এবং ১৯৩৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

প্রেমচাঁদ লালের 'Reconstrction and Education in Rural India' গ্রন্থখানির ভূমিকা স্বয়ং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতনের কর্মযজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকমাত্রেরই এখানি একটি অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ।

প্রেমচাঁদ লালের একটি রচনা বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হ'য়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডের 'Siksha-Satra' (A Home School for Village Boys) লেখাটিও তাঁরই রচনা ব'লে মনে হয়।

প্রসঙ্গ : শিক্ষাসত্র

পরবর্তী প্রবন্ধ-সংগ্রহ

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় শিক্ষা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌

শিক্ষাসত্র শান্তিনিকেতন স্কুল স্থাপনের বাইশ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা স্থাপিত দ্বিতীয় স্কুল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতম বন্ধুদের মধ্যে একজনের পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার— যাঁকে তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁর নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকা পাঠিয়েছিলেন— এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত হন। এই স্কুলের শান্তিনিকেতনে অবস্থানের সময়টাতে তিনি অতি অল্পদিন, প্রায় দেড় বৎসরের মতো, এর প্রথম ছাত্র পাঁচ-সাতটি গ্রাম্য বালকের দেখাশোনা করেন, এবং তার পরেই অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর ফলে শান্তিনিকেতনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, যেমন হ'য়েছিল আর-একজন অল্পবয়সী প্রতিভাবান শিক্ষক সতীশ রায়ের মৃত্যুতে।

মজুমদার এই ভার এমন উৎসাহ ও একাগ্রতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রেছিলেন যা শুধু কোনো-একজন পরীক্ষাকর্মী বা মনোবিজ্ঞানী বা মানুষের জীবনধারা ও ব্যবহারপ্যাটার্নের অজানা সূত্রের আবিষ্কর্তার পক্ষেই সম্ভব। সেই পরিণতিশীল ছাত্রগুলির জীবনে উন্নতির যে-সমস্ত সম্ভাবনা, তাদের যে-সব ব্যক্তিগত বাধা ও সমস্যা তিনি দেখেছিলেন, সেগুলির সমাধানের জন্য যে-সমস্ত উপায় তিনি অবলম্বন ক'রেছিলেন ও তা থেকে যা ফল পেয়েছিলেন— তার একটি অতি সযত্ন-রক্ষিত দৈনিকবিবরণী তিনি রেখে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই স্কুলের উপর সর্বদা একটি সজাগ সন্নিকট দৃষ্টি রাখতেন। A Poet's School প্রবন্ধে তিনি মজুমদারের এই প্রয়াস ও আবিষ্কার-প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা ক'রেছেন; এবং এর দ্বারা একে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শান্তিনিকেতন-এক্‌স্‌পেরিমেন্টের একটি নব পর্যায়ের মর্যাদা দান ক'রেছেন।

মজুমদারের মৃত্যুর পরে শিক্ষাসত্র নামে এই স্কুলটি শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয় এবং বর্তমানে সেবাগ্রামের খ্যাতিমান অধ্যক্ষ শ্রী ই. ডব্লিউ. আর্যনায়কমকে এর ভার অর্পণ করা হয়। অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যাঁরা তাঁর পরে এই পরীক্ষা চালান তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় ডাঃ পি.সি. লালের। তিনি ইংলণ্ড থেকে তাঁর Reconstruction of Rural India নামে পুস্তকখানি প্রকাশ করেন; এই বই-এ তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাসত্র পরীক্ষার একটি সুবিস্তৃত বিবরণী আছে। আর নাম করা যায় ডাঃ ডি.এম. সেনের— যিনি শিক্ষা-প্রকর্তা (administrator) হিসাবে খ্যাতি অর্জন ক'রেছেন। এ ছাড়া বিশ্বভারতীর মহানুভব বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক শ্রী এল.কে. এল্‌ম্‌হার্‌স্ট স্কুলের প্রথম থেকেই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

এইসমস্ত থেকে বুঝতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপরীক্ষণের মধ্যে এই স্কুলের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, এবং এই স্কুলের উদ্দেশ্য ও কৃতির কথা বাদ দিয়ে তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত সন্ধান ও আবিষ্কারের কোনো বিবৃতিই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।

এই স্কুলের কর্মধারার একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হবে বোধহয় বর্তমান লেখক ১৯৪২ সালে এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত থাকার সময় এর আঠারো বৎসর ব্যাপী (১৯২৪-৪২) জীবন ও কর্মধারার যে বিবরণী প্রস্তুত ক'রেছিলেন তার থেকে নির্বাচিত প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি এখানে সাজিয়ে দেওয়া।

পরবর্তীকালে অধিকসংখ্যক ছাত্র গ্রহণের উপযোগী করে স্কুলটিকে পুনর্গঠিত করা হ'য়েছিল এবং এটি বর্তমানে পুরোপুরি একটি সর্বার্থসাধক (multipurpose) স্কুল হিসাবে কাজ ক'রছে। একথা নিশ্চয় যে বর্তমানে এটি এর পরীক্ষণধর্মিতা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখনো প্রথম যুগ থেকে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকার ফলে সত্রের বৈশিষ্ট্য অনেক অংশে বজায় থেকে গিয়েছে।* যথা ঃ দৈনন্দিন কর্মসূচী ও সমষ্টিজীবনের কয়েকটি

---

* শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকালিদাস ঘোষ

ধারা, বিশেষ কতকগুলি প্রোজেক্ট, স্বাবলম্বন পরিকল্পনা-সম্পর্কিত কাজকর্ম এবং বিশেষ ক'রে এমন কয়েকটি কাজ ও দায়িত্ব যার মধ্য দিয়ে স্কুলের ভিতরের জীবনের সঙ্গে আশপাশের বৃহত্তর সমাজজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হ'তে পারে।

অল্প পরিবর্তিতভাবে পূর্বোক্ত বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি দেওয়া হ'ল।

শান্তিনিকেতন স্কুল

শান্তিনিকেতন স্কুলে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা হ'য়েছিল যা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে ব্যক্তি-চরিত্রের স্বাধীন বিকাশের সহায়ক হ'য়েছিল। শিক্ষক এবং ছাত্র উভয় পক্ষেরই মনোভঙ্গীতে একটা আমূল পরিবর্তনের সূচনা করা হ'য়েছিল। পরিবেশ তৈরি করা হ'য়েছিল মামুলি নয় একেবারে নূতন উপাদানের দ্বারা, এমন সমস্ত প্রবৃত্তি ও কাজের দ্বারা যা জীবনের একেবারে নিজস্ব, যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনের উত্তাপ ও বর্ণবৈচিত্র্য আছে। এমনভাবে এটিকে গ'ড়ে তোলা হ'য়েছিল যেন তা একটি আদর্শ গৃহজীবনের সমস্ত আনন্দময় ও সৃষ্টিশীল অভিজ্ঞতাগুলিকে ধারণ ক'রতে পারে। অপর পক্ষে এমন ব্যবস্থা রাখা হ'য়েছিল যাতে সাহিত্য সঙ্গীত নাট্যাভিনয় উৎসব ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিশুমনের সংবেদনশীলতা, তার অনুভূতির সদ্যতা (freshness) ও প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্তির রক্ষণ ও বর্ধন হ'তে পারে। যেন তার ফলে শিশুর মন ভিতর থেকে বার হ'য়ে এসে বাইরের জগতের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এবং তার সঙ্গে স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা ও বিচিত্র যোগসাধনের ফলে নিজের স্বাধীনতা লাভ ক'রতে পারে। এইভাবে যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই জগতে শিশুদের সত্যকার গৃহপ্রত্যাবর্তন— পরবাসীর ঘরে ফিরে আসা— তারই জন্য একটি অঙ্গন রচিত হ'য়েছিল।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ই বহুল পরিমাণে গুরুদেবের প্রত্যাশাগুলিকে সার্থক প্রমাণিত ক'রেছে। সেখানে প্রমাণিত হ'য়েছে যে সত্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয় শুধুমাত্র কবির কল্পনাতেই নয়, বাস্তবজীবনেও সম্ভব। দেখা গেছে যে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের কোনো স্বতঃ-বিরোধ নেই, এবং উপযোগিতার সঙ্গে শুদ্ধচিন্তার সমন্বয়সাধন অসম্ভব নয়।

এই আদর্শটির আসল রূপ কি ছিল? এই আদর্শ ছিল ভালোবাসার, প্রেমের। শান্তিনিকেতনের জন্ম এই প্রেম থেকে— মানুষের প্রতি কবির প্রেম। তার জীবনকে যা পুষ্ট ক'রেছিল তা হ'চ্ছে সেইসব শিক্ষকদের ভালোবাসা যাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ আনন্দ-মুহূর্তগুলির বিচিত্র সম্ভার সকলের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে চেয়েছেন, আর সেই সমস্ত তরুণ ছাত্রদের ভালোবাসা যারা কৌতূহল ও বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে জীবনের যা কিছু মহৎ দান তা গ্রহণ করবার জন্য সমবেত হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখিয়েছেন। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে ভালোবাসা যেন একটি এ্যাডভেঞ্চার— ভালোবাসার বস্তুকে সক্রিয়ভাবে অনুসরণ। এর লক্ষ্য থাকে কোনো বস্তুগত সুখের দিকে, ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার দিকে। এর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপটি হচ্ছে এমন একটি সৃষ্টিশালী শক্তি যা সেবায় কিম্বা মানব-প্রগতির জন্য সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে। কিন্তু প্রাচ্যে "প্রেম শুধুমাত্র বস্তুগত কল্যাণের আকাঙ্ক্ষার দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়। তার বিস্তৃতি শুদ্ধ আনন্দলোকে, যে আনন্দ কেবল জ্ঞানের চেয়ে বেশী,

যা হ'ল প্রজ্ঞা।" শান্তিনিকেতনের সমস্ত পরিবেশটি এই ভালোবাসার নিঃশ্বাসে পূর্ণ। আর ভিন্ন পরিবেশ থেকে শান্তিনিকেতনে প'ড়তে-আসা ছাত্ররা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের কাছে একেবারে অপরিচিত একটি প্রেরণা ও অভিজ্ঞতার উপস্থিতি একরকম ক'রে টের পেয়ে যায়। তারা বিশুদ্ধ রসতাত্ত্বিক (aesthetic) আবেদনে সাড়া দিতে শেখে, আর শেখে সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণের দিক থেকে যা সম্পূর্ণ নিস্ফল এমন সব ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে অংশগ্রহণ ক'রতে।

সত্রের উৎপত্তি

শান্তিনিকেতন স্কুল যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করা সত্ত্বেও কবির সত্যানুসন্ধান আত্মতুষ্টির মধ্যে থেমে থাকতে পারে নি। বরং অভিজ্ঞতার ফলে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল সে সম্পর্কে একজন নিষ্ঠাবান্ পরীক্ষাকর্মীর অধৈর্যই তিনি অনুভব ক'রেছেন, এবং সেগুলিকে দূর ক'রতে না পারা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হ'তে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতন স্কুলটি তার নিজের অগ্রগতির ধারাটি বজায় রাখুক, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিদ্যালয়কে তার সাফল্যের জন্য একটি গুরুতর মূল্য দিয়ে হ'য়েছিল। নানা ধরনের অবাঞ্ছিত প্রতিশ্রুতি ও আপোষের বন্ধনে তাকে বাঁধা প'ড়তে হ'য়েছিল। অভিভাবকদের নির্বন্ধাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাপ্রথাকে স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল। তাছাড়া অর্থাভাবমোচনের জন্য একটু বেশী সংখ্যায় ধনী পরিবারের ছাত্র ভর্তি করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল— এবং তারা তাদের পরিবারের জীবনযাপনপ্রণালীর প্রভাবে গুরুদেব এখানে যে ব্যবস্থা পাকা ক'রে তুলতে চাইছিলেন তার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে ক্রমেই অসমর্থ হ'য়ে উঠেছে দেখা গেল। কবি নিজেই ব্যাপারটা এইভাবে বুঝিয়ে ব'লেছেন— "আমার সামনে বাধা ছিল অসংখ্য। সমাজের শিক্ষাভিমানী অংশের নানারকমের প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস, অভিভাবকদের প্রত্যাশা, শিক্ষকদের নিজেদেরই পূর্বশিক্ষার ফলে ব্যক্তিত্বের গঠন, নিয়মতন্ত্রের অধীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত দাবী ও নিয়মকানুন— এ সবই আমি মনে যে ভাবটি পোষণ করছিলুম তার বিরুদ্ধে যেন অপ্রতিরোধ্যভাবে একত্রিত হ'য়েছিল। এ ছাড়া আমাদের অর্থভাণ্ডার যা আমাদের স্বদেশবাসীর কাছ থেকে অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হ'য়েছিল বলা যায়, তা এই প্রতিষ্ঠানটির পোষণের পক্ষে ছিল একেবারেই অপ্রচুর। কারণ এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যিক।"

এই আদর্শটিকে কাজে পরিণত করার স্বাধীনতালাভের জন্য কবি নিজেই ব'লেছেন যে তিনি ১৯২৪ সালে আর একটি স্কুল স্থাপন করেন— "অল্প সংখ্যক কয়েকটি ছাত্র নিয়ে, যারা হয় ছিল মাতৃপিতৃহীন, কিম্বা যাদের বাপ-মা এতই নিঃস্ব ছিল যে যে-কোনো ধরনের স্কুলে তাদের পাঠানোই তাদের সাধ্যের অতীত ছিল।"

এই নূতন স্কুলের নামই রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন শিক্ষাসত্র।

শিক্ষাসত্রের আদর্শ

শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষাপদ্ধতির কিছুটা সংস্কারসাধন, শান্তিনিকেতনের পরীক্ষাটিকে একটি আরো অনুকূল ভূমিতে পুনঃরোপণ। এইসঙ্গে যাতে তা শান্তিনিকেতন থেকে ভিন্ন নূতন ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যকে রূপ দিতে পারে সে চেষ্টাও ছিল। সংস্কার-সাধনের কাজ করা হ'য়েছিল শান্তিনিকেতন স্কুলের কতকগুলি গুরুতর বাধা দূর ক'রে; পরীক্ষাফল, ব্যবহারিক জগতে এই শিক্ষার মূল্য ইত্যাদি কৃত্রিম সমস্ত উদ্দেশ্যের ছায়াপাত থেকে এর আকাশকে মুক্ত ক'রে; সবরকমের বাঁধাধরা কাজ বা সামরিক যন্ত্রীকরণ (regimentation) এড়িয়ে, শিক্ষকের দ্বারা পাঠক্রম,

কাজের সময়, শিক্ষাপদ্ধতি কিম্বা সময়ানুপাতে উন্নতির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে যে-কোনো রকম উপর থেকে জোর ক'রে আরোপের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে দূর ক'রে দিয়ে; এমন সব ছাত্র ভর্তি করা যাদের অভিভাবকদের নির্বন্ধ শিক্ষাকর্মী ও পরীক্ষকের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করবে না; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হ'ল এই যে, এই স্কুলের পরিচালকদের একেবারে অপরিমিত এক্‌স্‌পেরিমেন্টের সুযোগসুবিধা দেওয়া। এর অর্থ হ'ল এই যে, শান্তিনিকেতনে অবস্থার বৈগুণ্যে পরীক্ষার যে সুযোগসুবিধা খুবই সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছিল সত্রে ব্যবস্থা হ'ল তার সমস্ত পথই খোলা রাখার, এবং এই মূল পরীক্ষার পক্ষে আবশ্যিক নয় এমন সমস্ত বিচার-বিবেচনাকেই আমল না দেওয়ার। এমন কি আর্থিক দিকটিও সুনিয়ন্ত্রিত রাখবার চেষ্টা হ'ল স্কুলটিকে যথাসম্ভব ছোট রেখে।

আর নূতন বৈশিষ্ট্য যোগ হ'ল এই যে হাতের কাজকে, নানাধরনের শিল্পকে একটি স্থান দেওয়া হ'ল যাতে এইগুলির মধ্য দিয়ে ছাত্ররা চারিদিকের জগতের সম্বন্ধে একটা সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে পারে।

কবি লিখেছেন, "আমি আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে এই আয়োজনই আমি যথেষ্ট ব'লে মনে করি নি এবং আমি অপেক্ষায় ছিলুম এমন মানুষ ও সুযোগসুবিধার যার সাহায্যে এই স্কুলে প্রবর্তিত করা সম্ভব হবে কাজের একটি সদাসক্রিয় উদ্যম, উদ্ভাবন ও গঠনশক্তির সানন্দ ব্যবহার যা চরিত্রকে গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং অবিরাম সচলতার দ্বারা অতি স্বাভাবিক ভাবেই মলিনতা জীর্ণতা ও মৃত্যুর সমস্ত আবর্জনাকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেয়। তার মানে আমি বরাবরই অনুভব করেছি পাশ্চাত্য প্রতিভার প্রয়োজনীয়তা আমার এই শিক্ষাদর্শের মধ্যে একটা বাস্তব সত্যের শক্তি এনে দেবার জন্যে— যে শক্তি পথের সমস্ত বাধা দূর ক'রে একটি নির্দিষ্ট ও বাস্তব কল্যাণের দিকে এগিয়ে যেতে জানে।"

গুরুদেবের আদর্শের এই নতুন উপাদানটি নির্ভুলভাবে বোঝা একান্ত দরকার। তিনি এখানে একটি বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের প্রবর্তন ক'রতে চাইছেন না, তিনি চাইছেন উদ্ভাবনশীলতা ও নবরচনার মধ্য দিয়ে বাইরের জগতের সকল অবস্থায় মন যাতে নিপুণভাবে সাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এককথায় তিনি চাইছেন রবিন্‌সন ক্রুসোর মত মানসিক সক্রিয়তা।

এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে যে কাজগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাধারণ গুরত্ব লাভ ক'রল সেইগুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুরুদেব ও ডিউইর চিন্তার অতি আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। গুরুদেব খোঁজ ক'রছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার ঐতিহ্যে বেড়ে-ওঠা এবং সবরকম শিক্ষাপ্রদ কাজের ব্যাপারে স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনো-একটি মানুষের সাহায্য। এবিষয়ে আলোকপাত ক'রতে ডিউইর চেয়ে যোগ্যতর কেউই নেই। কাজ বা occupation সম্বন্ধে ডিউইর মতামত কিছুটা উদ্ধৃত করা হ'ল, এবং এর থেকেই বোঝা যাবে যে গুরুদেবের উল্লিখিত চিন্তাভঙ্গির সঙ্গে সাধারণ মনোভাব এবং সূক্ষ্ম ফলাফল বিচার-- দু'দিক দিয়েই এর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। "পরিবেশের প্রভাবে উৎসারিত কাজের মধ্য দিয়েই মানুষকে বরাবর তার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রগতির চেষ্টা ক'রতে হ'য়েছে। এই ধরনের কাজের মধ্য দিয়েই চিরকাল মানুষ তার প্রকৃতিক পরিবেশের বুদ্ধিগত ও ভাবগত ব্যঞ্জনাশক্তির সাধনা ক'রে এসেছে। শিক্ষাবিৎ-এর ভাষায় ব'লতে গেলে এর মানে হ'চ্ছে এই যে স্কুলে এই কাজগুলি শুধু সময়-তালিকার অন্তর্গত কতকগুলি ক্রিয়াকৌশলেই পর্যবসিত হবে না, এর দ্বারা রান্না, সেলাই, কাঠের কাজ প্রভৃতি কারিগরি শিল্পের নৈপুণ্যই শুধু ছাত্রদের দেওয়া হবে না। বরং এই কাজগুলিকে ক'রে তুলতে হবে এমন কতকগুলি সক্রিয় আত্মনিয়োগের কেন্দ্র যার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সমস্ত উপাদান ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগের সুযোগ পাওয়া যাবে, এবং চিন্তা কল্পনার এমন সব আদিভূমি পাওয়া যাবে যেখান থেকে ছাত্রের মন মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্তনের রাজ্যে বেরিয়ে যেতে পারবে নূতন-নূতন সত্যের আবিষ্কারে।"

দেখা যাচ্ছে এতে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোনো স্থান নেই। প্রশ্ন হচ্ছে কেমন ক'রে আমরা গঠনশীল কল্পনাকে উদ্দীপিত ক'রব। কল্পনা— তা সে অমূর্তভাবস্তরেই হোক বা দৈনিক ব্যবহারিক জগতেই হোক— শুধু একটা মানস-ভঙ্গী নয়। এটা বাইরে থেকে কারুকে দেওয়া যায় না। একমাত্র উপায় হ'চ্ছে এর পথকে সমস্ত বাধামুক্ত করা এবং স্বভাবতই উদ্দীপক একটি পরিবেশ গ'ড়ে তোলা। গুরুদেবের ভাষায় এইরকম পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় "তার (সেই পরিবেশ) থেকে 'রেডি-মেড' বা তৈরি জিনিসপত্রের ছেদহীন অত্যাচারকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত ক'রে, প্রত্যেককে কৃতিত্ব ও সাফল্যের বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে নিজের শক্তি-সামর্থ্য আবিষ্কারের নিরন্তর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে।" এই ব্যবহারিক কর্মসফল কল্পনা বন্ধনমুক্ত হ'লে জীবন আর বস্তুভার-প্রপীড়িত থাকবে না, "অতি সুষ্ঠুভাবে তা নিজের ভার নিজে বহন ক'রবে।" তার ফলে দৃষ্টি-পরিধির এমন একটি সুস্থ সামগ্রিকতা সম্ভব হবে যার মধ্যে সভ্যতার সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষ অনতি-সভ্যতার উদ্দাম প্রাণময়তার সঙ্গে সুসমঞ্জসভাবে মিলতে পারবে। মানুষ, গুরুদেবের ভাষায়, তখনি হ'তে শিখবে "প্রাণের দিক্ থেকে বর্বর আর মনের রাজ্যে সভ্য", "প্রকৃতির সঙ্গে প্রাকৃত আর মানুষের সঙ্গে মানবিক।"

এল্ম্হার্স্টের প্রভাব

গুরুদেবের পরেই এই এক্স্পেরিমেন্টটির উপর যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশী তিনি হ'লেন শ্রী এল. কে. এল্ম্হার্স্ট। এই ইংরাজ ভদ্রলোক কেমন ক'রে সত্রের সঙ্গে জড়িত হ'লেন এবং তার ভবিষ্যৎ রূপায়ণের পরিকল্পনা রচনা ক'রলেন গুরুদেবই তাঁর বর্ণনা করেছেন :

"অবশেষে সাহায্য পাওয়া গেল এক ইংরাজ বন্ধুর কাছ থেকে; বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পল্লী-উন্নয়ন বিভাগটির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ক'রলেন। আমার মত তিনিও বিশ্বাস করেন এমন ধরনের শিক্ষায় যা মানুষের ব্যক্তিসত্তার অবিভাজ্য সামগ্রিকতাকে মানে এবং জানে যে তার সুস্থজীবনের জন্য দরকার তার সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলির ব্যাপক উদ্দীপন।"

এল্ম্হার্স্ট সত্র সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা Siksha-Satra a Home School for Orphans নামে একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন, সত্র প্রতিষ্ঠিত হবার কয়েকমাস পরে ১৯২৪ সালের Visva-Bharati Quarterly র এক সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের একটা বিশেষ মূল্য আছে, তার কারণ প্রথমত এর নিজস্ব মূল্য এবং দ্বিতীয়ত সত্র প্রতিষ্ঠার পেছনে যে চিন্তাধারা ছিল এর মধ্যেই পাওয়া যায় তার প্রথম লিখিত বিবরণ। গুরুদেবের যেসব চিন্তার কথা আগেই বর্ণনা করা হ'য়েছে এবং যা সত্রের পরিণতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ক'রেছিল একেবারে তার সূচনা থেকেই সেগুলি আরও পরে তিনি A Poet's School নামে প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ক'রেছিলেন। আর এই দুটি প্রবন্ধেই একত্রে গ্রথিত হ'য়েছিল ১৯২৮ সালে প্রকাশিত Visva-Bharati Bulletin No. 9 এ।

সেইসময় আমেরিকা ও ইংলন্ডে শিক্ষার যে প্রগতিবাদ দ্রুত বিস্তার লাভ ক'রছিল এবং একটি নতুন শক্তিশালী আন্দোলন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ ক'রেছিল, শ্রীএল্ম্হার্স্টের মতামত ছিল তারই Experimentation বা পরীক্ষণশীলতার একটি চরম সমর্থন; "স্বাধীনতা" নীতি ও পাঠসূচীর বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের উপর এমন অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ যা হয়তো রবীন্দ্রনাথের মত ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুযায়ী ছিল না। কিন্তু এ শুধু এক্স্পেরিমেন্টটির কয়েকটি দিকের উপর কিছু কম বা বেশি জোর দেবার প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসুলভ ঔদার্যে শিক্ষাসত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তার নিজের পরিণতির পথ ও স্বাভাবিক প্রকাশরূপ খুঁজে নিতে।

শিক্ষাসত্র ও কাজকর্মের বর্ণনামূলক বিবরণ

জুলাই ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ এর মাঝামাঝি পর্যন্ত :— এইসময় ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। এর আগেই তিনি শান্তিনিকেতনে কয়েক বছর শিক্ষকতা ক'রে সুখ্যাতি লাভ ক'রেছিলেন। এবং আমেরিকার কোনো-একটি কলেজ থেকে তিনি কৃষিবিদ্যাও শিক্ষা ক'রেছিলেন।

দুটি কারণে এই সময়টি আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে দাবী করে। প্রথমত এই হ'ল এক্‌স্‌পেরিমেন্টের আরম্ভ, এবং সবরকমের প্রতিষ্ঠানই তাদের জীবনের প্রথম কয়েক বছর নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশেষভাবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া সত্রের অবস্থান তখন ছিল শান্তিনিকেতনে, যেখানে পুরানো ইস্কুলটির সঙ্গে নিরন্তর একটি তুলনামূলক সমালোচনা এড়াবার কোনো উপায় ছিল না। দ্বিতীয়ত এইসময় সত্রের সৌভাগ্য হ'য়েছিল গুরুদেবের ও শ্রীএল্‌ম্‌হার্‌স্টের কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশ লাভ করা। গুরুদেব তাঁর A Poet's School-এ যেসব মন্তব্য ক'রেছেন তা এই সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শিক্ষাসত্র ১৯২৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে ছটি মাত্র গাঁয়ের ছেলে নিয়ে কাজ শুরু ক'রেছিল; এর মধ্যে দু'জনের বয়স ছিল সাত, তিনজনের নয় এবং একজনের সাড়ে দশ বৎসর। নয় বছরের ছেলেগুলির মধ্যে একজন চার মাস বাদে চ'লে যায় এবং তার জায়গায় ছয় বৎসর বয়সের এক খাসিয়া ছেলেকে ভর্তি করা হয়। এই ছাত্রদের চারজনের বাড়ি বীরভূম, আর অপর দুটি এসেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে। খাসিয়া ছেলেটিকে বাদ দিলে অপর ছেলেগুলির জাত ছিল আলাদা আলাদা : ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা বা শুঁড়ি ইত্যাদি। প্রথম থেকেই সত্র ছিল আবাসিক। সব ছেলেকেই একসঙ্গে থাকতে, খেলতে ও কাজ ক'রতে হ'ত এবং জাতি ধর্ম হিসাবে কোনরকমে প্রভেদ রক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হ'ত না।

বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য

১৯২৬ সালের ১২ই মে সন্তোষ মজুমদার তাঁর প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী কাজ ও অভিজ্ঞতার একটি বিবরণী দাখিল করেন। এর নাম তিনি দেন : The Siksha Satra— An Experiment in Village Education. সত্রের পরীক্ষণ-ধর্মিতার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে গুরুদেবের মতামত আগেই বলা হ'য়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে যে এই এক্‌স্‌পেরিমেন্ট সাধারণভাবে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে— তা সেই শিক্ষা গ্রাম বা সহর থেকে আসা যে-কোনোরকম ছাত্রকে নিয়েই হোক্, না শুধু গ্রামীণ শিক্ষা সম্পর্কে, যেমন মজুমদার চেয়েছেন? এই দ্বিতীয় মতটির কোন সমর্থন গুরুদেব বা এল্‌ম্‌হার্‌স্টের প্রবন্ধে নেই। বরং গুরুদেব স্পষ্টই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, সত্র শান্তিনিকেতন এক্‌স্‌পেরিমেন্টটিরই একটি পরবর্তী পর্যায়, এবং এল্‌ম্‌হার্‌স্ট তাঁর সমস্ত সিদ্ধান্তই উপস্থিত ক'রেছেন শিক্ষার একান্ত সার্বিক নীতিগুলি সামনে রেখে। কিন্তু ছেলেদের কর্মসূচী তৈরি করবার সময় এল্‌ম্‌হার্‌স্ট অবশ্য বিশেষভাবে স্মরণ ক'রেছেন তাদের পল্লী পরিবেশ। এটা যে উচিত কাজই হয়েছে সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। এ ছেলেরা এসেছিল পল্লী অঞ্চল থেকে এবং তাদের ফিরেও যেতে হবে একদিন পল্লীতে; কাজেই তাদের কাছে সুপরিচিত কর্মধারার মধ্যে দিয়েই যেন তারা নিজেদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারে সেই চেষ্টা করাই শিক্ষকের পক্ষে ছিল সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ। কিন্তু এই উপায় ও উপকরণ যাই হোক্ না কেন, লক্ষ্য নিশ্চয়ই ছিল General Education বা সাধারণ শিক্ষা। মনে হয় পল্লীশিক্ষা কথাটি মজুমদার অনেকটা না ভেবেই ব্যবহার ক'রেছেন, তাঁর বলবার কথা ছিল এইমাত্র যে সত্রের অধিকাংশ ছেলেই গ্রামের।

কিন্তু অসতর্ক ভাষা ব্যবহারের ফলে পরবর্তীকালে যথেষ্ট ভুল বোঝার সূত্রপাত হ'য়েছিল।

সত্রের আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ণয়ে মজুমদার গুরুদেব ও এল্‌ম্‌হার্‌স্ট দুজনের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, কিন্তু পাঠ-সূচী, ক্রাফট্‌ (শিল্প) শিক্ষা এবং শিক্ষা-পদ্ধতির সম্পর্কে নানা সমস্যা সম্বন্ধে তিনি নিজে যে বিশেষ ভেবেছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি এল্‌ম্‌হার্‌স্ট-প্রবর্তিত কর্মপরিকল্পনাটি গ্রহণ ক'রে তাকেই যথাসাধ্য রূপায়িত করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন; কিন্তু এ সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা একবারও তাঁর মনে ছায়াপাত ক'রে নি যে, সমস্ত শিক্ষাপ্রক্রিয়াটি বারবার মূল নীতিগুলির সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে কালক্রমে এই কার্যধারার বিভিন্ন অংশগুলি মূল আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

মজুমদার সম্বন্ধে শেষপর্যন্ত যা বলা যায় তা হ'চ্ছে এই। এই এক্‌স্‌পেরিমেন্টের পরিকল্পনায় তাঁর কোনো হাত ছিল না। তাঁর একমাত্র দায়িত্ব ছিল এল্‌ম্‌হার্‌স্টের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার। শিক্ষার মূলনীতি ও আদর্শ বিষয়ে অবশ্য তিনি মুখ চাইতেন গুরুদেবের। তাঁর নিজের বিবৃতিতে তিনি গুরুদেব ও এল্‌ম্‌হার্‌স্টের মতামতের উল্লেখ ক'রেছেন এবং তার শেষের দিকে লিখেছেন, "আমার স্থির বিশ্বাস এই যে শিক্ষাসত্র যে মূলনীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত (দ্র: Siksha-Satra: A Home School for Orphans by Elmhirst in Visva-Bharati Quarterly in 1924) সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভরযোগ্য এবং সত্রে যেভাবে জীবন-যাপনের ব্যবস্থা আছে ও যেসব পদ্ধতির প্রয়োগ করা হ'য়েছে তাতে শিশুদের পরিণতির পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল অবস্থারই সৃষ্টি করা হ'য়েছে।"

এ বিষয়ে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে ১৯২৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে তিনি সত্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রেছেন এইভাবে :

"আধুনিক মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা-পদ্ধতি ও সমসাময়িক জীবন পরিবেশের কথা স্মরণ রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন পথনির্দেশ।"

সাধারণ সংগঠন

এই ইস্কুলটির সাধারণ সংগঠন ব্যাপারে এমন অনেক কিছুই ছিল যে সম্বন্ধে গুরুদেব বা এল্‌ম্‌হার্‌স্ট কিছু বলেননি। মজুমদারও নীরব ছিলেন এক্‌স্‌পেরিমেন্টের এইসব দিক সম্বন্ধে। সবশুদ্ধ কত ছাত্র ভর্তি করা হবে, ভর্তির বয়স কি, সত্রের পূর্ণ পাঠকাল ক'বৎসর— এই সব বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় নি। তাঁর বিবরণীর শেষে মজুমদার আরও বেশি ছাত্র— "আরও কিছু ছেলে ও মেয়ে" নেবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছেন। কিন্তু এই আরও যে ঠিক ক'জন পর্যন্ত হতে পারে তা জানবার কোনো উপায় নেই। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য এই যে আরও কিছু "ছেলে ও মেয়ে" কথাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তিনি সত্রে সহশিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন।

ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন

ছটি ছেলে থাকত শান্তিনিকেতনের একটি বাড়িতে। রান্নাঘরের ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছিল তাদেরই হাতে। রাঁধা-বাড়া যা কিছু কাজ ছিল তা তারাই ক'রত। তা ছাড়া তাদের "আরও দায়িত্ব ছিল নিজেদের আবাসস্থান ও আশপাশের জমি পরিষ্কার রাখা, বাসনপত্তর মাজা ও নিজেদের কাপড়-চোপড় কাচা, জিনিসপত্তর আসবাব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা এবং নিজেদের হাট-বাজার সমস্ত নিজেরাই করা— এককথায় গৃহস্থালীর ব্যবস্থাপনা ও প্রতিদিনের যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই নির্বাহ করা।"

এই সব কাজে নিশ্চয়ই তাদের অনেক সময় চলে যেত, বিশেষত প্রথম দিকে যখন এই গৃহস্থালীকর্মে ছেলেরা ছিল একেবারেই অনভিজ্ঞ ও নতুন ব্রতী।

কিন্তু অল্পদিনেই তারা কেমন ক'রে এই সমস্ত কাজ অল্প সময়ে আরও নিপুণভাবে করা যায় তা শিখে নিয়েছিল। মজুমদার স্বীকার ক'রেছেন— "রান্না আর বাসন ধোয়ায় প্রায় আমাদের সমস্ত দিনটাই কেটে যেত— তার থেকে আমরা কোনক্রমে ঘণ্টাখানেক সময় বাঁচাতুম বাগানে কাজ করার জন্য। এখন কিন্তু আমরা দিনের অর্ধেকটা সময়ই নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার ক'রতে পারতুম।"

সকালে যে সময়টুকু পাওয়া যেত তার সমস্তটাই দেওয়া হ'ত তাঁতের কাজে; আর বিকালে এক থেকে দুই ঘন্টা রাখা ছিল পড়াশোনার জন্য। ছেলেদের নিজেদেরই অনেকগুলি বাগান ছিল আর সেখানে তাদের প্রায় প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু ক'রতেই হ'ত। সূর্যাস্তের পরে তাদের কাজ ছিল রান্নাঘরে এবং তখন আর অন্য কিছু করবার ছিল না। কিন্তু কখনও-সখনও তাদের এই রান্নাঘরের কাজের মধ্যে হয়ত কোনো শিক্ষক তাদের মহাভারতের গল্প প'ড়ে শোনাতেন। রাত্রে খাওয়ার পরে এই ছেলেরা রাত ৯টা পর্যন্ত বসে কাজ ক'রত— মজুমদারের ভাষায় "তাদের চারপাতা হাতের লেখা লেখবার জন্য :— যদিও আধপাতা লিখলে আমি সন্তুষ্ট হ'তুম।"

এই যে জীবনের বর্ণনা করা হ'ল তার একঘেয়ে ভাব দূর করবার চেষ্টা করা হ'ত সপ্তাহে একবার ক'রে তাদের কোথাও বাইরে নিয়ে গিয়ে, তা ছাড়া মাঝে-মাঝে দূরে কোনো জায়গায় ভ্রমণের আয়োজন করা হ'ত। এই প্রসঙ্গে মজুমদার ব'লছেন "সপ্তাহে অন্ততঃ একবার একটি পুরো সকাল বা বিকাল এই বাইরে যাওয়ায় কাটিয়ে দেওয়া আমাদের একটা নিয়ম হ'য়ে উঠেছিল। আমরা দেখতে যেতুম খেত খামার, কোপাই-এর ধারে নানা চিত্তাকর্ষক জায়গা, বোলপুরের কতকগুলি চালকল এবং এইভাবে ছেলেদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রতুম চারপাশের গাছপালা পশুপক্ষী ও জমি-জায়গা সম্বন্ধে।"

শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়ে ও শিক্ষকদের সঙ্গে একত্রে এই সত্রের ছেলেদের গড়-জঙ্গলে এক্স্‌কারশানের যে বর্ণনা মজুমদার দিয়েছেন তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি তার বিবরণে দেখিয়েছেন কেমন ক'রে এই বহির্ভ্রমণের সময়কার অনেক ঘটনা ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং তার ফলে তাদের এমন অনেক চারিত্রিক পরিবর্তন সম্ভব হয় যা প্রশংসার যোগ্য। আর তাছাড়া এই সূত্রে এমন অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা মালমশলা শিক্ষক পান যা তিনি শিক্ষার কাজে খুব ভালভাবে ব্যবহার ক'রতে পেরেছিলেন।

প্রথম থেকেই এই ছেলেদের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া হ'য়েছিল, কারণ তাদের অনেকেই ছিল খুব দুর্বল এবং প্রায়ই অসুখে ভুগত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ায়। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুন সবই তাদের শেখানো হ'ত। কিন্তু তবু দেখা গেল যে তাদের পুরানো অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলি তারা কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। শিক্ষক তখন বুঝলেন যে "এ বিষয়ে শুধু তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার ফল তেমন কিছু হ'তে পারে না এবং কাজেই তাদের স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ট্রেনিং দিতে আরম্ভ ক'রলেন।" তিনি স্বাস্থ্যের কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দিলেন যা পালন করা ছেলেদের দৈনিক কর্মসূচীর অন্তর্গত ক'রে দেওয়া হ'ল। এর পরে অনতিকালের মধ্যে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া গেল। ছেলেদের উন্নতি হ'ল শুধু শারীরিক নয় সঙ্গে-সঙ্গে মানসিক। মজুমদারের ভাষায় "অনেকদিনের চেষ্টার ফলে তবে সম্ভব হ'য়েছিল তাদের মধ্যে এই অভ্যাসগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত করা :— আস্তে-আস্তে খাওয়া এবং ভাল করে চিবোনো, নিয়মমত দিনের মধ্যে কয়েকবার জলপান, রাত্রে জানলা খুলে রেখে ঘুমোনো, দাঁত পরিষ্কার, নিয়মিত পেট পরিষ্কার, গভীর নিঃশ্বাসগ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এই সবের সঙ্গে প্রয়োজন মত উপযুক্ত আহার, যথেষ্ট ঘুম, মুক্ত হাওয়ায় ব্যায়াম এই সবকিছু মিলে একটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনল এই ছেলেদের মধ্যে যাদের এই কয়েকমাস

আগেও মনে হ'ত একেবারে অকর্মণ্য, কৃমিতে ভুগে যাদের কোনো কিছু করবার আগ্রহ ছিল না— কাজই হোক্ আর খেলাই হোক্। এখন এই শারীরিক উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে এল নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা, স্বাধীন মনোভাব আর ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা, স্বাস্থ্য ও উদ্যম এমনকি তাদের মধ্যে জাগলো সৌন্দর্যের প্রতি একটা আকর্ষণ।"

শিক্ষক এই ছেলেদের শরীর মত মনের উন্নতির সমান চেষ্টা করতেন। তাদের একত্র জীবনে কাজকর্মে ও এক্স্‌কারশানের সময়ে তাদের কথাবার্তা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের মনোভঙ্গী ও মনের অপর গুণাগুণ লক্ষ্য করবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পেতেন। যখনই তিনি তাদের মধ্যে কোনো মানসিক বিকৃতি বা কুসংস্কার লক্ষ্য ক'রতেন তখন তিনি প্রথম চেষ্টা ক'রতেন আলোচনার সাহায্যে যথাসম্ভব তাদের বুঝিয়ে দিতে যে তাদের গলদ কোথায়; এমনকি এর জন্যে তিনি তাদের প্রাসঙ্গিক গল্পটল্প শোনাতেন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এতেই কাজ দিত। কিন্তু আবার অনেকসময় এতে কোনো সুফল দেখা যেত না। শিক্ষক দেখলেন যে সবচেয়ে ভাল কাজ যা তিনি করতে পারেন তা হ'চ্ছে সহযোগিতামূলক কাজকর্মের ব্যবস্থা করা যাতে ছেলেরা সানন্দে অংশগ্রহণ ক'রতে পারে এবং নিজেদের শারীরিক মানসিক সমস্ত শক্তির আনন্দময় ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। দেখা গেল যে একত্র সকলের ভালর জন্যে কাজ করার আনন্দে আর গঠনকর্মের মধ্যে নিজেদের শক্তিসামর্থ্য আবিষ্কারের আনন্দে এই ছেলেরা এমন অনেক কিছু শিখল যা শুধু আলোচনা বা ব্যাখ্যানে কখনই সম্ভব হ'ত না। এই আনন্দই তাদের টেনে বার ক'রল তাদের ক্ষুদ্র সত্তা থেকে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট ক'রে দিল নীতি ও নিয়মতন্ত্রের সত্যকার ব্যাবহারিক মূল্য। গুরুদেবের ভাষায় "সত্য ঘটনার ন্যায়শাস্ত্রই তাদের কাছে প্রমাণ ক'রল জীবনের নৈতিক নিয়মগুলির সত্যতা।"

এই ধরনের উন্নতির যে উদাহরণ শিক্ষক দিয়েছেন তার কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল। একটি রুগ্ণ ব্রাহ্মণ ছেলে ইস্কুলে ছিল যার পরিশ্রমসাপেক্ষ সমস্ত কাজের প্রতি একটি বিতৃষ্ণা ছিল। তার ইচ্ছা তার বাগানের পরিশ্রমের কাজটুকু সে নিজে না ক'রে বরং কোনো মালী করে দিক্। তাঁতের দড়ি, সতরঞ্চি তৈরি করার কি সার্থকতা তা সে বুঝতেই পারত না।

জাতের অভিমান ছিল তার প্রবল এবং নীচ জাতের ছেলেদের সঙ্গে, কিংবা তার খাবারে কোনো নীচ জাতের লোকের ছোঁয়া লেগেছে সন্দেহ ক'রলেও, সে আর কিছুতেই খেতে চাইত না। সে এত স্বার্থপর ছিল আর তার মন ছিল এত অনুদার, যে শিক্ষকের তৈরি একটা টানা গাড়ি ক'রে বাগানের সার বয়ে নিয়ে আসায়, ঝুড়িতে ক'রে বওয়ার চেয়ে তা সহজ হ'লেও, সে রাজী হ'ত না; কারণ তার মনে হত যে এতে তার পরিশ্রমের ফল শুধু সে নয় অপর ছেলেরাও পেয়ে যাবে। কিন্তু এই ছেলেটির যখন স্বাস্থ্যের বেশ কিছুটা উন্নতি হ'ল এবং সে তার ছোট বাগানটিতে কাজ করার আনন্দটুকু বুঝতে পারল, তখন তার মনোভাবের বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন হ'ল। তখন শিক্ষক ভাবলেন ব্যক্তিগত ছোট-ছোট প্লট ছাড়াও একত্র সকলে মিলে কাজ করবার জন্যে একটি বড় প্লট তাদের দেওয়া যাক্। অবিলম্বেই ছেলেরা সহযোগিতার সুবিধা বুঝতে পারল, এবং এই ব্রাহ্মণ ছেলেটিও আর কখনও গাড়িতে ক'রে সার টেনে আনায় আপত্তি করে নি, তা সে ওই বড় প্লটটির জন্যই হোক্ কিম্বা যে কোনো একজন ছেলের নিজস্ব প্লটের জন্যই হোক্।

এইভাবে একত্র থাকা ও কাজ করার ফলে তারা পরের ভাল করার আনন্দটুকু শিখে নিয়েছিল। এর একটি উদাহরণ হ'চ্ছে এই যে আগে উল্লিখিত এক্স্‌কারশানের সময় তারা কোনো একটি গ্রাম্য পথের এক গর্তে একটি গোরুর গাড়ির চাকা আট্‌কে গিয়েছে দেখে স্ব-ইচ্ছায় এবং আনন্দে ওই গর্ত বুজিয়ে পথ সারিয়ে দিয়েছিল। এক ৭ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে এই ছেলেরাই স্বেচ্ছায় সমস্ত আশ্রম পরিষ্কারের দায়িত্ব নিয়েছিল। ওই ব্রাহ্মণ ছেলেটি অগ্রণী হ'য়েছিল ছাতিমতলার কাছে সাধারণ Latrineটির পরিষ্কারের কাজে। ওই একই উপলক্ষ্যে

মহিলা অতিথিদের জন্যে কতকগুলি সাময়িক বাথরুম তৈরি করা অত্যন্ত আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছিল কিন্তু তৈরি করবার জন্য কোনো লোক সেদিন পাওয়া যায় নি। এই ছেলেরাই সেই কাজ নিজে থেকে ক'রে দিয়েছিল।

এই ছেলেদের একজন নাকি ব'লেছিল "আমরা যা ইচ্ছে সবই ক'রতে পারি— এই শিশু বিভাগের ছেলেরা শুধু জানে পড়তে আর খেলতে। আমরা পড়ি আর খেলি আবার বাড়িও তৈরি করি।" গুরুদেব স্বয়ং এই ছেলেদের সাধুবাদ দিয়েছিলেন এই ভাষায় "এই ছেলেগুলির মধ্যে যে আত্ম-উৎসর্গ ও সাহচর্যের ভাব, অপরকে সাহায্য করবার যে নিঃস্বার্থ আগ্রহ তৈরি হ'য়ে উঠেছে, তা জীবনপরিবেশ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি সুযোগ লাভ ক'রেছে যে সব ছেলেমেয়ে তাদের মধ্যেও দুর্লভ।"

পাঠসূচী

এদের কোনো নির্দিষ্ট পাঠসূচী ছিল না এবং একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো একটা নিম্নতম কৃতিত্ব-মান এদের উত্তীর্ণ ক'রে দেওয়ারও কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। কিন্তু শিক্ষকের বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে ওদের কাজ ছিল প্রধানত পড়া, লেখা আর সরল গণিত শিক্ষা। এই পড়তে ও লিখতে শেখায় কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে শিক্ষক তাদের কিছু ভূগোলের পাঠ দিয়েছেন এমন উল্লেখ আছে। এছাড়া ইংরেজী আরম্ভ ক'রতে হয় ছেলেদেরই দাবীর ফলে।

এই বিষয়নির্বাচনে শিক্ষকের কোনো হাত ছিল না, তা হ'য়েছিল সম্পূর্ণ ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী— এই হ'ল শিক্ষকের দাবী। তিনি বলেছেন "তাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে তারা যেরকম আগ্রহে পড়া লেখা ও অঙ্ককষার কাজ নিল তা আমাকে খুবই আশ্চর্য ক'রে দিয়েছে। আমি এইগুলি একটু আড়ালে রেখেছিলুম ব'লেই যেন তারা সেগুলিকে টেনে সামনে আনল; এবং এতে তাদের উন্নতি হ'ল সময়-অনুপাতে বেশ উল্লেখযোগ্য।" পোস্টমাস্টারমশায় কতকগুলি চিঠিতে বাংলায় লেখা ঠিকানা আবার ইংরেজীতে লিখে দিচ্ছেন এই ব্যাপার একদিন দেখে এই ছেলেরা ঠিক ক'রেছিল যে তারা ইংরেজী প'ড়বে। গুরুদেব তাঁর লেখায় এই ঘটনাটির উল্লেখ ক'রেছেন।

শিক্ষামূলক কাজকর্ম

প্রধান কাজ ছিল বাগানের কাজ আর তাঁতের কাজ। বাগানের মধ্যে এদের ব্যক্তিগত প্লট আর বড় সাধারণ প্লটের উল্লেখ আগেই করা হ'য়েছে। এছাড়া এদের একটি ফুলের বাগানও ছিল।

তাঁতের কাজের মধ্যে তারা ক'রত দড়ি ও ফিতা তৈরি। রং করা আরম্ভ করা হ'য়েছিল এই আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে।

আর-একটি কাজ অবশ্য ছিল বাড়ি তৈরি। কিন্তু স্বভাবতই তার সুযোগ পাওয়া যেত কালেভদ্রে। যে সাময়িক বাথরুমগুলির কথা আগে বলা হ'য়েছে তা ছাড়া আর-কিছু তারা ক'রেছিল কি না তা জানা নেই।

এছাড়া তারা কিছুটা ছবি আঁকা ও মাটি দিয়ে জিনিস তৈরির কাজও ক'রেছিল কলাভবনের শিক্ষকদের পরিচালনায়।

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে ওইসব তাঁত, রং করা, বাড়ি তৈরি প্রভৃতি কাজ দেওয়া হ'য়েছিল বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য নয়, সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে। মজুমদার তাঁর ১৯২৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে এ কথা স্পষ্ট ক'রেই জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সত্র সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব বিবৃতিতে এমন কিছু মন্তব্য আছে যা থেকে বোঝা যায় যে এই

সকল শিল্পের উৎপাদন থেকে পাওয়া আর্থিক লাভকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর সেই মন্তব্যটি হ'চ্ছে এই "তাদের নিজেদের ব্যয়নির্বাহ সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে এখুনি তারা কিছুটা তাদের উপার্জনের দ্বারা দিতে পারছে, আর সেই দিন হয়ত বেশি দূরে নয় যখন তাদের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ আত্মনির্ভরশীল হওয়া অসম্ভব হবে না।" খুব সম্ভব এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রবন্ধে সৃষ্টিমূলক কাজের সঙ্গে উপার্জন আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য সাধনের যে চেষ্টা আছে এ তারই একটা ফল। কিন্তু গুরুদেব এই ছেলেগুলির উপর শিল্পকলার যে ফলাফল দেখেছেন ও বর্ণনা ক'রেছেন তা থেকেই বোঝা যায় এ বিষয়ে তাঁর নিজের প্রত্যাশা কি ছিল। এ কথা নিশ্চয় যে প্রধানত উপার্জনক্ষমতা ও কারিগরী নৈপুণ্য তাঁর লক্ষ্য ছিল না; বরং তিনি চেয়েছিলেন সংবেদনশীলতা আর সজাগ সক্রিয়তা, যা লাভ করা সম্ভব শুধু "জীবনের সমস্ত প্রয়োজন ও দাবীর সঙ্গে মন ও শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলিকে মিলিয়ে নেওয়া" নিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে। ছেলেদের কাজকর্মের এদিকটার মূল্য সম্বন্ধে এই হ'ল তাঁর মন্তব্য :— "অল্পদিনের মধ্যে আমরা আবিষ্কার ক'রলুম যে একটা গঠন ও উৎপাদনমূলক কাজের বাঁধা নিয়মের মধ্যে ওদের মনগুলিকে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত ক'রে দেওয়ার ফলে ওদের মধ্যে এমন স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ এল যা আগ্রহে পথ খুঁজে এগিয়ে যেতে চাইল জ্ঞানের রাজ্যে।"

ভিতরকার সংগঠন ও শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রেণীবিভাগ, মাননির্ণয়, ক্লাসের সংখ্যানির্ণয়, সময়সূচী প্রণয়ন এবং আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতির আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাপনার অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে সন্তোষবাবুর বিবরণী থেকে এই উদ্ধৃতিটুকু যথেষ্ট আলোকপাত ক'রবে :

"আমাদের ক্লাশগুলি সচল ও পরিবর্তনশীল, সময়তালিকাও অলঙ্ঘ্য নয়, 'শিক্ষণ' ও ব্যাপকতর শিক্ষা দুইই আমরা ছাত্রের স্বাভাবিক আত্মপরিণতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চাই। এ বিষয়ে গুরুদেব বারবার অবহিত ক'রেছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে শিক্ষাসত্রের ছেলেদের মনের মধ্যে কতকগুলি পাঠ বা উপদেশ ঢুকিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ নয় বরং তারা যেন যখনই সম্ভব নিজেদের সন্ধান ও চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানকে আবিষ্কার ক'রতে পারে; কারণ তাঁর উদ্দেশ্য শুধু শিশুমনকে ভরিয়ে তোলা নয়, তাকে গ'ড়ে তোলা।"

এই ব্যবস্থা, কিংবা বলা যাক্ কোনো 'কড়াকড়ি ব্যবস্থার' অভাব, সম্ভব হ'য়েছিল অবশ্য এই কারণেই যে তখন ছাত্রসংখ্যা ছিল মোটে ছয়, কাজেই শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত মনোযোগ ও সাহায্য দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। তাছাড়া এ ছেলেগুলি প্রায় একই সময়ে ভর্তি হওয়ায় তাদের কৃতিত্বমানও ছিল প্রায় কাছাকাছি। সত্যি কথা ব'লতে কি এই অবস্থায় শ্রেণীভাগ শিক্ষামান সময়সূচী প্রণয়ন ইত্যাদির সমস্যা তেমন কিছুই ছিল না, বা যা ছিল তাকে সামান্যই ব'লতে হবে।

এদের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে বাঁধাবাঁধি কোনো সময়সূচী না থাকা সত্ত্বেও তাদের দিনের কাজের মোটামুটি একটা পরিকল্পনা ছিল, যথা সকালে তাঁতের কাজ দুপুরে পড়াশুনা ইত্যাদি। যদি কোনো ছাত্র শিল্পকাজ বা পড়াশুনোয় আপত্তি ক'রত শিক্ষক চেষ্টা ক'রতেন তাকে সুপরামর্শ দ্বারা বশ ক'রতে কিংবা ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা ঠিক পথে চালিত ক'রতে। সৌভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে এমন দুষ্ট কেউ ছিল না যে শিক্ষককে সম্পূর্ণ অমান্য বা উপেক্ষা ক'রত। তেমন কোনো বিদ্রোহের ব্যাপার ঘটলে শিক্ষক যে কি ক'রতেন তার কোনো আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ছটি ছেলেদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং তাদের দিয়ে অভিপ্রেত সব কাজই

তিনি করিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু তিনি কখনও চাননি জোরের দ্বারা অনিচ্ছুক মতকে বশ ক'রতে। যে ক'টি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন তার থেকে দেখা যায় যে অবাধ্যতা অনুৎসাহ অনিচ্ছা ইত্যাদি নিরস্ত হ'য়েছে হয় তাঁর বুঝিয়ে বলার কিংবা অন্যান্য ছেলেদের উদাহরণের দ্বারা; আর সবশেষে শুধু শিক্ষকের অপ্রীতিভাজন হওয়ার ভয়ে বা কোনো নির্ধারিত কাজের সময় কাজ না ক'রলে সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ার ভয়ে; কিম্বা কোনো অনিচ্ছুক ছাত্র যে কাজ এতদিন ক'রে আসছিল তারই মধ্যে হঠাৎ কোনো সাফল্য বা আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভের ফলে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মজুমদার অতিশয়পন্থী ছিলেন না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে বা প্রশমিত ক'রতে কোনদিনই চেষ্টা করেন নি। ওই যে দুটি নীতির উল্লেখ তিনি ক'রেছিলেন, যথা : "ছাত্রের স্বাভাবিক পরিণতির সঙ্গে শিক্ষণ ও ব্যাপকতর শিক্ষাকে খাপ খাইয়ে দেওয়া", আর "যখনই সম্ভব ছাত্রকেই নিজের সন্ধান-চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানের বস্তুকে আবিষ্কার করবার সুযোগ দেওয়া"— এর মানে খুব একটা কড়াকড়ি আক্ষরিকভাবে তিনি করেন নি। একজন আধুনিক আমেরিকান পরীক্ষণ-প্রিয় শিক্ষাবিদ্ এই কথাগুলির একেবারে অন্য রকমের মানে ক'রতেন; এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্র টেনে তিনি দাবী ক'রতেন যে শিশুর প্রয়োজন ও ঔৎসুক্যগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ না করা পর্যন্ত শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া শিক্ষকের আর কিছুই করণীয় নেই; এবং পরিবেশটিকে আকর্ষণীয় ও উদ্দীপনাময় করে তোলা ছাড়া শিশুকে চালনা বা তার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রভাবিত করবার কোনো চেষ্টা করাই তাঁর পক্ষে উচিত নয়।

এছাড়া ছাত্রদের নিজের-নিজের বিষয়নির্বাচনও দেখা যায় বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে তাদের স্বাভাবিক আগ্রহ বা কোনো সত্য প্রয়োজন বা আত্মপরিণতির দাবী ইত্যাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই কারণ হ'য়ে উঠেছিল ওই বিষয়গুলির বাজারদর। সেই কারণেই পাঠ লিখন ও গণিত শেখার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছিল যদিও শিক্ষক এইগুলির উপর কোনো জোর দিতে পারেন নি। কোনো সত্য কর্মের সঙ্গে এই বিষয়গুলির যোগাযোগ সাধনের কোনো চেষ্টা করা হয় নি। অবশ্য একজায়গায় শিক্ষক দাবী ক'রেছেন যে গৃহনির্মাণ প্রোজেক্ট কিছুটা গণিতচর্চার সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁত, বাগান ও রান্নার কাজের আনুষঙ্গিক অভিজ্ঞতা এইরকম কোনো পাঠ্য বিষয়ের প্রসঙ্গসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল কিনা সে খবর কোথাও পাওয়া যায় নি। এক্‌স্‌কারশান সম্বন্ধে অবশ্য বলা হ'য়েছে যে তার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ভূগোল পাঠের আয়োজন করা সম্ভব হ'য়েছিল।

মূল্যায়ন

এই সময়সীমার মধ্যে এক্‌স্‌পেরিমেন্টের ফলাফল বিচারের জন্য আমাদের নির্ভর ক'রতে হবে শিক্ষকেরই নিজস্ব মূল্যায়ন যা তাঁর বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে তার উপর এবং সেই সঙ্গে গুরুদেব এই বিবরণীর সম্বন্ধে যেসব মন্তব্য করেছিলেন সেইগুলির উপর। শিক্ষকের নিজস্ব বিচারে যথেষ্ট বস্তুতান্ত্রিক সত্যতাবোধ, নিরপেক্ষতা ও অকপটতা দেখতে পাওয়া যায়; তাই থেকে ছাত্রদের উন্নতি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলিকে সহজ বিশ্বাসে প্রামাণিক ব'লে গ্রহণ ক'রতে কোনো বাধা হয় না, যদিও অবশ্য তার কিছু-কিছু পদ্ধতি ও মূল আদর্শটির সঙ্গে সেগুলির সঙ্গতির প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তাছাড়া সত্র-বালকের চারিত্রিক গুণাগুণ বর্ণনা ক'রতে গিয়ে তিনি এমন ঘটনার অবতারণা ক'রেছেন যার সঙ্গে সত্রের বাইরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি জড়িত। এঁদের যে সাক্ষ্য শিক্ষক লিপিবদ্ধ ক'রেছেন তার সত্যতা ওইসব মানুষের কাছ থেকে সহজে যাচাই ক'রে নেওয়া যায়। এবং সত্যসত্যই তাঁরা ওই সব দাবী সমর্থন ক'রেছেন।

সবশেষে গুরুদেবের নিজের মন্তব্যগুলি থেকেই একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট খুব সুন্দরভাবেই এগিয়ে চ'লেছিল এবং যদিও কবি ভাবীকালে "কোনো অভাবনীয় জীবনসমস্যার" উদ্ভবের জন্য মন প্রস্তুত রেখেছিলেন, তবু এই অল্প পরীক্ষণকালের মধ্যে যে সুফল পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে এই এক্‌স্‌পেরিমেন্টটির মূলগত আদর্শ ও নীতিগুলির যাথার্থ্য সম্বন্ধে যে একটি আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল একথা নিশ্চিত।

শিক্ষক বর্ণনা ক'রেছেন কেমনভাবে তিনি এক ছুটির সময়ে কোনো-এক আশ্রমবাসীর ছেলেকে আংশিক ছাত্র হিসাবে ভর্তি করার সঙ্গে-সঙ্গেই সত্রের ছেলে এবং অন্য জায়গায় শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যকার তফাতটা খুবই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। তিনি দেখলেন ওই নবাগত ছেলেটি "কতকগুলি অনিষ্টজনক চারিত্রিক বিশেষত্ব গ'ড়ে তুলেছে; যথা বিক্ষিপ্ত মনোযোগ, মিথ্যাকথা বলা, বাড়িয়ে বলা, কাজ ক'রার মধ্যেই আনন্দ না খুঁজে শিক্ষকের দাবীপূরণ ও তাঁর অসন্তোষ এড়ানোকে সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় মনে করা। ভুল রকমের আত্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাস্থ্যজনক প্রতিযোগিতা।" সত্য-সত্যই কিরীটী অতুলের প্লটে কতকগুলি গাছ নির্মূল ক'রে দিয়েছিল যাতে সে তাকে হারিয়ে দিয়ে যেতে না পারে। তিনি আরও বলছেন "আমি লক্ষ্য ক'রলুম আমি চ'লে গেলে সে কাজ বন্ধ ক'রে দিত, আবার আমাকে ফিরে আসতে দেখলেই তাড়াতাড়ি কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়বার ভান ক'রত, অপর ছেলেরা বুঝতেই পারত না ও এরকম ক'রছে কেন?"

কলাভবনের মাটির কাজের ক্লাসে এই ছেলেদের কাজ দেখে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু যা ব'লেছেন বলে শোনা গিয়েছিল তা এই, "কি করে এই ছেলেগুলি এত সভ্য আর বিবেচক আর তাদের কাজে এত আগ্রহশীল ও নিপুণ হ'য়ে উঠল? এখান থেকে বহুদূরে বাস করে এরা; কি ক'রে এমন হ'ল যে একেবারে কাছাকাছি যারা থাকে তাদের উপর কলাভবনের প্রভাব এত কম, কিন্তু এদের উপর প্রভাব এত বেশি?"

এই ছেলেগুলির নানাদিকের যে বিকাশ লাভ ঘটল সন্তোষবাবুর বিবরণের একটি অনুচ্ছেদ থেকে তার কিছুটার আভাস পাওয়া যাবে :

"সত্র খোলা হ'য়েছে প্রায় এক বছর দশ মাস হ'ল। আমাদের প্রথম মনোযোগের বিষয় ছিল দৈহিক স্বাস্থ্য ও উদ্যম। আমাদের ছেলেদের উচ্চতা, ওজন ও দৈহিক শক্তির দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি হ'য়েছে; এখন তারা তাদের বয়সের অধিকাংশ ছেলেদের চেয়ে এমন কি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের চেয়ে এসব বিষয়ে ভাল। একটি সাঁতারের প্রতিযোগিতায় চিত্র দ্বিতীয়, বেণুকর তৃতীয় হ'য়েছে। বাগানের কাজ, তাঁত আর নির্মাণ কাজেও তারা বেশ এগিয়ে গিয়েছে; তারা তাদের নিজেদের জামা নিজেরাই সেলাই করে, নিজেদের বাক্স, ডেস্ক ইত্যাদি নিজেরাই তৈরি ক'রে নেয়। চমৎকার রাঁধতে পারে আর তাছাড়া ছবি আঁকতে পারে, সুন্দর বাংলা হাতের লেখা লিখতে পারে, কবিতা আবৃত্তি ক'রতে পারে; তারা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ কষতে পারে শুধু অঙ্ক হিসাবেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের নানা হিসাবের প্রয়োজন মিটাতে। তারা তাদের নিজেদের মত ক'রে এ কথাটা বুঝতে শিখেছে যে কোনো লোকের কাজ বা চেষ্টা শুধু একান্তভাবে তার নিজের জন্যেই হ'তে পারে না। যাদের সঙ্গে সে থাকে সেই দলের সঙ্গেও তার কোন-না-কোন সম্বন্ধ থাকতে বাধ্য। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সাহায্যের দাম তারা ক্রমেই বুঝতে শিখছে এবং সদয়তা সৌভ্রাত্র ইত্যাদি সামাজিক গুণ তারা অনেকটা আয়ত্ত ক'রেছে।"

এক্‌স্‌পেরিমেন্টের এই সময়টার সম্বন্ধে গুরুদেবের মতামত এর আগেই নানা প্রসঙ্গে আলোচিত হ'য়েছে। ওই এক্‌স্‌পেরিমেন্ট যেটুকু অগ্রসর হ'য়েছে এবং তার মধ্যে থেকে যে ফল পাওয়া গিয়েছে তাতে যে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এ কথা তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন। তিনি নিজেই এর কারণ দেখিয়েছেন এই ভাবে : "তাদের সেই স্বাস্থ্যপূর্ণ সক্রিয় জীবনই হ'চ্ছে আসল কারণ যার ফলে তাদের মধ্যে যা কিছু ভাল তা এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ লাভ ক'রেছে,

এবং তাদের মধ্যে এতদিনকার সঞ্চিত যা কিছু অক্ষমতা অযোগ্যতার আবর্জনা দূর হ'য়ে গিয়েছে। তাদের সামান্য যা জীবনের দাবী তা মেটাবার জন্য তাদের নির্ভর ক'রতে দেওয়া হ'য়েছে তাদের নিজেদের বুদ্ধি, এবং শিক্ষার পক্ষে একান্ত কতকগুলি প্রয়োজনের উপর। তাদের চেষ্টার ফল এখনও কিছুটা স্থূল হতে বাধ্য। কিন্তু এর নিজস্ব এমন একটি মূল্য আছে যা বাজারদরের হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি।"

মজুমদারের পরে

যে বিবরণী থেকে উদ্ধৃতি এতক্ষণ দেওয়া হ'চ্ছিল তাতে এরপর মজুমদারের পরবর্তী পরিচালকদের বার্ষিক বিবরণী থেকে তাঁদের কাজের ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও তাঁরা সকলেই যথাসম্ভব এই এক্‌স্‌পেরিমেন্টের মূল আদর্শ রক্ষা করবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, তবুও একথা ঠিক যে চারটি প্রধান ব্যাপারে তাঁদের প্রত্যেকের অনুসৃত কর্মনীতির মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রভেদ ছিল। সেই চারটি জিনিস হল পাঠক্রমরচনা, পদ্ধতিনির্ণয়, শিল্পকাজ পরিচালনা আর স্বনির্ভরতার ব্যবস্থা। পাঠক্রম একদিকে কর্মসূচী ও পদ্ধতির সঙ্গে গৃহীত প্ল্যানগুলির খুব বাঁধাবাঁধি নিয়মতান্ত্রিকতা ও অপর দিকে সচ্ছল স্বাধীন পরিবর্তনীয় কর্মভঙ্গীর মধ্যে বারবার এদিক-ওদিক দোদুল্যমান হ'য়েছিল। শিল্পকাজ থেকে-থেকে নেমে যেত একেবারে ব্যবসায়িক শিক্ষার নিষ্কৃতিহীন একঘেঁয়েমির স্তরে, আবার কেউ এসে এ কাজকে উদ্ধার ক'রে টেনে তুলতেন আকর্ষণীয় শিক্ষাকর্মের উন্নত স্তরে।

বরং স্বনির্ভরতার কর্মসূচীটি অনেকটা একইভাবে চ'লে এসেছিল, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় ক্রমে-ক্রমে রান্নার কাজ মাইনে করা লোকদের উপরে একটু-একটু ক'রে দিয়ে দিতে হ'য়েছিল। এবং ক্রমে এমন একদিন এসেছিল যখন "ছেলেদের রান্নার কাজ প্রতি বুধবারের দুপুরে খাবার রান্না এবং বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ্যে কিছু খাবার-দাবার তৈরি করাতে সীমাবদ্ধ হ'য়েছিল।"

ডাঃ ডি. এম. সেন কতকগুলি নতুন কর্মধারার প্রবর্তন ক'রেছিলেন, সেগুলি হ'চ্ছে এই : ছাত্রদের সমবায় ব্যাঙ্ক, স্বায়ত্তশাসন, ছাত্রদের নিজেদের দ্বারাই সংগৃহীত ও সম্পাদিত দৈনিক সংবাদলিপি আর আশপাশের গাঁয়ে সপ্তাহে একদিন ক'রে বেড়াতে যাওয়া। এই প্রোজেক্টগুলি, অন্তত এর শেষের তিনটি একটি সুযোগ্য শিক্ষকের পরিচালনায় যে খুবই সাফল্যলাভ ক'রেছিল বর্তমান লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে সাক্ষ্য দিতে পারেন।*

এ ছাড়া আর-একটি ভাল জিনিস হ'য়েছিল গান ও অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা। আর একজন সুযোগ্য শিক্ষকের নেতৃত্বে এ দু বিষয়ে ছেলেরা খুবই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। †

শিক্ষা-পরীক্ষণে আগ্রহশীল সকল লোকের কাছে বিশেষ সুখের হ'ত যদি আমরা উল্লিখিত সমস্যা ও কার্যধারাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ সিদ্ধান্ত তাঁরই নিজের ভাষায় এখানে উপস্থিত ক'রতে পারতুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তেমন কিছু তিনি লিখে যান নি। কিন্তু তা হ'লেও এইসব ব্যাপারে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী যেসব মন্তব্য ছড়িয়ে আছে, এবং শিক্ষা ও শিক্ষার নানা আনুষঙ্গিক ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী তাই মনে রেখে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উক্তি যে করা যায় না এমন নয়। নীচে সেই চেষ্টাই করা হ'ল।

পাঠক্রম : পড়বার বিষয় ও শিক্ষামূলক অন্যান্য কাজের নির্বাচন ব্যাপারে ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া উচিত ব'লেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ক'রতেন। ছাত্রই বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে আগ্রহশীল হয়ে উঠে সেগুলি পড়তে চাইবে

---

* শ্রীতারকচন্দ্র ধর।

† শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

এই হ'ল সূচনা। এর পরে শিক্ষকের দায়িত্ব হ'ল দেখা সে যাতে সুষ্ঠুভাবে আনন্দের সঙ্গে এই কাজ ক'রতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে একনিষ্ঠতা ও অধ্যবসায়ের অভাবকেও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। বরং কোনো বিষয়ে একবার বেছে নেওয়া হ'লে তাই নিয়ে নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল কাজ চ'লতে থাকে সেই ছিল তাঁর দাবী।

তা ছাড়া তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ভাল ফল পেতে হ'লে পাঠ্য বিষয়গুলির সংগঠন এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে সেগুলির সঙ্গে সত্যকার জীবন-অভিজ্ঞতার যোগাযোগ সাধনের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এর থেকে এমন মনে করা উচিত নয় যে তিনি চেয়েছিলেন যে ওই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অসীমিত ও অনির্দিষ্ট থাকুক এবং প্রতি নতুন ছাত্রদলের পক্ষে উপযোগী নানা অভিজ্ঞতামূলক কর্মসূচীর সঙ্গে এই পাঠসূচীও একটু-একটু রূপ গ্রহণ করুক। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য প্রগতিশীল শিক্ষার সমর্থকদের মত অতটা অতিশয়বাদী তিনি ছিলেন না। অভিজ্ঞতা ছাত্রকে সাহায্য ক'রবে কোনো-একটি বিষয়ে ঔৎসুক্যবান হ'তে, তার অন্তর্গত নানাব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি লাভ ক'রতে, তার বিভিন্ন অংশ ও দিকগুলিকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে উপলব্ধি ক'রতে, ও তাদের সত্যতা যাচাই ক'রে নিতে। কিন্তু কিছুকাল পরেই এমন সময় আসতে বাধ্য যখন বারবার এই অভিজ্ঞতাকে সালিশিমানার প্রয়োজন কমে আসবে এবং ধারাবাহিক জ্ঞানের অবাধ অনুসরণ সহজ হ'য়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান এবং নিয়মিত ধারাবাহিক অধ্যয়ন— এই দুটিকেই যথাযোগ্য মূল্য দিয়েছেন।

পদ্ধতি : পদ্ধতি ব্যাপারে কতকগুলি সাধারণ নীতির উপর রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। যথা : ছাত্রদের স্বাধীনতা, আনন্দময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা, সৃজনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা। শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে ছাত্রদের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে কাজে লাগানো ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষাদানের কোনো বিশেষ বাঁধাধরা পদ্ধতি, কোনো বিশেষ ধরনের পাঠ-টীকা রচনা বা ক্লাশে ব্যবহৃত ক্রিয়াকৌশল যে সকলকেই গ্রহণ ক'রতে বলা উচিত এমন তিনি কখনও মনে ক'রতেন না। শিক্ষক তার প্রতিটি পাঠদানের প্ল্যানই খুব ভালভাবে চিন্তা ক'রে তৈরি করবেন এ তিনি চাইতেন। এর জন্য ওই একই কাজ অন্যান্য শিক্ষকরা কেমন ভাবে ক'রে কি ফল পান তাও তাঁর দেখা ও জানা উচিত। কিন্তু তার মানে এ নয় যে অপর কারুর পদ্ধতি তাঁকে একান্ত বাধ্যভাবে অনুসরণ ক'রতেই হবে। তাঁর পদ্ধতি তাঁর নিজেরই হওয়া উচিত, প্রতিটি নতুন শিক্ষাপরিস্থিতি ও ছাত্রদলের প্রয়োজনে যখন যেমন দরকার এই পদ্ধতির পরিবর্তন হওয়া উচিত। অপরিবর্তনীয় বাঁধা-ধরা নিয়মপদ্ধতি ও ক্লাশঘরের কলা-কৌশল রবীন্দ্রনাথের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে হয়নি। তিনি তাই ব'লেছেন "নিজের কথা ব'লতে হ'লে আমি ব'লতে পারি যে ওই পদ্ধতির চেয়ে আমি ঢের বেশী বিশ্বাস করি জীবনধর্মকে, মানুষের আত্মাকে।"

শিল্পকাজ : রবীন্দ্রনাথ বরাবরই শিল্পকাজের সৃষ্টির দিকটাই জোর দিয়েছেন; উদ্ভাবনশীলতা, গঠনকর্ম। মনের ভাব ও রসবোধের ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশের যেসব সুযোগ এই শিল্পকাজের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় তার উপর। কাজেই ইস্কুল-জীবনের প্রথম দিকে যতগুলি সম্ভব শিল্পকর্মের সুযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ সে সময়ে যে-কোনো একটি শিল্পে বিশেষ জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভের চেয়ে অনেকরকম কাজের অভিজ্ঞতাই ছাত্রের আত্মপরিণতির পক্ষে বেশী দরকার। তিন চার বছরের কাজের পর কিছুটা বিশেষজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা মন্দ নয়। এই ধরনেরই একটি শিল্পকাজের কর্মসূচী সম্প্রতি শ্রীনিকেতন শিল্পসদনে সত্র ও শান্তিনিকেতন এই দুই জায়গায় ছাত্রদের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে।*

স্বনির্ভরতার প্রোজেক্ট : সত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি যে নানা ধরনের লোকের কাছেই খুবই ভাল মনে হ'য়েছে এর

* শ্রীসন্তোষকুমার ভঞ্জের ব্যবস্থাপনায়

যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এর ফলে সত্রের ছেলেরা এমন একটি আত্মবিশ্বাস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা লাভ ক'রেছিল যা শান্তিনিকেতনের ছেলেদের মধ্যে দেখা যেত না। এর ফলে তারা আশপাশের সমাজজীবনের অনেক সমস্যা আপনার থেকে বুঝতে পারত, এমনকি কতকগুলি সমাধানেও তারা সাহায্য ক'রতে পারত। ইস্কুলজীবনের সঙ্গে গৃহ ও সমাজজীবনের যে একটি বিচ্ছেদ আছে তারা তাদের এই অভিজ্ঞতার ফলে তার মধ্যে একটি যোগাযোগের সূত্র পেয়েছিল এবং তাই তারা অতি সহজেই দুরকমের পরিবেশের মধ্যে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারত।

ছাত্রদের সঙ্গে তাদের দায়িত্বভার সমান ভাগ ক'রে নিতে ইচ্ছুক কয়েকটি শিক্ষক না থাকলে অবশ্য এই পরিকল্পনাটির সাফল্য অর্ধেকের চেয়ে কম হয়ে যেত। প্রশ্ন হ'ল এই যে, কেমন ক'রে এই কাজের অনাবশ্যক একঘেয়েমি কিছুটা কম ক'রে দেওয়া যায় এবং কর্তব্য ও কাজের সময় এমন ক'রে ভাগ ক'রে বেঁধে দেওয়া যায় যাতে রান্নাঘরের কাজ কোনো ক্ষেত্রেই মূল শিক্ষামূলক কাজের ক্ষতি না ক'রতে পারে। এইরকম একটি প্রোগ্রামের শিক্ষাগত সার্থকতায় আস্থাবান্ শিক্ষকেরাই এই এক্স্পেরিমেন্ট চালিয়ে দেখিয়ে দিতে পারেন যে কি পরিমাণে স্বনির্ভরতার দায়িত্ব অভিপ্রেত পাঠক্রমের সঙ্গে খাপ খেয়ে যেতে পারে।

ভারত ও বিদেশ থেকে আসা অনেক নাম-করা শিক্ষবিদ্ শিক্ষাসত্রের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছেন এবং এর অনেক প্রশংসা ক'রে গেছেন। এমন অনেকে আছেন যাঁদের বেশ দৃঢ় ধারণা হ'ল এই যে সত্রের মত একটি অতি অর্থপূর্ণ এক্স্পেরিমেন্টকে ক্রমশ দুর্বল হ'য়ে অবশেষে লুপ্ত হ'য়ে যেতে দেওয়া উচিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-অভিযানের একটি ধারা রূপ পেয়েছিল এই সত্রের মধ্যে। কাজেই এই এক্স্পেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়া উচিত ও তার জন্য অর্থ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা কিছু দরকার তার সুব্যবস্থা করা উচিত।

সুনীলচন্দ্র সরকার

গ্রন্থ-সূত্র : রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সম্পাদক, প্রবোধচন্দ্র সেন।

SIKSHA-SATRA

In Siksha-Satra, which means a place from where free education is imparted, we come across an educational experiment of great significance. The genesis of the institution has to be traced far back into the early writings of Tagore. Tagore's conception of a complete education had included and emphasized practical education based on creative activity and direct experience of life since his very first educational writing, *Siksar Herpher* (1892). He tried to introduce this element into the life and education at Santiniketan from its very inception in as many ways as possible. He also repeated his thoughts in this direction from time to time, and stressed these ideas on the eve of the foundation of Visva-Bharati in such writings as *The Centre of Indian Culture* (1919) and *Udyog Siksa* (1919). But whatever success was attained in this respect through the programmes and activities of Santiniketan did not meet with his full satisfaction. He made this point quite clear, as we have already found in *A Poet's School* (1926), where referring to the nature of work at Santiniketan, he observed :

This was not sufficient, and I waited for men and the means to be able to introduce into our school an active vigour of work, the joyous exercise of our inventive and constructive energies that help to build up character and by their constant movements naturally sweep away all accumulations of dirt, decay, and death. In other words, I always felt the need of the western genius for imparting to my educational ideal that strength of reality which knows how to clear the path towards a definite end of practical good.[1]

But various obstacles checked his progress in this direction. As Tagore observed, "The tradition of the community which calls itself educated, the parents' expectations, the upbringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official university, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished."[2] Naturally, therefore, Tagore had to wait for the propitious combination of circumstances to enable him to undertake such a venture. And the proper opportunity appeared when Elmhirst joined his institution with his ideas, enthusiasm, experience, and resources. Six destitute village boys were collected from neighbouring villages, where the extension services of the Village Welfare Department of the Institute had already produced a helpful atmosphere of co-operation. The parents and guardians of those boys were only too glad to place them under the sheltering care of the Institute, and Siksha-Satra was thus started in July 1924 about two years and a half after the establishment of the Institute.

Besides being an experiment on an ideal system of education, Siksha-Satra had also in view another objective of a more practical nature to train up a band of village boys who might one day become enlightened leaders of the rural community. The educational activities for the rural population, undertaken by the Village Welfare Department through night schools, camps, adult-education projects, and the Brati-Balak organization, were not regarded as sufficient, for, "Rabindranath knew," as Miss Sykes observes, "that some of the most intelligent boys ought to have more education than they could obtain there, so as to be really useful leaders in their

1 *Visva-Bharati Bulletin*, No. 9, July 1946, p. 9.
2 *Ibid.*, p. 10.

villages." The curriculum and activities of Siksha-Satra were, therefore, so devised with a view to training some future leaders of the rural people.

Though started in July 1924, Siksha-Satra appears to have been an evolution from the "Home Projects" that Elmhirst had instituted at the beginning of Sriniketan scheme for imparting home education to the villagers probably in matters relating to house-crafts. In fact, in his well-known draft syllabus, Elmhirst referred to the institution as the "Home School." Two years' experience led to giving the project a more systematic and stable shape in the form of a central boarding School. Though Siksha-Satra was an integral part of Sriniketan, it was initially housed in the residence at Santiniketan of Santosh Chandra Majumdar, who was placed in charge of the experiment. After the death of Santosh Chandra in October 1926, it was shifted to Sriniketan, not only to free it from certain inherent disadvantages of the contrasted Santiniketan atmosphere but also to bring it amidst the rural surroundings to which it naturally belonged.

In the draft syllabus, Siksha-Satra[3] prepared by Elmhirst in consultation with Tagore, we find an illuminating exposition of the ideals and activities of the institution. He starts with the basic proposition that freedom of growth is the first principle in all species of life, vegetable, animal, or human. With this fundamental natural principle in view, he states the aim of the Siksha-Satra: "The aim, then, of the Siksha-Satra is, through experience in dealing with this overflowing abundance of child-life, its charm and its simplicity, to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunities for the joy of play that is work—the work of exploration; and of work that is play—the reaping of a succession of novel experiences; to give the child that freedom of growth which the young tree demands for its tender shoot, that field for self-expansion in which all young life finds both training and happiness."[4] Or, in other words the aim was to ensure freedom of growth through freedom of experience and freedom of expression. These, again, presupposed training in the art of self-preservation as well as of meeting the demands of the future, without which the above freedoms would not be possible. Self-preservation and readiness for the future, in their turn, implied the attainment of physical efficiency, or the ability to maintain health and hygiene in one's body and the surroundings, and to perform with skill various practical works connected with one's daily life; economic efficiency, or the ability to earn a decent livelihood through some vocational training; and social efficiency, or the ability to associate with and serve one's fellow-beings with understanding and goodwill and to execute works of common good in a co-operative spirit.

In order to achieve the above aims, an activity-centred education was devised in which learning was powerfully motivated by the actual needs of life of the pupils individually and of the community to which they belonged; it was acquired through direct experience of nature and social life; it was "learning by doing" in its true sense. From the very start, every pupil became an apprentice in housecraft and handicraft. Housecraft included activities like the construction of quarters and their proper maintenance, cooking, washing, repairing, sanitation, hospitality, policing, fire-drill, etc., which were necessary for individual self-preservation and at the same time were based on the recognition of duties towards the family and the community. Handicraft included a large number of special crafts, like tape-making, weaving, serving, dyeing,

3 *Visva-Bharati Quarterly, II, July 1924; reprinted Visva-Bharati Bulletin,* No. 9, along with Tagore's "A Poet's School," in December 1928.

4 *Visva-Bharati Bulletin,* No. 9, July 1946, p. 18.

wool-work, patterns, carpentry, watch-repairing, cycle-repair, etc., which were of definite economic value, of real use at home and ready sale outside, and intimately connected with the life in the villages. There were some other activities, which Elmhirst refers to as "out-door crafts" like poultry, gardening, drainage, irrigation, fuel and water-supply, wood-cutting, jungle-clearing, etc., pursued, as it were, in the very workshop of Nature, which were fit for small children and yet could be economically profitable and of utility to the family and the society at large. Nature study included vital problems of urgency like those presented by injurious worms, insects and bacteria, directly affecting plants, live-stock and human body. "Nature-study," says Elmhirst, "is thus transformed into the study of Nature in relation to life and the daily experiences of life"[5] Each student was given an individual plot of ground in the garden for growing flowers and fruits, which served as the basis of various direct experience of natural phenomena as also of some theoretical work through reading, writing, and arithmetic. Allied sciences were brought in, not as a matter of course, but as vital links in the chain of their practical experience. Thus, to quote Elmhirst again, "*Geology* becomes the study of the fertility of the plot; *Chemistry*, the use of lime and manures of all kinds, of sprays and dis-infectants; *Physics*, the use of tools, of pumps, the study of water-lifts and oil-engines; *Entomology*, the control of plant pests... and diseases...; *Ornithology*, the study of birds in their relation first to the garden plot and then to the world in general."[6] Ample scope was given for training in citizenship and social service through activities already enumerated in connection with the Brati-Balak organization, and these activities, directly related as they were to the problem of individual and social well-being, led up to a living study of those problems, in the relevant branches of knowledge.

An average day in the Siksha-Satra commenced with gardening, followed by an hour for the 3R's which had a direct bearing on the work that they were doing in their garden-plots. The subsequent hours during the day were spent in the pursuit of housecraft and handicraft according to necessity and choice. There was no time-table, no rules and regulations. The students did what each considered suitable. The evening hours were devoted to readings from the Indian epics by the teachers, when the boys were cooking their evening meals, often accompanied by lively discussions. Weekly excursions and picnics at various places of interests formed a very important part of the programme of activities of the institution, which provided occasions for exercise in housecraft as well as Nature study and the study of numerous objects of interest at first hand, like the Post office, the Police Station, the Railway Station, the Mills and factories, and the workshops of various craftsmen, which are intimately related to our daily existence. They would also notice the different kinds of soils and the source or want of irrigation, discuss about the causes of ruin and the methods of reconstruction. They collected stones and fossils as a part of their study of Geology in real life. They learnt about Botany through making a herbarium and writing down the description of the herbal specimens along with their medicinal and economic value. Excursions were also undertaken during longer holidays to distant places which were important from historical, religious, and economic points of view. Through all the above activities the children were introduced to the very centre of life's flowing current, and prepared in advance to face it when the proper time came.

---

5 *Ibid.*, p. 22.
6 *Ibid.*, p. 21.

Having thus provided for the preliminary objectives of self-preservation and preparation for the future, the way was paved for the acquirement of natural self-discipline and the free play of the imagination, upon which all progress depends. In Siksha-Satra, discipline was unobtrusively inculcated through activities in housecraft and handicraft, through the attainment of individual skills as also through the exercise of social faculties. Imagination was given free scope to function in "a world of abstraction and of emotion" through "adventure in the realm of song, of music, of poetry," "of drama and dance," of "colour, line, or from," "of thought and meditation, in touch with the still small voice within."[7]

In this way, an experiment was carried out in Siksha-Satra to impart an education that would lead to the fullest development of all the capacities of a child so that he might achieve his real "Freedom for Growth"—which was, as Elmhirst put it, the very motto of the institution—and might eventually develop into a healthy, independent and happy individual, and a useful member of his community, with the skill to construct and produce articles of necessity, and the ability to appreciate and create things of beauty, and with the desire and the equipment for taking initiative for the reconstruction of the society to which he belonged.

The success of the experiment in many respects was startling and almost beyond expectations. In *A Poet's School* Tagore himself has recorded how deeply impressed he was by the results achieved. He was struck by the rapidity with which the intellectual alertness of these children developed through active engagement in a round of constructive work, so that they undertook intellectual tasks of their own accord in a spirit of play. The physical and mental deficiencies and deformities, ill-health, malnutrition, meanness, non-co-operation, caste-prejudices, etc., that they had brought with them, were also quickly transformed into health and purity. He observed:

> It might have been thought that this meanness and selfish jealousy, this moral lethargy revealed in the utter want of beneficence in them, were inherent in their nature. But within a very short time all these have been changed. The spirit of sacrifice and comradeship, the disinterested desire to help others, which these boys have developed, are rare even in children who have had better opportunities. It was the active healthy life which brought out in a remarkably quick time all that was good in them and the accumulated rubbish of impurities was swept off.[8]

The report of Santosh Chandra Majumdar, who was mainly responsible for executing the experiment, on the results achieved after two years of work, though worded in somewhat matter-of-fact terms, is no less impressive. "Physical vitality," he writes, "was our first concern. The gain of the boys in height, weight, and strength has been very remarkable...The boys have made considerable progress in gardening, weaving, and construction; they cut and sew and make their own garments, their own tables and boxes, can cook well, as well as paint, write a neat hand in Bengali, recite poems, know addition, subtraction, multiplication and division, not mechanically but in relation to life situations. They have begun to feel in their own little way that the individual's effort is not purely individual but invariably has social reactions. They are

7 *Ibid.*, pp. 27-28.
8 *Ibid.*, p. II.

realizing the value of mental aid and have acquired the social habits of kindliness and brotherliness."[9] P. C. Lal, who had personal knowledge of the working of Siksha-Satra for a number of years, both as a member of the staff of Sriniketan and as the principal of the institution, has also recorded how these destitute village boys coming with miserable physical and mental equipment, were "completely changed" at the end of two years, how their initial unfortunate characteristics "were all removed and cleared away, and in their place there grew an active, healthy life, and a spirit of sacrifice, service and comradeship"[10] The record of the career of the products of Siksha-Satra subsequent to leaving the institution also shows that most of them successfully established themselves in some independent vocation and earned honourable positions as useful and respected members and leaders of communities, among whom they had settled down.[11]

It has been said that Siksha-Satra anticipated the Wardha Scheme of Basic Education, "Siksha-Satra," it is stated in a Visva-Bharati publication, "may well be described the precursor of what is today known as Basic Education."[12] Prabhat Kumar also makes the same point with some force and comments incidentally that when Mahatma Gandhi visited Santiniketan in May 1925, he must have been shown the Siksha-Satra school which was then situated in Santiniketan and had been conducting experiment in activity-centred education.[13] Without going into the details, it can be safely asserted on broad lines that the fundamental conception of a craft-centred education, related to the actual needs of life of the pupils and conducted in a social atmosphere and a co-operative spirit with a view to producing true citizens able to support themselves and serve the society, as put forth by the Wardha Scheme, was, as we have seen above, undoubtedly reflected in the Siksha-Satra scheme. How far Gandhiji was consciously influenced by the Siksha-Satra experiments, is however, another question and is difficult to judge; for there is little direct evidence on the subject. Suffice it to say that it is a tribute to the vision of Tagore as an educational thinker that the ideas that have subsequently inspired the Basic Education Scheme were already thought out and experimented upon years ago by him in some of their most fundamental aspects.

Finally, the proposition that Siksha-Satra was founded upon the failures of Santiniketan and achieved what the latter failed to do, needs some consideration. We have already found how Tagore went to the extent of declaring while in Moscow, that his "special school" for the villages (i.e. Siksha-Satra) embodied his educational ideals to the maximum extent , and "before long, this village school...will be real school, the ideal school, and the other one (i.e. the Santiniketan school) will be neglected."[14] Elmhirst also commenced his draft syllabus with the statement that the principles behind the Siksha-Satra scheme were "little more than common sense deductions from the failures and successes of the past."[15] P. C. Lal has been even more outspoken in this regard. "I would here venture to say," he writes, "that this educational experiment was undertaken to prove possible what Santiniketan during all its history of nearly

---

9 Types-script copy, quoted in Prabhat Kumar Mukhopadhyay,*op. cit.*, Vol. IV, p. 119.
10 *op. cit.*, pp. 108-109.
11 P.C. Lal, *op. cit.*, pp. 109-110; *Visva-Bharati Bulletin*, No. 21, January 1949, pp. 12-13.
12 *Visva-Bharati–A Brief Survey of its Activities*, January 1950, p. 14.
13 *op. cit.*, Vol. IV, p. 112.
14 "My School" (1930), *Modern Review*, January 1931.
15 *Visva-Bharati Bulletin*, No. 9, p. 17.

thirty years had failed to achieve."[16] Subsequently, in estimating the educational principles which Siksha-Satra, in his opinion, successfully demonstrated, he mentions the following: (1) Good home-like environment. (2) learning as a new way of behaviour. (3) Education related to life and society. (4) Flexibility of the curriculum and freedom to develop naturally. (5) Individual interest and aptitude, the motive of all work. (6) The teacher, a guide. (7) Learning by doing. (8) Education expressive of indigenous culture.[17]

One fundamental point of difference between the older and the younger school may at once be pointed out; namely, the curriculum. While the school at Santiniketan had from the very inception some prescribed course of studies, whether its own or that of Calcutta University, Siksha-Satra had no prescribed course of studies as such. Moreover, if in Santiniketan a greater stress came to be laid on the literary and aesthetic pursuits, at Siksha-Satra the stress was on activities of a more practical nature. It should, however, be stated in all fairness to the Santiniketan school that whatever account of themselves its students gave in the field of physical and practical activities, as we have recorded in an earlier chapter, was not altogether discreditable. As to the other points in Dr. Lal's list quoted above, it should suffice only to state here that if the Santiniketan school won world-wide fame, it was mainly because of those very principles. To assert, then, that they were the special achievements of Siksha-Satra only would be wrong. From this point of view, it may be contended, as we have already done earlier in the proper context, that in prophesying that while Siksha-Satra would flourish as an ideal school, and Santiniketan would come to be neglected, Tagore was neither fair to Santiniketan nor to himself. And, fortunately enough, the ominous prophecy of the poet has not been proved true in course of time.

Himangsubhusan Mukherjee

Reprinted from Education for Fulness (Asia Publishing House).

16 *op. cit.*, p. 95.
17 *op. cit.*, Ch. VI.

শিক্ষাসত্র

বুনিয়াদি শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠানের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। যেখান হইতে শিক্ষা বিনাব্যয়ে পাওয়া যায় তাহাকে 'শিক্ষাসত্র' বলা হইয়াছে, যেমন অন্নসত্র। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা পেশ (ডিসেম্বর ১৯৩৭) হইবার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় গ্রামের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনের একপ্রান্তে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপিত হয় (জুলাই ১৯২৪)। বলিতে গেলে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম হাতেনাতে পরীক্ষার সূত্রপাত এখানেই হয়। প্রসঙ্গত বলিতে পারি, যে ১৯২৫-এ যখন গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তিনি এই গ্রাম-বিদ্যালয় দেখিয়াছিলেন এবং তথাকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন।[১]

যাহাই হইক, শিক্ষাসত্র স্থাপনের বহুপূর্ব হইতেই শিক্ষাকে activity বা কর্মভিত্তিমূলক করিবার জন্য কবির ইচ্ছা ও প্রয়াস দেখা যায়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় হইতেই ছাত্ররা নিজ-নিজ কর্ম করিতে অভ্যস্ত হয়; কবি যে কর্মভিত্তিক শিক্ষাবিধির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন তাহার এক ধারা প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহবাসের আদর্শ হইতে গৃহীত— আশ্রম শব্দের মধ্যে 'শ্রম' নিহিত, উহা বিশ্রামের স্থান নহে; আর-এক ধারা পাশ্চাত্য নূতন শিক্ষাদান বা প্রয়োগমূলক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে গৃহীত। আধুনিক যুগে উইলিয়াম জেম্‌স্ শিক্ষাতত্ত্বে যে নূতন কথা বলেন তাহা তাঁহার *Talks to Teacher and Students* (1899) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি কবি জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতে পান; জগদীশচন্দ্রকে সিস্টার নিবেদিতা উহা উপহার দেন। কবি সেই কপি পাঠ করেন এবং আমাদের নিকট বহুবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন।[২]

শিক্ষাব্রতীরা জানেন কিভাবে জেম্‌স্ (১৮৪২-১৯১৪) ও চার্লস্ পিয়ার্স্ (১৮৩৯-১৯১০)-এর pragmatic মতবাদ জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) প্রমুখ আধুনিক দার্শনিক ও শিক্ষাশাস্ত্রীদের প্রভাবান্বিত করে। জন ডিউই বিংশ শতকের সর্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাশাস্ত্রী; Findlay (1860) বলেন, আর-একজন শিক্ষাশাস্ত্রী জগতে আছেন— তিনি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট জেম্‌স্ ফিন্‌ড্‌লের নাম অজ্ঞাত নহে; তিনি ইংরেজ, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্হ অধ্যাপক, বহুগ্রন্থের লেখক। তাঁহার *The Foundation of Education* (1930) গ্রন্থে বলিতেছেন, "There are two great men in our epoch, John Dewey in the West and Rabindranath Tagore in the East, whose wisdom not only illumines the general mind, but has stooped to the level of the children. Both men are now passing into old age, but it was in the prime of life, during the closing years of the last century, that both of them resolved to keep school.

"With Tagore, the environment, the *Ashram,* the star and the sky, friends and neighbours, are the means whereby an inner happiness is fostered. Dewey seems to leave such influences to the subconsci us; his 'means whereby' the American boy and girl are to solve the riddle of life spring from impulses of curiosity and intelligence: significance is found in relating the materials and tools of to-day with the unfurnished equipment of society in earlier epochs; pursuing the occupations presented in kitchen, garden and workshop, his children learned to enjoy the fellowship of their group, to be humane and considerate, without relating such sentiments either

---

১ "Some years after I had left, Gandhi paid a visit to this school and was so impressed that he urged Tagore to loan him the service of the headmaster of Siksha-Satra to help him plan an all-India revolution in primary education. Tagore laughingly volunteered on the spot to be Gandhi's first Minister of Education."–Rabindranath Tagore,Pioneer in Education: Essays and Exchanges between Rabindranath and L.K. Elmhirst–John Murray (1961), p. 13-14.

২ বইখানি রবীন্দ্রসদনে আছে।

নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের অভিভাবকগণই ছিলেন ইহার বাধা; কারণ বাঁধা রাস্তায় চলিতে ও চালনা করিতে পারিলে শিক্ষকরা খুশি, মামুলি ধারায় সন্তানদের শিক্ষিত করিতে পারিলে অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত। অভিভাবকগণের মধ্যে বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনে ছেলে পাঠান তথাকার কতকগুলি সুবিধা-সুযোগের জন্য। বাহিরের এই-সব বাধা ও বাধ্যবাধ্যকতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি তাঁহার পরিকল্পনামতে শিক্ষাদানের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষাসত্রের পত্তন করেন। এই শ্রেণীর special school কেন স্থাপন করেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় মোলাকাতে তৎসম্বন্ধে কবি বলেন যে, শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা অধিকাংশই আসে ধনীঘর হইতে, সকলেই পরীক্ষা পাস ও ডিগ্রি লাভ করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে এই মাত্র আকাঙক্ষা। সেই জন্য সেখানে সর্বাঙ্গীণ আদর্শ শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না। "Therefore it is not possible to give them the ideal kind of education.[১]" তিনি অন্যত্র বলিয়াছিলেন, "The tradition of the community which calls itself educated, the parent's expectations, the up-bringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished."[২]

কবি আদর্শবাদী হইলেও প্রত্যক্ষবাদী; বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনো অস্পষ্ট ধারণা ছিল না; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "I had to submit to this because otherwise there would be no chance of having a single student in my school,"[৩]-এ কথা অতি সত্য। গভর্নমেণ্ট প্রথমদিকে এ বিদ্যালয়ের প্রতি আদৌ সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন না। তৎকালীন গভর্নমেন্টের মন ও সমাজের মান রক্ষা করিয়া যতদূর চলা সম্ভব তাহাই কবি করিতেন। গভর্নমেন্টের সহায়তা ও সহানুভূতি-নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী শিক্ষাপরিকল্পনা কর্মে রূপায়িত করা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাহা সীমায়িত রাখেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে তিনি বিরত হন নাই— ১৯১৯ সালের উদ্ধৃতাংশ তাহার প্রমাণ। Special school অর্থাৎ গ্রামের বালকদের জন্য বিদ্যালয় বা সত্র স্থাপনের কথা কেন উঠিয়াছিল, কেন তিনি 'such a distinction' বা পার্থক্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর তো তিনি দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা যে, class বা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষভাবে ধনী ও মধ্যবিত্তর জন্য যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িবে, ও class-এর স্থলে mass-এর জন্য এই গ্রাম্য শিক্ষালয় দেশব্যাপী হইবে।

১৯২২ সালে এল্‌ম্‌হার্‌স্ট বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে কবির বহুকাল-ঈপ্সিত সাধারণের উপযোগী শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিল। এল্‌ম্‌হার্‌স্ট আদর্শবাদী হইলেও বাস্তববাদী; তিনি অর্থ আনিলেন বিদেশ হইতে বিশ্বভারতীর জন্য, নিজে কর্মে ব্রতী হইলেন কবির আদর্শকে রূপদান করিবার জন্য। কবি লিখিতেছেন যে, এল্‌ম্‌হার্‌স্ট "believes, as I do in an education which takes count of the organic wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all faculties, bodily and mentaly." পূর্বের আলোচনা ইহারই সমর্থক কথা।

বিশ বৎসর যাবৎ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লইয়া তিনি তাহার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ রূপ দান করিতে পারেন নাই; তাই লিখিতেছেন, "I had to start *a parallel school* where the villagers who do not have ambitions for finding Government employment in merchants' offices, come and join. There I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education.

---

১ Rabindranath Tagore in Russia, an account of the Poet's visit to Moscow, Ed. P. C. Mahalanobis, *Visva-Bharati Bulletin* No. 15, p 33.

২ A Poet's School, by Rabindranath Tagore, *Visva-Bharati Bulletin* No. 9, p 14 .

৩ *Visva-Bharati Bulletin* No. 10, p 54.

Before long, the village school will be the real school, and the other one will be negleted."[১] কবি ভাবিতেছেন, এই গ্রামবিদ্যালয়ই একদিন আদর্শ বিদ্যালয় হইবে এবং শান্তিনিকেতনের অভিজাতশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় পিছাইয়া পড়িবে।

বলা বাহুল্য, এ উক্তিকে আমরা শিক্ষা সম্বন্ধে কবির চরম মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি সত্যের দ্রষ্টা, কর্মের স্রষ্টা হইলেও মূলত তিনি কবি। তাই যখন যে বিষয়টির উপর মনের ঝোঁক গিয়া পড়ে তখন সেইটিই সাময়িকভাবে একান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সে ভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেও যে তাঁহার বিলম্ব হয় না,[২] এ তথ্য আমরা বহুবার তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি। আসলে যেটি normal সেই স্থানেই ফিরিয়া আসেন। তাই সমস্ত শিক্ষাকেই এক ছাঁচে ঢালিবার ইচ্ছা সাময়িকভাবে মনে উদিত হইলেও, তাহাকে কখনো শিক্ষা সম্বন্ধে কবির শেষ কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 'বহুধাশক্তি যোগে'ই জাতীয় জীবন বিচিত্র হয়, সুন্দর হয়, বলিষ্ঠ হয়— এই তত্ত্বই কবি বিশ্বাস করিতেন। শিক্ষামাত্রকেই সর্বতোভাবে কর্মপ্রতিষ্ঠ ও গ্রামমুখীন করিবার ও সর্বশ্রেণীর পক্ষে একই ধরনের বিশেষ শিক্ষাকে অনিবার্য করিয়া তুলিবার কল্পনা যে স্বাভাবিক বা normal হইতে পারে না, তাহা কবি বুঝিতেন। নহিলে বিশ্বভারতীতে বিচিত্র জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত না হইয়া উহা 'শিক্ষাসত্র' বা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পর্যবসিত হইয়াই থাকিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা একটি কোনো বিশেষ মতের— তাহা যতই মনোরম হউক— মধ্যে সীমিত করিয়া দেখিতে চাহেন তাঁহারা কবির সমগ্র সত্তাটির সন্ধান পাইবেন না; আবার সেটিকে বাদ দিলে তাহা অসম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং এই জটিল-মনীষী ও কবিকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার ঐক্যমূর্তির সন্ধান করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা ছিল স্বাধীনতা ও সংযম— 'opportunity for continuous initiative' (Graham Wallas)। আপনা হইতে সর্বদা কিছু সৃষ্টি করিবার উন্মুখতার মধ্যে এই আপাতবিরুদ্ধ স্বাধীনতা ও সংযম রহিয়াছে। এই initiative গৃহীত হইতে পারে freedom-এর মধ্যে— 'the keynote of modern education is freedom।' শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধির মধ্যে ছিল এই স্বাধীনতা এবং তারই সঙ্গে ছিল সংযম; সংযম discipline নহে— সংযম আত্মপ্রতিষ্ঠ, discipline বহিরাগত। আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বীকৃত সংযমকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণীয় মনে করিতেন। উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন স্বাধীনতা নহে, কৃচ্ছ্রসাধনও সংযম নহে, উভয়ই নেতিধর্মী। শিশু ও বালকের দেহে ও মনে যে উদ্দাম আনন্দ-আবেগ ক্ষণে-ক্ষণে সৃষ্ট হয় তাহাকে কবি উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া অভিহিত করিয়া কঠোর শাসন প্রবর্তন করিতে চাহিতেন না। ছাত্রদের boisterousnessকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন, তাঁহার অসহ্য হইত তাহাদের নীচতা, অশুচিতা। তাঁহার শিক্ষাদর্শে স্বাধীনতার মধ্যে সংযম, আনন্দের মধ্যেও সংযম, জীবনের প্রতি কর্মে ভাবনায় সংযম, অর্থাৎ কোনো বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান হারাইলে ছন্দ-ভঙ্গ হয়। কবির কাছে সৌষম্য বা সুষমাই সৌন্দর্য তথা পরিপূর্ণ জীবনবেদ।

এই সৌষম্য সংগীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে music বা সংগীতের স্থান এত বড়ো। Walter Pater যথার্থই বলিয়াছিলেন, Art struggles after the law of music। এই পূর্ণপ্রজ্ঞ শিক্ষা বা জীবনের সর্বোদয়ের জন্য সংগীত জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা হইতে সংস্কৃতিকে ও বিশেষভাবে সংগীতকে বাদ দিতে পারেন নাই।

---

১ Rabindranath Tagore in Russia, Ed. P.C.Mahalanobis, *Visva-Bharati Bulletin* No. 15, p 34.

২ আমাদের এই মতের সমর্থনে রোদেনস্টাইনকে লিখিত একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছিঃ "I know that during my contact with you I occasionally displayed moods that must have caused you pain, but I hope you realise that they never represented my deeper normally, that they were provoked by some jerks of time which for the moment was passing over a road badly out of repairs." The force of friendship (radio talk), by Francis Waston on Rabindranath Tagore and Sir William Rothenstein, *The Listner,* 12 July 1951, p 66।

কবি একস্থলে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন ধনলাঘবকে সে ভয় ক'রত না, লজ্জা ক'রত না, কেননা, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে।... তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক পারমার্থিকে মিলিয়ে।... কৃতিত্ব শিক্ষা [manual training] অত্যাবশ্যক হ'লেও এই যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে।... চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?"

এক্ষণে দেখা যাক কবি কিভাবে তাঁহার শিক্ষাদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এল্‌ম্‌হার্‌স্ট শ্রীনিকেতনে তাঁহার কার্যকালের প্রথম দিকে পার্শ্বস্থ গ্রাম-অঞ্চলে— home project বা গৃহশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থানীয় পাঠশালাসমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদের মারফত পল্লীবাসীর উপযোগী গৃহশিক্ষার আদর্শ প্রচার করিয়া দুই বৎসর পর স্থির হইল যে, একটি স্থায়ী শিক্ষাসত্র দরিদ্র ও অনাথ বালকদের জন্য স্থাপন করিতে পারিলে সেখানে শিক্ষার নূতন পরীক্ষা হইতে পারে। এই নূতন বিদ্যালয়ে শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে প্রথম খসড়া করিলেন এল্‌ম্‌হার্‌স্ট। দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া এল্‌ম্‌হার্‌স্ট তদ্দেশীয় শিক্ষাশাস্ত্রীদের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালোরূপে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের পর হইতে তাঁহার শিক্ষাদর্শ ও গ্রামোন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনাগুলি ক্রমশই দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। গত দুই বৎসর শ্রীনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তিনি কবির পরিকল্পিত 'শিক্ষাসত্রের' জন্য শিক্ষাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় idealist ও practical লোকের অনুপ্রেরণায় ও এল্‌ম্‌হার্‌স্টের ন্যায় practical idealist-এর সংযোগে শিক্ষাসত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল। এল্‌ম্‌হার্‌স্টের প্রবন্ধের নাম ছিল Siksha-Satra, a Home for orphans।[১]

এল্‌ম্‌হার্‌স্ট ১৯২৪-এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারিরূপে চীনযাত্রা করেন, তাহার পূর্বেই শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধটি লিখিয়া গিয়াছেন। এল্‌ম্‌হার্‌স্টের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া ও গ্রামের শিক্ষাসমস্যার সম্মুখীন হইয়া কবি ভাবিতেছেন, সর্বসাধারণের শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত পরিবেশ এই শ্রেণীর বিদ্যালয়েই সম্ভব। ইংরেজি স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় বিশিষ্টদের জন্য। কবির মন ক্রমশই বিশেষ হইতে সাধারণের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণের পর এই-সব ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু কোনো ভাবনাই দীর্ঘকাল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না, এ ভাবনারাজিকেও অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়া যান।

যাহা হইক, এই পরীক্ষা-পাস-নিরপেক্ষ তথাকথিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে 'শিক্ষাসত্র' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনার সঙ্গে এই শিক্ষাসত্রের আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কবি ভালো করিয়া জানিতেন যে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যহীনতাজাত দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, মনের অসাড়তা। ইহারই সহিত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা জড়াইয়া আছে; কবির মতে সকলগুলিকে যুগপৎ আক্রমণে নির্মূল না করিলে গ্রামকে ধ্বংস হইতে বাঁচানো যাইবে না। তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-কল্পনা লইয়া শ্রীনিকেতনের কর্মীরা গ্রামোদ্যোগ-কর্মে ব্রতী হন। কিন্তু পথ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তখনো কাহারও ছিল না। শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এল্‌ম্‌হার্‌স্ট তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিতেছেন— "The aim of the siksha-Satra is... to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunities for the joy of play that is work,— the work of exploration, and of work that is play,— the reaching of a succession of novel experiences; to give the child that freedom of growth which the young tree demands for its tender shoot, that field for self-expression in which all young life finds both training and

১ *The Visva-Bharati Quarterly*, Vol 11, July 1924, দ্রষ্টব্য *Visva-Bharati Bulletin* No. 9 ।

happiness" (p 24)। এই উক্তি জন ডিউইর বাণী, রবীন্দ্রনাথেরই বাণী।

আমাদের মতে বুনিয়াদি শিক্ষার ইহাই সর্বপ্রথম খসড়া। ইহার মূলকথা "প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্প ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীসরূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে।"[১]

ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল[২] তাঁহার *Reconstruction and Education in Rural India* (Allen 1932) গ্রন্থে শিক্ষাসত্রের গোড়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ ৯৪-১০৯)। তিনি বলিতেছেন, "Besides the Poet the two people who were most directly responsible for the starting of this experiment in rural education were Mr. L.K. Elmhirst, the first Director of the Institute, and Mr. Santosh Chandra Majumder." (p 94)। সন্তোষচন্দ্রকে এই কাজ গ্রহণের ভার দেন কবি। কারণ সন্তোষচন্দ্র ছিলেন 'not only a born teacher, he had love for children'। শিশুদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দরদ তাঁহাকে এই কাজের উপযুক্ত করিয়াছিল।

ছয়টি মাত্র বালক লইয়া সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্র আরম্ভ করেন। বালকদের রন্ধনাদি গৃহস্থালি হইতে বাগান করা, তাঁত বোনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করিতে হইত। পড়াশুনা হইতে হাতের কাজ, সুকুমার কলাচর্চা হইতে ঘরদুয়ারের কাজ, নৃত্যগীতাদি হইতে শরীরকে কর্মঠ করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত।

সন্তোষচন্দ্র দুই বৎসরের মধ্যে যে-কাজ করিয়া গিয়াছিলেন (জুলাই ১৯২৪—সেপ্টেম্বর ১৯২৬) তাহা রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্‌স্টের যুক্তপরিকল্পনার আদর্শেই সম্পাদিত হয়। নিষ্ঠার সহিত সন্তোষচন্দ্র কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ের যে বিস্তারিত প্রতিবেদন (ইংরেজি) লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুনিয়াদি-শিক্ষারত শিক্ষকদের কাজে লাগিবে, কারণ ভারতীয় সমাজের সমস্যা সর্বত্রই প্রায় সমান।

সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্রে দুই বৎসর পরীক্ষার পর লিখিয়াছিলেন, ছাত্রদের প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করাই ছিল আমাদের প্রথম কাজ : "Physical vitality was our first concern. The gain of the boys in height, weight and strength has been very remarkable. The boys have made considerable progress in gardening, weaving and construction; they cut and sew, and make their own garments, their own tables and boxes, can cook well, as well as paint, write a neat hand in Bengali, recite poems, know addition, subtraction, multiplication and division, not mechanically but in relation to life situations. They have begun to feel in their own little way that the individual's effort is not purely individual but invariably has social reactions. They are realising the value of mutual aid and have acquired the social habits of kindness and brotherliness.[৩]

কবির আদর্শ ছিল, শিক্ষাসত্রে ছাত্ররা যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পাইবে, তাহার দ্বারা তাহারা যে কেবল আপনাদের জীবিকা অর্জন করিবে তাহা নহে, তাহারা গ্রামে গিয়া গ্রামের উন্নতি করিতে পারিবে, তাহারা হইবে Village Leaders.[৪]

১৯২৬ অক্টোবরে সন্তোষচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষাসত্রের ভার অর্পিত হয় আরিয়ামের উপর। আরিয়াম

---

১ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫, পৃ ৩১২ ।

২ প্রেমচাঁদ লাল ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে যোগদান করেন । ১৯২৯-এ বিদেশে যান এবং ১৯৩২-এর অক্টোবর মাসে ডক্টরেট লইয়া ফিরিয়া আসেন। জুলাই ১৯৩৬ তিনি শ্রীনিকেতন ত্যাগ করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সহিত বিশ্বভারতীর যোগ ছিল।

৩ Manuscript (typed) copy হইতে উদ্‌ধৃত।

৪ 'Our educational work at Sriniketan', Krishnaprasanna Mukherji, M.A. P.H.D. *Visva-Bharati News*, February 1938, pp 60-62 ।

তখন শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ। অতঃপর ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। শান্তিনিকেতন হইতে উহা কেন সরাইয়া লওয়া হইল— তাহা ভাবিবার বিষয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধনী বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; তাহারা সকলেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পাস করা। তাহাদের পক্ষে রন্ধন করা, জল তোলা, বাগান করা, হাটবাজার করা সম্ভব নহে। শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা দরিদ্র-ঘরের ছেলে— পরীক্ষা পাস করার কথা তাহাদের মনে আসে না। " 'Living by doing' had been more of a theory at Santiniketan; it was going to be an actuality with those children,"[১]

শ্রীনিকেতনে প্রেমচাঁদ লাল এই নূতন প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন। নূতন পরিবেশে শিক্ষাসত্রে নূতন জীবন দেখা দিল। সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জনের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে হস্তশিল্প আয়ত্ত করার প্রয়োজন। সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি শুরু হইতেই দেওয়া হইল। ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে আছে— "While great stress is laid upon manual work by which they *learn to earn an honest livelihood;* in fact, the children take as much interest in reading writing etc., as in other activities. Great care is taken to present everything before them in the form of concrete projects."

বয়নশিক্ষা, সবজি উৎপাদনের জন্য বাগান করা প্রভৃতি নানাপ্রকার হাতের কাজের সঙ্গে পড়াশুনা চলিত। বাগান করার মধ্য দিয়া উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়নশাস্ত্রের আলোচনা চলে। ছাত্রদের নিজের কাজ নিজেদের করিতে হয়; এমন-কি পালাক্রমে রন্ধনাদির কাজও। বাগানের জন্য জল তোলা প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ বাদ যায় না। মোটকথা সাধারণ ছেলেকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিবার জন্য প্রথম হইতেই প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। আপনাদের ব্যয়ের কতখানি উঠাইতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হয়; তবে সম্পূর্ণরূপে অর্থ উপার্জন দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরিকল্পনা কোনো সময়ে ছিল না। বিদ্যালয়কে সকল প্রকার আর্থিক-সহায়-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান করা যে দুঃসাধ্য, দীর্ঘকাল বিদ্যায়তন চালাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার অসম্ভাব্যতা ভালো করিয়া জানিতেন ও সেজন্য শিক্ষাসত্রে সে চেষ্টা কখনো করেন নাই।

'শিক্ষাসত্র' প্রবন্ধ হইতে নিম্নে যে কয়টি পংক্তি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শের সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। "It is only through the fullest development of all his capacities that man is likely to achieve his real freedom"- মানুষের সকল বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে সে তাহার যথার্থ স্বাধীনতা পায়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইলেই জীবনযাত্রার সমস্যাজনিত উদ্বেগ থাকিবে না। "He must be so equipped as no longer to be anxious about his own self-preservation." গান্ধীজি বলিয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষা 'insurance against unemployment'— উভয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কমই।[২]

রবীন্দ্রনাথের ও এল্‌ম্‌হার্স্টের প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন, দশ বৎসর পর মহাত্মাজি যে বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেন তাহার অনেকখানিই শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছিল। সমসাময়িক মাসিকপত্রে[৩] ওয়ার্ধা শিক্ষাপ্রণালী বা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন- "এই প্রণালীটির দুটি দিক আছে। একটি শিক্ষাতত্ত্বের, অন্যটি অর্থনীতির দিক। শিক্ষাতত্ত্বের সহিত যে দিকটির সম্বন্ধ তাহা মূলতঃ ও সারতঃ ষোলো বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত (এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত) 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়ে অনুসৃত প্রণালীর মতো।... যাঁহারা ওয়ার্ধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের 'শিক্ষাসত্রে'র প্রণালীটিও দেখা উচিত।'

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মানুষের জীবনকে তাহার জীবিকার চেয়ে বড়ো করিয়া দেখা হয় নাই। তাই

---

১ *Reconstruction and Education in Rural India* by Dr. P.C. Lal, Allen, 1932, p 95 ।

২ শান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র ও মহাত্মাজির বুনিয়াদি শিক্ষা' প্রবন্ধ হইতে অনেক সহায়তা পাইয়াছি। দেশ পত্রিকা ২৩ বৈশাখ ১৩৫৭,পৃ ৩০-৩৫ ।

৩ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৪, পৃ ১৬৬ ।

বলিয়া জীবিকার সমস্যাকেও শিক্ষাদর্শ থেকে বাদ দিয়া কোনো তৃরীয় আদর্শবাদের দোহাই তিনি পাড়েন নাই। জীবনের আনন্দ, সৃজনপ্রৈতি, ক্রীড়াকৌতুক, এমন-কি অপব্যয়কেও তিনি শিক্ষা হইতে নির্বাসিত করেন নাই। নীতি ব্যতীত জীবন আদর্শে পৌঁছাইতে পারে না, যদি পৌঁছানো বলিয়া কোনো কিছু থাকে; কিন্তু নীতির থেকে বড়ো কথা ধর্ম; রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম'কেই মানিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শিক্ষাদর্শে জীবনের শাশ্বত ধর্ম এত বড়ো স্থান পাইয়াছে। বিচিত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিবিধভাবে রূপায়িত হইবার সুযোগ দানই শিক্ষার উদ্দেশ্য; বিশেষ মতকেন্দ্রিক সাফল্যে উত্তীর্ণ হইবার আদর্শ শিক্ষিত ও শিক্ষকের পক্ষে গৌরবের নহে।

গান্ধীজি জীবনকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন; তবে দেশের পরিস্থিতিতে জীবন হইতে জীবিকার উপর অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। কোটি-কোটি নিরক্ষর শিশুর শিক্ষাসমস্যা অচিরকালের মধ্যে তাহাদের জীবনে দেখা দিবে জীবিকার সমস্যারূপে। কিভাবে সেই সমস্যার আশু প্রতিকার করা যায়; তাহাই ছিল মহাত্মাজির শিক্ষা-জিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জীবিকা হইতে জীবন, গান্ধীজির আদর্শে জীবন হইতে জীবিকা, প্রাধান্য পাইয়াছিল। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য হয়তো দুরপনেয় নহে। ভবিষ্যতের শিক্ষাবিধি এই দুই ধারার যুক্তবন্ধনে নূতনরূপে দেখা দিতে পারে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনী (চতুর্থ খণ্ড) থেকে সংকলিত।

লেখক পরিচয়

সুনীলচন্দ্র সরকার (১৯০৭-১৯৭৬) **ঃ** প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও সুলেখক সুনীলচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩০ সালে ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওইসময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভ করেন। এরপর তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি হাওড়ার শালকিয়ার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। সেইসময় তৎকালীন পাঠগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'নির্ঝরিণী' কবিতার মর্মার্থ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীলচন্দ্র পত্রালাপ করেন।

১৯৪১ সালে সুনীলচন্দ্র সরকার প্রথম শ্রীনিকেতনে শিক্ষাবিষয়ক এক বিশেষ পদে যোগদান করেন। এরপর বিশ্বভারতীতে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি ইংরেজী বিভাগের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিনয়ভবনের অধ্যক্ষের কার্যপরিচালনা করেন।

ছাত্রদরদী অধ্যাপক, মননশীল লেখক হিসাবে সুনীলচন্দ্র সরকার তৎকালে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ ক'রেছিলেন। এছাড়া তিনি কবিতা, ছোটগল্প এবং কিশোরদের জন্যেও গ্রন্থরচনা করেন। এইসব সৃষ্টিমূলক রচনা একসময় যথেষ্ট সমাদৃতও হয়েছিল। তাঁর লেখা নাটক কলকাতার পেশাদার মঞ্চে দীর্ঘদিন ধ'রে অভিনীত হ'য়েছিল। তিনি সুগায়কও ছিলেন— নিজের লেখা তাঁর গাওয়া কয়েকটি গান নিয়ে গ্রামোফোনের ডিস্ক বেরিয়েছিল।

তাঁর লেখা প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে 'Tagores' Educational Philosophy and Experiment' 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা', 'The Poet and the seer' বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়া কাব্যগ্রন্থ 'মিলিতা', 'সাতমহাল' কিশোর-সাহিত্য 'কালোর বই' এবং নাটক 'কথা কও' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যিক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও মননশীল লেখক। তিনি দীর্ঘদিন বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ নিয়ে তাঁর লেখা 'Education for Fulness' একটি অত্যন্ত মূলবান্ গ্রন্থ। সেই বই থেকেই (১৯৬২) 'Siksha-Satra' শীর্ষক আলোচনাটি সংকলিত হ'য়েছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫) **ঃ** প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্র-জীবনীকার ও গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ প্রথমে জন্মস্থান রানাঘাটে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। পরে গিরিডি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন ১৯০৭ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। তারপর কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্ প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আশ্রমের কাজ ছেড়ে তিনি কলকাতার সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে পুনরায় শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন (১৯১৮)। তখন তিনি সিলভাঁ লেভির কাছে চীনা ও তিব্বতী ভাষাশিক্ষা করেন। এরপর শান্তিনিকেতনে তৎকালীন শিক্ষাভবনে অধ্যাপনা করেন ও পরে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। বিশ্বভারতী ১৯৬৫ সালে তাঁকে দেশিকোত্তম প্রদান করে। ভারত সরকার-প্রদত্ত পদ্মভূষণেও তিনি সম্মানিত। ৭০ বছর বয়সে সোভিয়েত সায়েন্স একাডেমির আমন্ত্রণে তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করেন।

চারখণ্ডে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত হ'লেও তাঁক লেখা আরও কয়েকটি রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থের মধ্যে রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী, রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ও Life of Tagore সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন, প্রাচীন ইতিহাসের গল্প, বাঙলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও Indian Literture in China and Far East ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গ : শিক্ষাসত্র

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

৪

শিক্ষাসত্র ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রস্তুতি পর্ব

১৯০১ — ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শৈশবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রচলিত বিদ্যায়তনগুলির 'সাদা ন্যাড়া দেয়ালগুলোর মরা চাউনি' ঘেরা 'নিষ্প্রাণ ছক বাঁধা পরিবেশে কোনো শিশুমন কিছু গ্রহণ করতে পারে না।' তাই কবি তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করলেন শান্তিনিকেতনের উদার প্রকৃতির কোলে। মুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে শিশুদের 'সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ' দিলেন।

১৯০৩ — প্রচলিত বিষয়গুলি ছাড়াও ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে কাঠের কাজ, বইবাঁধাই, তাঁতশিক্ষা প্রভৃতি বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং উচ্চতর শ্রেণীর পাঠক্রমে পল্লীউন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯১২ — সুরুল কুঠিবাড়ি ক্রয়। জমিদারি পরিদর্শনকালে শিলাইদহ-পতিসর অঞ্চলে কবি পল্লীউন্নয়নের যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন তা একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ঃ 'তখন থেকে আমার মনে হয়েছে যে পল্লীর কাজ করতে হবে। আমি আমার ছেলেকে আর সন্তোষকে পাঠালুম কৃষিবিদ্যা আর গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসতে... ঠিক সেই সময়ে এই বাড়িটা (সুরুল কুঠিবাড়ি) কিনেছিলুম। ভেবেছিলুম শিলাইদহে যা কাজ আরম্ভ করেছি এখানেও তাই করব।'

১৯১৭-২১ — সুরুল কুঠিকে কেন্দ্র করে খেত-খামার ও ডেয়ারীর কাজ শুরু। নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি (রবীন্দ্রনাথের জামাতা) ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পল্লীপুনর্গঠনের কাজ অর্থাভাবের জন্য এ সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

১৯২১ সালের নভেম্বরে এল.কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট এলেন শান্তিনিকেতনে; সেই সঙ্গে এল ডরোথির (পরবর্তীকালে এল্‌ম্‌হার্স্টের সহধর্মিনী) অর্থ-সাহায্য।

২২ ডিসেম্বর, ১৯২১ বিশ্বভারতী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

১৯২২ — গ্রামীণ জীবনের উন্নতির লক্ষ্যে কর্মভিত্তিক ও গ্রামমুখী শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল 'শ্রীনিকেতন' (৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২২) যার প্রথম অধ্যক্ষ হলেন এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট।

সমান্তরাল অন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা অঙ্কুরিত

আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন প্রচলিত ছকের যান্ত্রিক পাঠক্রম ও পরীক্ষা-পদ্ধতি বিরোধী তাঁর শিক্ষাদর্শের সফল রূপায়ণ সেখানে সম্ভব নয়। ১৯১৩ সালেই সন্তোষচন্দ্রকে লিখলেন, 'বিদ্যালয়ে সম্প্রতি খুব-একটা অস্বাস্থ্যের আমদানী হয়েছে।... তোমরা ভুবনডাঙার উপকার এবং সাঁওতাল পাড়ার উন্নতি করতে চাও কিন্তু যখন তোমাদের নিজের শ্রীহীনতার দিকে তাকাও তখন নালিশ করতে থাক যথেষ্ট মালি নেই, মজুর নেই, টাকা নেই...'। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন, 'অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা...

ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।... আমাকে এ ব্যাপারটা মেনে নিতে হয়েছে, তা না হলে আমার ইস্কুলে একটি ছাত্রও থাকত না।'

কবি তাঁর শিক্ষাদর্শ রূপায়নের পথে অনেক বাধার উল্লেখ করেছেন
সমাজের শিক্ষাভিমানী অংশের প্রচলিত প্রথা ও অভ্যাস
অভিভাবকদের প্রত্যাশা
শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বের গঠন
নিয়মতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র দাবি ও নিয়ম কানুন
স্বদেশবাসীর আর্থিক সহায়তার অপ্রতুলতা।

এই সকল বাধার সঙ্গে আপোসের যন্ত্রণা থেকে জন্ম নিল সমান্তরাল অন্য এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প। এই কাজে তাঁর প্রধান সহযোগী হলেন এল. কে. এল্‌ম্‌হার্স্ট।

জুলাই ১, ১৯২৪ — প্রতিষ্ঠিত হ'ল কবির ইস্কুল শিক্ষাসত্র। কবির ইচ্ছায় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শিক্ষাসত্রের দায়িত্ব নিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁরই বাড়ির প্রাঙ্গণে শিক্ষাসত্রের পঠন-পাঠন শুরু হ'ল। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে এল পড়ুয়ারা 'যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই।'

প্রথম যে ছ'জন ছাত্রকে নিয়ে শিক্ষাসত্র শুরু হ'ল :

১. অতুলচন্দ্র ঘোষ
২. সত্যেন্দ্রনাথ সাহা
৩. বেণুকর ভট্টাচার্য
৪. কিরীটিপ্রসাদ কর
৫. রামেশ্বর লাল
৬. চিত্তরঞ্জন কর

সূচনায় পাঠক্রমে ছিল :

সাহিত্যচর্চা, গণিত, কৃষিবিজ্ঞান, পশুবিজ্ঞান, গান, ছবি আঁকা, মাটির কাজ, স্বাস্থ্যচর্চা, তাঁতের কাজ, প্রকৃতিপাঠ ও গৃহনির্মাণ।

জুলাই, ১৯২৪ — প্রকাশিত হ'ল 'A Poet's S chool' (বিশ্বভারতী বুলেটিন নং ৯)। এই মূল্যবান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শের কথা, শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ে সে শিক্ষাদর্শের রূপায়ণের প্রয়াস এবং সর্বোপরি কোন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দ্বিতীয় বিদ্যালয় শিক্ষাসত্রের প্রয়োজন অনুভূত হ'ল তা' ব্যক্ত করেছেন।

১৯২৫ — মহাত্মা গান্ধীর পরিদর্শন। এল্‌ম্‌হার্স্টের বিবরণ থেকে জানা যায়, শিক্ষাসত্র দেখে গান্ধীজি এত অভিভূত হন যে তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুদেবের কাছে শিক্ষাসত্রের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে তিনি তাঁর সর্বভারতীয় স্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম রচনার কাজে সন্তোষচন্দ্রের মত দক্ষ শিক্ষকের সহায়তা পান।

মে, ১৯২৬	প্রকাশিত হয় সন্তোষচন্দ্র মজুমদার রচিত 'The Siksha Satra— An Experimemnt in Village Education.'
নভেম্বর ৩, ১৯২৬	মাত্র ৪১ বৎসর বয়সে সন্তোষচন্দ্রের পরলোক গমন।
জুলাই, ১৯২৭	শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত।
১৯২৭-১৯৪০	এই সময়কার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছিল : বাঙ্‌লা, ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্যশিক্ষা, অঙ্কন ইত্যাদি। কিন্তু নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক তেমন কিছু ছিল না। প্রেমচাঁদ লালের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩৫ সালে লেখা-পড়া ছাড়াও শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল : বিবিধ শিল্পকর্ম (বয়নশিল্প, দারুশিল্প, বইবাঁধাই, চর্মশিল্প প্রভৃতি), উদ্যানচর্চা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, খেলাধূলা ও ব্রতীবালক, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সাহিত্যসভা ও হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা 'চেষ্টা'র প্রকাশন। ছাত্রাবাসের কাজকর্ম যথা হাটবাজার করা, হিসেব রাখা ও নিজেদের নেতা নির্বাচন ইত্যাদি ছাত্ররাই করতেন। কোনও শিল্পে ছাত্ররা দক্ষতা অর্জন করলে তাদের কাজ দেওয়া হ'ত এবং সেই কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দেওয়া হ'ত।
১৯৩৭	গান্ধীজি তাঁর ওয়ার্ধা বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করলেন যার সঙ্গে শিক্ষাসত্রে অনুসৃত পদ্ধতির সাযুজ্য লক্ষণীয়। সম্ভবত ১৯২৫ সালে দেখা শিক্ষাসত্র তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।
১৯৪০-৫২	ছাত্র ও অভিভাবকদের তাগিদে এসময় সকালে পুস্তক সহযোগে বিদ্যাচর্চা এবং নানাপ্রকার শিল্পকর্ম বিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে স্থান পেল। ১৯৪০ সালের পর রান্নার কাজে প্রথম পাচক নিযুক্ত হয় কিন্তু ছাত্ররা যথারীতি বাসন-পত্র ধোয়া, মেঝে পরিষ্কার রাখা এবং খাবার পরিবেশন প্রভৃতি কাজ করতে থাকে। নিয়মিতভাবে 'দৈনিক' নামে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হতে থাকে। এই সময়কার ছাত্র কালিদাস ঘোষকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়।
১৯৫১	বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'ল। শিক্ষাসত্রের সে-যুগের প্রখ্যাত কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার নাম : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, প্রেমচাঁদ লাল, ইওসিমিকি কাসাহারা, ধীরেন্দ্রমোহন সেন, সুনীলচন্দ্র সরকার, তারকচন্দ্র ধর, শান্তিদেব ঘোষ, আর্যনায়কম, মার্জোরী সাইক্‌স্‌, হরিহরণ, শীলা কর, কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, রাণী দে (চন্দ), বিনায়ক মাসোজী, শিশিরকুমার ঘোষ ও সমীরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শিক্ষাসত্রের পুনর্বিন্যাস

১৯৫৪ শ্রীনিকেতনে অবস্থিত সরকারি অনুদান-প্রাপ্ত অনাবাসিক মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়টি শিক্ষাসত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল এবং এই সময় থেকেই শিক্ষাসত্রকে একটি দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হ'ল।

সংযুক্তির পর শিক্ষাসত্রের পাঠক্রমে বাঙলা, ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞান ছাড়াও ছিল দারুশিল্প, ধাতুশিল্প, তাঁতশিল্প, সাধারণ যন্ত্রবিদ্যা, অঙ্কন, সূচীশিল্প, চর্মশিল্প, গালার কাজ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি বিষয়।

১৯৫৪-৫৫ সালে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ভার ছিল শিক্ষাসত্রের কর্তৃপক্ষের উপর কিন্তু নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পাঠভবনের সঙ্গে একই হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল কারণ উভয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একই পরীক্ষায় বসতে হ'ত।

এই সময় থেকে শিক্ষাসত্র শুধু দুঃস্থ বালকদেরই রইল না, সমাজের সর্বস্তরের ছেলে-মেয়েদের জন্যও এখানে পড়বার সুযোগ উন্মুক্ত হ'ল কারণ এক সময় গুরুদেব লিখেছিলেন :

'Students other than orphan may be admitted whose guardians fully approve of this kind of education.

শিক্ষাসত্রের এই পুনর্বিন্যাসের পর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল।

১৯৫৫-৫৬ এ সময়ের বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় শিক্ষাসত্রকে 'রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউট'-এর পরিপোষক শিক্ষায়তন রূপে রূপায়নের চেষ্টা হ'য়েছে।

১৯৫৬-৫৭ সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে শিক্ষাসত্রকে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হ'ল এবং তদনুযায়ী নতুন পাঠক্রম গৃহীত হ'ল।

১৯৬২ নতুন পাঠক্রমে শিক্ষাসত্রের প্রথম দল পরীক্ষায় বসল।

১৯৬৪ শিক্ষাসত্র স্থানান্তরিত হ'ল বর্তমান স্থানে।

১৯৬৫ এ সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলি ছিল পঞ্চম থেকে একাদশ।

১৯৬৬ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী খোলা হ'ল।

১৯৬৮ প্রথম শ্রেণী খোলা হ'ল।

১৯৭০ শিক্ষাসত্র ও পাঠভবনের (পরবর্তীকালে উত্তরশিক্ষা সদনেরও) পরিচালনা, শিক্ষাপদ্ধতি ও নির্ধারণের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে গঠিত হ'ল 'পূর্বশিক্ষা পরিষদ'।

১৯৭২ আবাসিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি বং. হ'ল।

১৯৭৪ শিক্ষাসত্রের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হ'ল।

সর্বভারতীয় বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাসত্রেও দশম শ্রেণীর পাঠক্রম পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

১৯৭৬	উপরি-উক্ত পাঠক্রমে প্রথম দল পরীক্ষায় বসল।
	এই সময় থেকে শিক্ষাসত্র সম্পূর্ণরূপে অনাবাসিক চরিত্র পেল।
১৯৮২	১৯২৭ সালে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকে শিক্ষাসত্র এ পর্যন্ত পল্লীসংগঠন বিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৯৮২ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে শিক্ষাসত্র স্বতন্ত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব পেল।
	এ বৎসর থেকেই ছাত্ররা 'এন.সি.সি.'তে যোগদানের সুযোগ লাভ করল।
১ ও ২ জুলাই, ১৯৮৪	শিক্ষাসত্রের ষষ্টিবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হ'ল।
২৫ ও ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৭	রবীন্দ্রনাথের একশত পঞ্চবিংশতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা-সভা। বিষয় : রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যালয়শিক্ষা।
১৯৮৮	সন্তোষ পাঠশালার প্রতিষ্ঠা।
জুলাই, ১৯৯৮	বর্ষব্যাপী শিক্ষাসত্রের পঁচাত্তরবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা।
জুলাই, ১৯৯৯	পঁচাত্তরবর্ষ-পূর্তি উৎসবের সমাপ্তি।
	বর্তমানে শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি :
	বাঙ্‌লা, ইংরেজী, গণিত (সাধারণ ও অতিরিক্ত), ভৌতবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান, সংস্কৃত, ইতিহাস,ভূগোল, হিন্দি, অর্থনীতি, রবীন্দ্রচর্চা, তাঁতশিল্প, সূচীশিল্প, বাটিক, দারুশিল্প, উদ্যানচর্চা, বৈদ্যুতিক সার্ভিসিং ও মেরামতি, অঙ্কন, মাটির কাজ, নৃত্য, সঙ্গীত, তবলা ও শারীরশিক্ষা।
	এছাড়াও সাপ্তাহিক সাহিত্যসভা, হাতে-লেখা পত্রিকার প্রকাশন, বেতার অনুষ্ঠান, নাটক, এন.সি.সি., রাজ্যস্তরে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বনভোজন প্রভৃতি নানা সহ-পাঠক্রমিক কর্মকাণ্ডে ছাত্রছাত্রীরা সারা বৎসরই সক্রিয় অংশগহণ করে।

গত দশকে (১৯৯০-৯৯) স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শিক্ষাসত্রের ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব লক্ষণীয় :

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	কৃতকার্য	কৃতকার্যের শতকরা হার
১৯৯০	৩২	২৯	৯০.৬৩
১৯৯১	৫০	৩৮	৭৬.০০
১৯৯২	৫১	৩৬	৭০.৫৬
১৯৯৩	৪৯	৩৬	৭৩.৪৭
১৯৯৪	৪৮	৪৪	৯১.৬৭
১৯৯৫	৫৯	৫০	৮৪.৭৫
১৯৯৬	৩৬	৩০	৮৩.৩৩
১৯৯৭	৫৩	৪২	৭৯.২৫
১৯৯৮	৬৩	৫৫	৮৭.৩০
১৯৯৯	৫৭	৫৭	১০০.০০

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পর শিক্ষাসত্রের অধীক্ষক বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব যাঁরা পালন করেন :

নন্দলাল বসুর পক্ষে ইন্দুসুধা ঘোষ ও বিনায়ক মাসোজী
আরিয়ম উইলিয়ম আর্যনায়কম
প্রেমচাঁদ লাল
ধীরেন্দ্রমোহন সেন
মার্জোরী সাইক্স্
তারকচন্দ্র ধর
কৃষ্ণপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সুনীলচন্দ্র সরকার
সুখেনলাল ব্রহ্মচারী
সমীরণ চট্টোপাধ্যায়
ললিতকুমার মজুমদার
কালিদাস ঘোষ
প্রদ্যোতকুমার প্রামাণিক
প্রদ্যোতকুমার মণ্ডল
সৌরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাময়িকভাবে)
পীযূষকুমার মুখোপাধ্যায়
পঙ্কজকুমার দত্ত (সাময়িকভাবে)
স্মরজিৎ রায় (বর্তমানে কর্মরত)

সংকলন : অশোককুমার বাজারী, শিক্ষাসত্র

গ্রন্থপঞ্জী

১. পল্লীপ্রকৃতি : রবীন্দ্রনাথ
২. রাশিয়ার চিঠি : রবীন্দ্রনাথ
৩. বিশ্বভারতী : রবীন্দ্রনাথ
৪. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম: রবীন্দ্রনাথ
৫. শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ (রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও পত্রের সংকলন) শান্তিনিকেতন পুস্তকপ্রকাশ সমিতি, ৭ পৌষ ১৩৮৯।
৬. রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : শিক্ষাচিন্তা [রবীন্দ্ররচনা সংকলন] সম্পাদনা : সত্যেন্দ্রনাথ রায় (গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড) ৩ শ্রাবণ ১৩৮৯।
৭. রবীন্দ্রজীবন (চতুর্থ খণ্ড) : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
৮. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা : সুনীলচন্দ্র সরকার (মৈত্রী ২২ শ্রাবণ ১৩৭১)
৯. রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি (১৯৬২) সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র সেন
১০. 'তীর্থদর্শনে'র পঞ্চাশ বছর : সম্পাদক শৈলেন চৌধুরী
১১. সোভিয়েত ইউনিয়নে রবীন্দ্রনাথ, নথিপত্রের সংকলন (বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনালয়, মস্কো)
১২. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র : রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।
১৩. সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শিক্ষাসত্র কথা : পঞ্চানন মণ্ডল। 'সবিতা' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা সাধনা সোম, মাঘ ১৩৪৫।
১৪. শ্রীনিকেতন পরিচয় : চিত্তরঞ্জন দেব (২২ মাঘ ১৩৬৮)
১৫. ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি : শান্তিদেব ঘোষ
১৬. শিক্ষাসত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (শিক্ষাসত্রের পঞ্চাদশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)
১৭. Rabindranath Tagore : Pioneer in Education (Essays and Exchanges between Rabindranath Tagore and L. K. Elmhirst) John Murray 1961.
১৮. Reconstruction and Education in Rural India : Dr. P. C. Lal (George Allen Unwin 1932).
১৯. Rabindranath Tagore (1861-1961) : A Centenary Volume, Sahitya Academy 1961.
২০. Rabindranath Tagore in Russia— an account of the poet's visit to Moscow. Ed. by P. C. Mahalanobis. Visva-Bharati Bulletin No 15.
২১. Siksha-Satra By P. C. Lal; Visva-Bharati News Vol IV, Number three, September 1935.
২২. Santiniketan and Sriniketan, by Sm. Uma Dasgupta; Visva-Bharati Quarterly (Vol 41) No 1-4, Abu Sayeed Ayub Number.
২৩. Siksha-Satra by L. K. Elmhirst, Visva-Bharati Bulletin No 9, December 1928.
২৪. Siksha-Satra : An Experiment in Rural Education at Sriniketan, Visva-Bharati Bulletin No 21, Janjary 1949.

২৫. Siksha-Satra (A Home School for Village Boys). Visva-Bharati Bulletin No 21, February 1936.
২৬. A Poet's School by Rabindranath Tagore; Visva-Bharati Bulletin no 9, July 1924.
২৭. Rabindranath Tagore : Homage from Visva-Bharati (1962) Ed. Santosh Chandra Sengupta.
২৮. Gandhi Centenary Volume, Visva-Bharati, Santiniketan 1969.
২৯. Our Experiments with Rural Education : Dr. K. P. Mukerji (Santiniketan Press)
৩০. রবীন্দ্রনাথ-বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি, সম্পাদক, প্রবোধচন্দ্র সেন
৩১. Education for Fulness : Himangsubhusan Mukherjee, Asia Publishing House.
৩২. শিক্ষাসত্র (ষষ্টিবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ) সংকলন ও সম্পাদনা : রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও চন্দনকুমার দাস
৩৩. শিক্ষাসত্র (ষষ্টিবর্ষপূর্তি প্রদর্শনী পুস্তিকা) : অম্বুজানন্দ রায় (১ জুলাই, ১৯৮৪)

শিক্ষাসত্র

তৃতীয় খণ্ড

বিশ্বভারতী • শ্রীনিকেতন

আলোচনা-চক্র

বিষয় : আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা

প্রসঙ্গ : শিক্ষাসত্র

আলোচনা-চক্র

বিষয় : আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা

আলোচনা-চক্রের দ্বিতীয় অধিবেশনের বক্তা শ্রীপীযূষ মুখোপাধ্যায় এবং দর্পনারায়ণ পাল মহাশয়ের ভাষণদুটির অনুলিখন সময়মত হাতে না পাওয়ায় এই গ্রন্থে প্রকাশ করা গেল না বলে আমরা দুঃখিত।

ভূমিকা

পয়লা জুলাই ১৯২৪—শিক্ষাসত্রের সেই জন্মলগ্ন থেকেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র তথা শিক্ষাভাবনা নিয়ে যে আলোচনা-পর্যালোচনা চ'লছে আজও তার শেষ নেই। অনেকসময় সে আলোচনা পরস্পর-বিপরীতধর্মী। কখনও বা তা অন্ধের হস্তী-দর্শনের মত অসম্পূর্ণ।

শিক্ষাসত্রের বর্ষব্যাপী পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তির উৎসব-পালনের মুহূর্তে আরেকবার সেই বহুচর্চিত রবীন্দ্রশিক্ষাভাবনার বিষয়টি পুনরালোচনার প্রয়োজন অনুভূত হ'ল। আমাদের আলোচনার বিষয়, নির্ধারিত হ'ল : 'আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।' ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ আলোচনার শুভ সূচনা করেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত এবং তারপর দুই দিন-ব্যাপী আলোচনা-সভায় বিভিন্ন অধ্যাপক-শিক্ষাবিদ্ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁদের মতামত উপস্থাপন করেন। এই আলোচনা-সভায় প্রদত্ত ভাষণগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হ'ল। আমরা বিশ্বাস করি, এইসব ভাবনাচিন্তা শিক্ষাসত্রের পরিচালকবর্গের কাছে ভবিষ্যতে মূল্যবান ভূমিকা পালন ক'রবে।

২ জুন ২০০২

স্মরজিৎ রায়
অধ্যক্ষ, শিক্ষাসত্র

শিক্ষাসত্র

বিশ্বভারতী

পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উৎসব
১৯২৪-১৯৯৯

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, সকাল ৯টা

সভাপতি বরণ
বেদগান
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন
অধ্যক্ষের স্বাগত ভাষণ
প্রধান অতিথির ভাষণ
সভাপতির ভাষণ
ধন্যবাদ জ্ঞাপন
সমাপ্তি সঙ্গীত

আলোচনাচক্র

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, মঙ্গলবার
সকাল ১০.৩০ মি: আলোচনাচক্রের প্রথম অধিবেশন
বিষয়: আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা
সভাপতি: শ্রীমতী আরতি সেন
বক্তা: শ্রীআলোকনাথ সেনশর্মা (আলোচনার সূচনা)
শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীতরুণ মজুমদার
শিক্ষাসত্রের ছাত্র: অভিনন্দন সেন
শ্রীসৌম্যেন সেনগুপ্ত

আলোচনাচক্র

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, মঙ্গলবার
দুপুর ২.৩০ মি: আলোচনাচক্রের দ্বিতীয় অধিবেশন
বিষয়: আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা
সভাপতি: শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
বক্তা: শ্রীপবিত্র গুপ্ত
শ্রীপীযূষ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমোহিত চক্রবর্তী
শিক্ষাসত্রের ছাত্রী: পাপিয়া গুরুং
শ্রীদর্পনারায়ণ পাল

আলোচনাচক্র

১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯, বুধবার
সকাল ৮.৩০ মি: আলোচনাচক্রের তৃতীয় অধিবেশন
বিষয়: আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা
সভাপতি: শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বক্তা: শ্রীস্বপন মজুমদার
শ্রীললিতকুমার মজুমদার
শ্রীদেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
শিক্ষাসত্রের ছাত্র: দেবরাজ ভকত
শিক্ষাসত্রের ছাত্রী: সঙ্গীতা ঘোষ
শ্রীরূপকমল চৌধুরী
শ্রীসমীরণ মণ্ডল
সকাল ১১.৩০ মি: প্রশ্নোত্তর

স্বাগত ভাষণ

স্মরজিৎ রায়,
অধ্যক্ষ, শিক্ষাসত্র

শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, মাননীয় উপাচার্য মহাশয়, সুধিবৃন্দ, সহকর্মিগণ ও স্নেহের ছাত্রছাত্রীরা

গত পয়লা জুলাই শিক্ষাসত্র পঁচাত্তর বছরে পদার্পণ ক'রে। গত ২ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. আর. কিদোয়াই শিক্ষাসত্রের প্লাটিনাম জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন। সেই অনুষ্ঠানেরই এটি দ্বিতীয় পর্যায়। এই অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের আলোচনা-চক্রের বিষয় : 'একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।'

এই মুহূর্তে শিক্ষাসত্রের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তির প্রাক্‌কালে একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার অভিনবত্বের দিকগুলি নিয়ে আবার ভাবা যেতে পারে। বর্তমানকালে অনিশ্চয়তা ও জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে হতাশাজনক চিত্রটি প্রতিনিয়তই দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের কল্যাণে বাহ্যিক আড়ম্বরের পাশাপাশি অন্তরের দীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা বিশ্বাস করি এইসব মর্মপীড়াদায়ক জীবনযাত্রার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথই আমাদের একমাত্র পথ-প্রদর্শক। আজকের আত্মিক সকল মুহূর্তে আমরা তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা অপরিহার্য ব'লে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার অন্যতম বিষয় সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, শিল্প ইত্যাদি কলাবিদ্যার চর্চাকে কিছু লঘুচিত্তের মানুষ খাটো করে দেখে থাকেন। তাদের সেই সংকীর্ণ চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কারণ রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের হতাশা-বর্জিত আনন্দময় জীবনযাপনের শৈল্পিক দিকগুলি যখন বিকৃতরুচির বিনোদনের উপকরণের প্রভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে তখন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আমাদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে গুটিকয় ছাত্র নিয়ে যে শিক্ষাসত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ এত বছর পর তার কিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রসৃষ্ট বিদ্যালয় সম্বন্ধে কৌতূহলী অথচ সত্য-অনুসন্ধানী পাঠকমাত্রেই জানেন, সে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে। তাঁরই সম্মতিসাপেক্ষে। বলাই বাহুল্য, শিক্ষার্থীর মানসিক চাহিদা-পূরণে এবং শিক্ষার্থীর যথাযথ বিকাশের উপযোগী বাতাবরণ সৃষ্টিতে শিক্ষাসত্রের সজাগ দৃষ্টি বিবেকবান মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার নয়।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের যথাযথ রূপায়ণে শিক্ষাসত্র আজও তার দায়িত্ব পালন ক'রে যাচ্ছে। আজকের আলোচনাচক্রে শিক্ষাসত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থেকে যাচ্ছে, তবে তা যেন শিক্ষাসত্রের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের তথা শিক্ষাসত্রের ভূমিকা-পালনের সহায়ক হয়ে ওঠে এটাই প্রার্থনা। এক ধ্যানধারণার বশবর্তী না হয়ে শিক্ষাসত্রের ভূমিকাটিকে আমরা যেন খাটো ক'রে না দেখি। আজ পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তির প্রাক্‌কালে গুরুদেবের সংকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত করাই আমাদের লক্ষ্য বা বাঞ্ছনীয়। সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র শ্রীনিকেতন। শিক্ষাসত্রের সকল দিককে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

সভাস্থ সকলকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

প্রধান অতিথির ভাষণ

অধ্যাপক অম্লান দত্ত,
প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী

শিক্ষাসত্রের পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আপনারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সেইজন্য আমি অতিথিদের কাছে কৃতজ্ঞ, সেইসঙ্গে বলা ভালো যে আমি কিছুটা বিড়ম্বিত বোধ করছি। কারণ 'পঞ্চসপ্ততিতম বর্ষপূর্তি' বা এই ধরনের জয়ন্তী-উৎসবে সাধারণত একটা আনন্দের মেজাজ থাকে, কোনও গভীর আলোচনার মেজাজ নয়। আমি ঠিক উৎসব-ভাষণ দিতে অভ্যস্ত নই, আমি আলোচনা ক'রতে অভ্যস্ত। তবে আশ্বস্ত হবার কারণ এই যে আপনারা আলোচনাচক্রেরই আয়োজন করেছেন। উৎসবের অংশটা হয়ত পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হবে।

আলোচনার বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে 'আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।' এ কথা প্রশ্নাতীত যে, রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ থেকে শান্তিনিকেতন এবং শিক্ষাসত্র অনেক অনেক দূরে সরে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে বলা ভালো যে আমরাও রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এই যে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ থেকে সরে যাওয়া, এই যে অপসরণ এটা কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের পথে বাধা আছে, প্রবল বাধা। কথা হ'ল এই যে, বাধা যতই প্রবল হোক না কেন, এই অপসরণের ভিতর দিয়ে শেষপর্যন্ত দেশের এবং সমাজের সমস্যার সমাধান হতে পারে। রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের পথে চলা কঠিন এটা স্বীকার করার পরও জানা প্রয়োজন যে এই পথে না চ'ললে আমরা শেষপর্যন্ত সমাজের সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারব না, একথা একসঙ্গে বোঝা দরকার।

এখন প্রশ্ন হল বাধা কী ধরনের। সেটা বোঝানো খুব সহজ। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকাল থেকেই দেখা যাচ্ছিল এবং তারপর অনেক দশক কেটে গেল। এটার ভিতর দিয়ে সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের অভিভাবকেরা এবং ছাত্রছাত্রীরা যে ধরনের শিক্ষা চান তা এবং রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ এক নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে সেটা লক্ষ্য ক'রে গেছেন। তিনি নিজে যেটা চান এবং অভিভাবকরা যা চান এই দুটো এক নয়। আমাদের দেশে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। এই মধ্যবিত্ত সমাজে দুটো জিনিস হ'ল প্রধান : প্রথমত, বাজার-ব্যবস্থার প্রসার ও বাজারে শিল্পের ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি।

তার মানে আমলাব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি। এই যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, বাজার-ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য এই সবকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য; তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্য থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই উচ্চশিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ হওয়া, আমলাতন্ত্রে একটা সুবিধাজনক চাকরি জোগাড় ক'রে নেওয়া। আজকের সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে দেশে এবং বিদেশের বিভিন্ন জায়গায়। এবং বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা চান যে, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা এবং ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের ইচ্ছা, এই দুই এক নয়। রবীন্দ্র-শিক্ষাব্যবস্থার সময় যে শিক্ষা গড়ে উঠেছিল আর আজকে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ পর্যন্ত বোঝা কঠিন নয়। আমাদের দেশে যে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে বিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনা ক'রলে দেখা যায় যে, ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা এত বেশি যে এইরকম আরেকটি দেশ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া কঠিন।

আবার ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা যত বেশি এইরকম আরেকটি দেশ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। উচ্চশিক্ষিত,

ছাত্রছাত্রী যা ভারতে তৈরি হচ্ছে তারা বিদেশে গিয়ে ভালোই কাজ ক'রছে। এমন উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রী তৃতীয় বিশ্বে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। এইরকম একটা বৈপরীত্য আছে এ দেশে। এটা কি ক'রে সম্ভব হ'ল, কি ক'রেই-বা সম্ভব হ'তে পারে। এটা হ'তে পারে নানা কারণে। এই দেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অংশ হওয়া এবং চাকরি করা। প্রধান উদ্দেশ্য দেশকে নিরক্ষর করা নয়। উদ্দেশ্য উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আকাঙক্ষা পূর্ণ করা এবং এরকম একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। এটা আমরা গভীরভাবে বুঝতে পারি। আমি জানি রবীন্দ্র-শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অনেক সুন্দর বক্তৃতা দেওয়া যায়। এইরকম বক্তৃতা আমি কখনও দিইনি তা নয়, দেশে অথবা বিদেশে। আমি জানি সেটা ব'ললে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অথবা শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে সবকথা বলা হয় তাও নয়। এই বিষয়টা বোঝা দরকার। বাধা আছে, প্রবল বাধা। রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ অনুসরণ ক'রে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রধান বাধা এই যে, যারা শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে আসেন তাদের উদ্দেশ্য অন্য— তাদের উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করা নয়।

এবার তাহ'লে দ্বিতীয় কথায় আসা যাক। আমি বললাম, বাধা আছে। আর আমি সেই সঙ্গে বলেছিলাম যে যদিও বাধা আছে, তবুও শেষপর্যন্ত যদি আমরা একটা দীর্ঘ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে চাই তাহ'লে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শকে উপেক্ষা ক'রে একটা নতুন শিক্ষাব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলেছি, তা গড়ে উঠেছে এবং আরও কিছুদিন চ'লবে ব'লে মনে করা যায়। তবে তার ভিতর দিয়ে এই সমাজের সঙ্কটের কোনও অবসান ঘটবে না, ঘটতে পারে না। এই কথাটা আসলে শুধু ভারত সম্বন্ধে সত্য নয়, এটা সারা বিশ্ব সম্বন্ধে সত্য। যেহেতু আমরা এখানে বসে আলোচনা ক'রছি তাই ভারতের কথাই বলছি। অন্য কোথাও আলোচনা করলে সারা বিশ্বের কথাই বলতাম। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়ে আমি শুধু শান্তিনিকেতনের কথা বলছি না, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলছি।

এই উচ্চশিক্ষার ভিতর দিয়ে প্রথম থেকেই, স্কুল পর্যায় থেকেই উদ্দেশ্যটা হ'ল চাকরি জোগাড় করা। যে কোনও জায়গায় চাকরি জোগাড় ক'রে নেওয়া তা সে সরকারি, বে-সরকারি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হতে পারে। এটাই হ'ল উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তবু ভেবে দেখা দরকার যে, এ দেশের অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের চাকরি পেতে পারে না, পারেনি, পারবে না। এটা সম্ভব নয়।

আমরা একের পর এক অনেকগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হয়ে এসেছি। আপনারা যদি সেগুলো দেখেন তাহ'লে দেখবেন যে প্রতিটি পরিকল্পনায় বলা হয়েছে এইবারে নিরক্ষরের সংখ্যা কমেছে এবং প্রতিবার দেখানো হয়েছে যে আগের চেয়ে বে-রোজগার মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, ক্রমাগত বেড়েছে। ১৯৫১ সালে যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল, সেইসময় থেকে আজ ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই ঘটনাই ঘটে চলেছে। আমাদের দেশে শিল্পের প্রসার ঘটেনি এমন নয়, ঘটেছে এবং সঙ্গে অশিক্ষিতের সংখ্যাও বেড়েছে। আমাদের দেশে শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদির প্রসার ঘটা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রশক্তির বৃদ্ধি সত্ত্বেও, প্রশাসনে— সেটা সরকারি হোক বা বেসরকারি যাই হোক না কেন, মানুষ চাকরি খুঁজে পাচ্ছে না।

আপনারা যদি একটু ভেবে দেখেন তবে দেখবেন যে গত পঞ্চাশ বছরে ভারতে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে এবং একই সঙ্গে নিরক্ষরের সংখ্যাও বেড়েছে। এই দুটোর মধ্যে কিন্তু কোনও বিরোধ নেই। অন্তত এ দেশে তা নেই। আমি আপনাদের কতকগুলি সংখ্যার উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ১৯৫১ সালের কাছাকাছি এ দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল তিরিশ কোটি আর আজ ১৯৯৯ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ কোটির মত। নিরক্ষরের সংখ্যা এত বাড়ার মানে এই নয় যে, সাক্ষরের সংখ্যা বাড়ে নি। সাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে, অনেক বেড়েছে। তাসত্ত্বেও নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে। তেমনই আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প ইত্যাদি বাড়া সত্ত্বেও,

চাকরিপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও বেকারের সংখ্যাও বেড়েছে। এটা ঘটেছে এবং ঘটবে। যারা গ্রামে শিক্ষা পাচ্ছে, সে-সমস্ত ছেলেমেয়ে, বিশেষত ছেলেরা শিক্ষা পাবার পরেই শহরে চ'লে আসছে চাকরির খোঁজে। শহরের এমন ক্ষমতা নেই যে গ্রামের এই বাড়তি ছেলেদের চাকরি দেয়। ফলে কি হচ্ছে, যেহেতু গ্রাম থেকে উচ্চশিক্ষিতরা শহরে চ'লে যাচ্ছে, কাজেই গ্রামে অসুস্থতা থেকে যাচ্ছে। আর যেহেতু শহরে সবাইকে চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না কাজেই শহরে অসুস্থতা তৈরি হচ্ছে। সেখানে গিয়ে, যাদের সমাজবিরোধী বলা হয়, তাদের সংখ্যা বেড়ে চ'লেছে। অসুস্থ শহর এবং অসুস্থ গ্রাম পরস্পরকে আরো অসুস্থ ক'রে তুলেছে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং যা আরও কিছুদিন চলবে ব'লে মনে হচ্ছে, এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতি কঠিন। এই কথা আমি আপনাদের ভাবতে বলছি।

তাহ'লে কী ক'রতে হবে? আমাদের দেশে এসব থাকবে, শিল্প থাকবে, রাষ্ট্র থাকবে। এসব তুলে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। এর সঙ্গে আরও কিছু দরকার। এবং এই আরও কিছুর কথাই রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের মধ্যে বলা হয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন পল্লীসংগঠন। পল্লীসংগঠন ব'লতে জওহর রোজগার যোজনা বা ওই ধরনের কয়েকটা আলাদা-আলাদা প্রকল্প বোঝায় না। পল্লীসংগঠন ব'লতে পল্লীসমাজের একটা আলাদা পুনর্গঠন বোঝায়। গ্রামের লোকেরা সাধারণত পরিশ্রমী হয়। গ্রামে এমন অনেক অভাব আছে যেটা পূরণ করা দরকার। গ্রামে কিছু সম্পদও আছে। গ্রামের বাড়তি শ্রম, সম্পদ এইসব মিলিয়ে মানুষ স্বনির্ভরতার সমবায় ইত্যাদির উপর নির্ভর ক'রে তারা তাদের নিজেদের অভাব নিজেরাই দূর ক'রতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট ভেবে ব'লেছেন, এদেশে অথবা বিদেশে। এদেশের সমস্যার সমাধানের জন্য যদি রাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকি তাহ'লে কাজ হবে না। ঘটনা হ'ল এটাই যে আমরা রাষ্ট্রমুখাপেক্ষী। যা কিছু অভাব, যা কিছু সমস্যা আমরা ধরে নিই রাষ্ট্র তার সমাধান ক'রবে। সেটা হবার নয়। রাষ্ট্র কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার এক প্রতীক। রাষ্ট্রমাধ্যমের ভিতর প্রধান কথা ক্ষমতার সঙ্গে লড়াই। সেই সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্র কিছু ভালো কাজও করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই যখন জড়িয়ে আছে তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে আমলাতন্ত্রও জড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন পল্লীসংগঠন যেখানে মানুষ নিজেদের প্রতি আস্থাবান হয়ে নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে নিজেদের অভাব দূর ক'রতে শিখবে। সেই উদ্দেশ্যে তারা আনন্দের পথ নিজেরা তৈরি ক'রে নিতে পারবে, যে আনন্দ জীবনকে মূল্যবান করে। আর এই কাজ যদি ক'রতে হয় তাহ'লে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত তলার দিকের শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টে দিতে হয়। এমন শিক্ষাব্যবস্থা নয় যে শিক্ষাব্যবস্থার গুণে অথবা দোষে, ছেলেরা শিক্ষা পেলেই চাকরির জন্য শহরে ছোটে। বরং এমন শিক্ষাব্যবস্থা যার গুণে ছেলেমেয়েরা গ্রামের সমাজটাকে নতুন পৃথিবীর যোগ্য ক'রে তুলতে উৎসাহী হয়, উদাসীন নয়। এই কাজ সকলের। এই কাজে যে কেউ অংশ নিতে পারেন। যিনি যতটুকু সাফল্য পাবেন তাতেই তাদের জীবন ধন্য ও জন্ম সার্থক হবে। এই শিক্ষাব্যবস্থার অনুকরণে না চ'লে যদি বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার পথ অনুসরণ ক'রে চলি তাহ'লে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শকে অবজ্ঞা জানানো হবে অথবা আমরা আমাদের জীবনকে সার্থক ক'রতে পারব না।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন

সভাপতির ভাষণ

উপাচার্য দিলীপকুমার সিংহ

আমাদের সামনে অনেক আমন্ত্রিত ব্যক্তি বসে আছেন— যাঁদের অনেকেই এই আলোচনাচক্রে যোগদান ক'রেছেন অথবা ক'রবেন।

এতক্ষণ আমরা অধ্যাপক দত্ত (অম্লান দত্ত)র কাছে শুনলাম। তাঁর বক্তব্য আমাদের আলোচনাচক্রের পরবর্তী বক্তাদের অবশ্যই প্রভাবিত ক'রবে।

শিক্ষাসত্র সম্পর্কে আমি আগেও এর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের সময় কিছু বলেছি, মাঝেও দু-একটা অনুষ্ঠানে কিছু-কিছু বলেছি। যাই হোক আজকের আলোচনাচক্রের যে বিষয়— শিক্ষাসত্রের পঁচিশ বছর পূর্তিতে তা নিয়ে কেউ চিন্তা-ভাবনা ক'রেছিল ব'লে আমার জানা নেই। তবে পঞ্চাশ বা ষাট বছর পূর্তির সময় এসম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল। পঁচিশ বছর পূর্তিতে কেউ ভাবেনি যে, শিক্ষাসত্রের মূল আদর্শ বা লক্ষ্যের থেকে আমরা অনেকখানি সরে গেছি বা নতুন কোনো দিকে গেছি।

বিশ্বভারতী যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নিয়েছে তখন পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র এই দুটি বিদ্যালয় সম্পর্কে কোথায় যেন একটু চিন্তার স্বচ্ছতার অভাব ছিল। যে বিদ্যালয় দিয়ে বিশ্বভারতীর সূচনা সে পাঠভবনই হোক এবং তার দু'দশক পরের শিক্ষাসত্রই হোক— বিদ্যালয়-স্বার্থকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা হয়নি বলে আমার মনে হয়। অধ্যাপক দত্তের কথায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরস্থ বিষয় হিসাবেই চালাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার মধ্যে সম্পূর্ণতার অভাব ছিল। ১৯৫১ সালে পাঠভবনের অধ্যক্ষকে কর্মসমিতির সদস্য করা ছাড়া কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। এই সব কারণেই শিক্ষাসত্র যে আদর্শে তৈরী হয়েছিল তা থেকে আমরা অনেকটা সরে এসেছি। এমনকি পাঠভবন আর শিক্ষাসত্র এই দুই বিদ্যালয়ের লক্ষ্যকে এক ক'রে আমাদের চিন্তাকে অস্বচ্ছ করে তুলেছি।

রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা তাঁর জীবদ্দশায় পরিপূর্ণরূপে অনুসৃত হয়েছে। এমনকি এবিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখাতে এবং সামনাসামনি এল্‌ম্‌হার্স্টের সঙ্গে আলোচনা ক'রেছিলেন। তাই এল্‌ম্‌হার্স্টের সময় পর্যন্ত গ্রামোন্নয়নের এই ভারতীয় মডেল বজায় ছিল। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কারণে সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে তা সম্পূর্ণ প্রাচ্য একটা মৌলিক আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। অথচ রবীন্দ্রনাথের সময়ে অনেক স্থানীয় স্বদেশীর সঙ্গে এল্‌ম্‌হার্স্ট ও অন্যান্য বিদেশীরা থাকলেও বিদেশী কোনও মডেল তাঁরা চালাতে চেষ্টা করেন নি। বরং তাঁরা নিজেদের প্রাপ্ত শিক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রাদর্শকে মিলিয়ে উদ্দেশ্যকে কত সার্থকভাবে পূর্ণতা দান করা যায় তার চেষ্টা করেছেন।

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করার পর রাধাকৃষ্ণন কমিশন বা কোঠারী কমিশনের মধ্য দিয়ে আমরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিযোগিতার দিকে এগোচ্ছি— ভালো বা খারাপ দিকে। কিন্তু কেউ-কেউ মুখে বলছি Elemental Traditionকে রক্ষা করার কথা, কেউ বলছি Elemental Tradition-এর সঙ্গে Higher Education করা উচিত নয়, আবার কেউবা পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রকে Internal ও External এই ভাবনাতে আবদ্ধ ক'রতে চান— অথচ রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শে এর কোনও অবকাশ ছিল না।

আর এই ভাবনা থেকেই শিক্ষাসত্র আর পাঠভবনের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু ক'রে শিক্ষক-অশিক্ষক সকলের মধ্যে এর একটা প্রক্ষেপ দেখা যায়। কেন এটা ঘটবে? এটা ভাবা দরকার যে আমাদের প্রত্যেকের কিছু দাবি থাকতে

পারে, কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সমাধানের রাস্তা খুঁজতে হবে। এইভাবে শিক্ষাসত্র আর পাঠভবনের মাঝে অদৃশ্য দেওয়ালের অবতারণা করা বৃথা। কারণ শিক্ষাসত্রে পড়া আর পাঠভবনে পড়া ছাত্রের মধ্যে মেধার পার্থক্য নয়— আদর্শগত পার্থক্যই প্রধান। এটা যদি না ভাবি তাহ'লে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ থেকে আমরা যে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি তাকে অস্বীকার ক'রতে পারব না।

আবার এই বিদ্যালয় দু'টিকে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্র ক'রে ভাবি সেখানেও কিছু অসংগতি দেখা যায়। Academic-এ Mobility of study ভাবতে গেলে একবাক্যে সমর্থন পাওয়া যায় না। Board of study এক হয় না, Vocational এক হয় না। এইভাবে পার্থক্য ক'রে আমরা কেবল আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছি না — আত্মপ্রবঞ্চনারও শিকার হচ্ছি।

অথচ বিশ্বভারতীতে এসে Centre for Science, Department of Sciences and Technology বা Department of Social Science and Empowerment দেখে দিল্লিবাসীরা মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে স্কুলের সংযুক্তির এই Element Tradition-টাকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। আমাদের Pottery বা Ceramics তাদের কাছে সুন্দর ব'লে মনে হয়েছে, অনেকসময় না দেখেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তাহ'লেও পল্লীসংগঠন বিভাগ, পল্লীশিক্ষাভবন, শিল্পসদন এবং তাদের কেন্দ্রস্থলে শিক্ষাসত্রকে নিয়ে একটা আলাদা চরিত্র আছে। তাই আমরা চাই না শিক্ষাসত্র পাঠভবন হোক। শিক্ষাসত্রের স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাসত্রেই।

এখন চারদিকে যে Self Employment-এর জোয়ার চলেছে, তাতে কি পুরনো ঐতিহ্যের বিচ্যুতি ঘটবে? আবার, প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে Higher Education-এর ক্ষেত্রে Mobility অন্বয় সাধন ক'রবে কি না? আমার কাছে প্রস্তাব এসেছে শ্রীনিকেতন চত্বরে Technical Institution for Women করার। তাই ভেবে দেখার সময় হয়েছে শ্রীনিকেতনের পুরনো আদর্শের নির্যাসের সঙ্গে বর্তমান চিন্তাভাবনার সমন্বয় সাধনের। এই সমন্বয় সাধিত হ'লে আবার আগের মত ভারতবর্ষের তথা সারা পৃথিবীর লোক এখানে আসবে। শ্রীনিকেতন তথা শিক্ষাসত্র তার আপন ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর অবশ্যম্ভাবী অভিমুখকে স্বীকার ক'রে নিয়ে স্বমহিমায় উন্নতই থেকে যাবে — এই আশা নিয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি টানছি।

সভাপতি তৎকালীন উপাচার্য দিলীপকুমার সিংহ মহাশয়ের ভাষণের অনুলিখন।

Some Reflections on the Theme of the Seminar : Relevance of Tagore's Educational Thought and Role of Siksha-Satra in the Next Century.

A. Sensarma
Siksha-Satra, Sriniketan

Respected Vice-Chancellor, chair person, distinguished guests and my colleagues, I have been entrusted with the duty to initiate the discussion of the seminar, for which I think I am totally incompetent because I am a school teacher, teaching mathematics; so, to say something regarding Rabindranath Tagore's thought on education before a galaxy of experts on Tagore may seem to be impertinent to the situation. So I feel a bit shaky to say something but it is a ritual to initiate discussion by some one of the host institution.

I will raise some points which have been haunting me throughout my Siksha-Satra life for more than thirty years and I feel that discussions on these points may lead to clarify 'The Relevance of Tagore's educational thought and role of Siksha-Satra in the next century' which is the theme of the seminar. The points will be raised not to restrict the dimension of discussion of the learned speakers but only to express my personal feeling.

There are two different concepts though slightly related regarding Siksha-Satra. The first one is : Siksha-Satra, the latest model of education conceived, developed and experimented by Tagore, one of the greatest experimentalist in education the world has ever produced. The Siksha-Satra model is the improved version of the 'Brahmacharyasram' model which is Tagore's first model of education. The second or the latest model envelops the first one. So this Siksha-Satra model is the final form of Tagore's model of Education, i.e. it is the final functional form of Tagore's total educational thought. The second one is : the institution Siksha-Satra, where the Siksha-Satra model was experimented by Tagore and which is at present a secondary school under Visva-Bharati. So whether we will discuss the role or relevance of the 'Siksha-Satra Model' in the next century or that of the Institution Siksha-Satra is a point to be debated. I think our academic discussion should get more importance of the former i.e. the role and relevance of the Siksha-Satra model of Education in the next century. If the viability of the model under present day compulsion is established theoretically then it will be the moral duty of Visva-Bharati to revive the experimental character of the institution Siksha-Satra and carry out the experiment methodically to test the viability of the model and the institution Siksha-Satra will have no alternative but to carry out the experiment to maintain its uniqueness which is the sole reason of its survival. If Visva-Bharati whom the Nation has entrusted the moral and legal responsibility to carry out the experiment on Tagore's educational thought to determine its validity is incapable of carrying out the experiment then the Nation will have to find out alternative avenues for its experimentation because if the experimental viability of the reinterpretated version of the model is established then that may transform the national character of education. So I think that the nation will not be so ungrateful to Tagore and it will not be so foolish as to incur such a permanent national loss by allowing the model to sink into oblivion without

testing its viability methodically.

Now to develop conclusive findings on the role and relevance of the Siksha-satra model of Education in the next century at least the following three steps are necessary.

(i) To translate the Siksha-satra model in terms of modern educational parlance.

(ii) To reinterpret the Siksha-Satra model in terms of present day compulsions.

(iii) To carry out methodical experiment in one or more institutions to test the viability of the theoretically reinterpretated version of the model. The present institution Siksha-Satra may serve as a sample.

Now if the experimental findings are positive then the model will be ready for sale to the nation as whole. The first step which has already been done, will be helpful to determine the lacunae of the different components of the original Siksha-Satra model and that will help the second step. The third step is a practical one and totally dependent on the second step, so it will be pertinent if more emphasis is given in the discussion of this seminar to reinterpret the Satra model of education in terms of present day compulsions.

To channelise the discussion to this desired direction different dimensions have to be covered. Some of them are :

(i) Origin of the Siksha-Satra model of Education

(ii) Goal of the model

(iii) Basic conditions of the model

(iv) Psychological base of the model

(v) Support system of the model

(vi) Activities of the model

(vii) Lacunae of the model

(viii) Role of teachers in the model

(ix) Present day compulsions and relevance of the above dimensions under present day compulsions.

(x) Theoretical final form of the model under present day compulsions.

(xi) Immediate minimum changes necessary in the present form of the institution Siksha-Satra to start with experimentation on the final form of the model to test its viability and validity.

Now I will try to raise some points under some of the above mentioned dimensions.

1. Present day compulsions :

(i) With the advancement of technology the scope of employment in organized sectors will be reduced and consequently the number of unemployed persons will gradually increase. This present day compulsion will have to be taken into account to develop any viable educational model for the next century. So any viable educational model should have the necessary components that can develop necessary skills for self employment. Relevance of the Siksha-Satra model in the above light may be a point of discussion.

(ii) Some form of gradation or certification after completion of a course is the present day demand of the society. Again present day gradation system is heavily biased towards cognitive memory but Tagore's goal of education was harmonious development of all the faculties of the child. How Siksha-Satra model can meet this form of present day demand without compromising the basic structure of the model, may be taken as a point for discussion in this seminar because this will help to develop the final form of the model.

2. Origin of the Siksha-Satra Model :

Tagore's Brahmacharyasram model of education originated from the sensitivity of a poet's mind which made him feel the uselessness of the then system of joyless, freedomless, non-creative education. He abandoned his formal system of schooling compelled by that sensitivity alone. Tagore wrote that. "It may be that if I had been little less sensitive, I could gradually have accommodated myself to the pressure and survived long enough to earn my University degrees". That sensitivity also compelled the poet to nurture the feeling for about forty years and the final outcome was the 'Brahmacharyasram' experiment at Santiniketan in 1901/with not more than ten boys including his son, to impart an ideal education he cherished. This model may be termed as the 'Santiniketan model' of education. His aversion towards the then system of education was so strong that he adanboned his own formal schooling as a protest and his commitment to his own model was so high that he included his son as one of the samples in the experiment. In the passage of time there cropped up various obstacles which curtailed his freedom of experiment. So to get back the unrestricted freedom of experiment he established another school, Siksha-Satra on 1st July 1924, with six poor village boys as sample and continued the experiment still his death in 1941. This model may be termed as the 'Siksha-Satra' model. This was Tagore's latest model of education. It was the improvement over the Santiniketan model in some dimensions such as (a) Santiniketan experiment was 'outrageously new being the product of daring inexperience' but the Siksha-Satra model was the product of the experience of experimentation on education for long twenty three years (b) a new dimension – 'active vigore of work' was added as a means to reach the goal, which was absent in the Santiniketan model.

This history about the origin of the Siksha-Satra model has been elaborated to initiate debate on a point. There is a view that the Siksha-Satra model was meant for education of village children and the Santiniketan model was meant for that of urban children. I think this is a misconcept. It has already been indicated that the Siksha-satra model was the final form of Tagore's model of education. My conclusion is that the Siksha-Satra model is a model of general education, it may be equally applied for village and town children if the boundary conditions of the model are satisfied. I will place five points in support of my conclusion and genesis of debate.

(i) **First** : Tagore's goal of education was harmonious development of all the faculties of children. Is the goal different for village and town children? Tagore never recommended any diluted version of education for village children. So the goal of education in Tagore's model is the same for village and town children.

(ii) **Second** : Some of the psychological bases of Tagore's Siksha-Satra model of education are :

(a) Organic wholeness of human individuality

(b) Education of subconscious mind helps to educate conscious mind.

(c) Freedom is indispensable for growth.

(d) Joyless childhood cannot be a source of joy to others in future.

(e) Mind activity engaged in constructive and creative works develops energies which seek eager outlet in pursuit of knowledge.

(f) Children's early period of education should be through natural process-directly through person and things.

(g) Between the age of six and twelve, the growing child is most absorbed in gathering impression through sight, smell, hearing and taste, but more especially through the use of the hands.

These and other psychological principles were the bases for selection of activities to reach the goal. These principles are equally applicable to and cannot be different for village and town children. So the goal of education and the bases on which the means were chosen to reach the goal in the Siksha-Satra model are not different for village and town children.

(iii) **Third** : It is a fact that experiment on the Siksha-Satra model was started with six village children as sample. The sample of Santiniketan experiment was incidental and failure of the experiment with incidental sample helped Tagore to opt for purposive sample in his Siksha-Satra model, with the assumption that it might give him unrestricted freedom of experiment and there would be no impediment to test the viability of his model within the shortest possible time. It does not imply that this model will not be viable for urban children. Sweeping generalization about population from incidental or purposive sample is a gross violation of statistical sampling theory.

(iv) **Fourth** :

(a) Elmhirst embodied his ideas regarding Siksha-Satra in a paper 'Siksha-Satra a Home School for Orphans' which was published in Visva-Bharati Quarterly in 1924, that is a few month after the inception of Siksha-Satra. It was the earliest record in writing of ideas that were responsible for foundation of Siksha-Satra. It may be noted orphans do not imply village children alone.

(b) Again in the annual report of 1925, S.C. Majumder, the first incharge of Siksha-Satra, defined the aim of Siksha-Satra to be 'pioneering primary and secondary education in view of modern psychology and methodology and modern life conditions'. This also indicates a general model of education for all children irrespective of village and town.

On 12th May 1926, S.C. Majumder submitted an account of his work and experiences of nearly two years' duration. He named it : 'The Siksha-Satra, an Experiment in village education. I would request the learned audience to note the contradiction.

(c) The ideas of Tagore regarding Siksha-Satra were incorporated by him in his paper 'A poet's School'. This paper was published in Visva-Bharati Bulletin No. 9 issued in 1928.

Taking all these facts into account S.C. Sarkar, an eminent educationist, formerly Adhyapaka of Education, Vinaya-Bhavana and once incharge of Siksha-Satra observed, "Was it (Siksha-Satra) an experiment concerned with education in general no matter whether the students come from towns and villages or with village education as described by S.C. Majumdar? There is nothing in Gurudev's A Poet's School or in Elmhirt's paper that might support the latter view of the experiment. Gurudev clearly indicated that Siksha-Satra was a continuation of Santiniketan experiment and Elmhirst draws all his conclusions from the most universal principle of education. In choosing the occupations of the boys, however, Elmhirst takes into consideration their rural environment. This is as it should be. The boys came from rural areas and they were expected to go back to their villages, hence the wisest thing the teacher could do would be to encourage them to educate themself through occupations already familiar to them. But no matter what the means were, the end was general education. It is possible that S.C. Majumdar used the term loosely just to indicate that most of the students of Siksha-Satra hailed from villages. But this unfortunate phrase caused much misunderstanding in later year". So Siksha-Satra was not born with rural bias but later for unknown reason it was coloured with it.

(v) **Fifth** : Again regarding Siksha-Satra Tagore wrote : "There I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education. Before long, the village school will be real school, the ideal school and the other will be neglected". So will it be very wise to conclude that Tagore introduced perfect education in his latest model for village children only? Then where is the model of perfect education for urban children in Tagore's total educational scheme? The first experiment had already failed to produce desirable results. So, if we accept that the Siksha-Satra model was exclusively meant for village children then we are to accept that Tagore's educational model is not general enough that can be applied on all children. We are to accept also that Tagore invested his old-age energy, hard earned money, valuable time to develop a truncated model of education for village children only. Are we ready to do Tagore such injustice?

I have spent so much time on this point because this point deserves special consideration from the learned speakers. A definite conclusion regarding the range of validity of the Siksha-Satra model in the next century should be reached in this seminar because this will directly influence other components of the model and its reinterpretation.

3. Goal and Activities of the Siksha-Satra Model :

Gurudev's goal of education was complete man-hood or harmonious and fullest development of all human faculties. Modern educationists have divided the total human faculty into three domains for economy of thought. These are cognitive domain, affective domain and psycho-motor domain but Tagore introduced two more domains : the subconscious domain and spiritual

domain; and advocated balanced integration of all these domains. Tagore wrote : "Children have their active subconscious mind which like tree has power to draw food from the surrounding atmosphere. For them the atmosphere is a great deal more important than rules and materials, equipment, text book and lessons." Tagore used education of the subconscious domain as a means to education of the conscious domain. For this he attached great importance on the natural environment and close contact with teachers in his scheme of education which he assumed as the main source of education of the subconscious domain.

Again if joy is the ultimate goal of life and education is the means to attain the goal then the source of eternal joy, which is known as divinity within a man and its manifestation may be termed spirituality, so the education for spirituality cannot be ignored for theoretical completeness of an educational model at least in Indian context. Whether the two new concepts; education of the subconscious mind and education for spirituality are still valid in the present day context is a point that may be considered by the learned speakers

The five domains mentioned above are interrelated if we respect the concept of organic wholeness of human individuality. Tagore prescribed a set of activities with the assumption that if children are processed through these activities the product will be a balanced development of all these five domains and consequently it will facilitate the attainment of complete manhood, where the originality of Tagore lies. A particular educational activity may cover the development of more than one domain at a time. Now if we want to put the model into methodical experimentation then the total activities as proposed by Tagore, after necessary addition and alternation under present day compulnons, have to be separated domain-wise and sequenced in order of their usefulness, depending on their degree of loading for a particular domain. This work is absolutely necessary to make the model operational. So this may be taken as a part of discussion in this seminar. Again relevance of the present day demarcation of total school activities as curricular, co-curricular and extra-curricular in Tagore's model may also be taken up as a point of discussion.

4. Teacher :

Gurudev viewed the teacher as 'Guru' as a life long student. The teacher must have a child in him and students will learn from close contact with him and from the conduct of the teachers as well. Whether this concept of teacher is compatible with the present situation where we are talking about teacher's accountability, teaching as profession, also deserves special attention of the speakers of this seminar.

5. Miscellaneous :

Discussions are also needed in the light of present day compulsions regarding residential character of the experimenting institution, place of craft subjects, feasibility of correlational teaching of other subjects with one or two occupations in the centre, nature of freedom, which were at the heart of the original Siksha-Satra model. Specifications of teachers-student ratio, age of admission, duration of study were absent in the original Siksha-Satra model, so these points should also be touched to develop a perfect theoretical model.

There are many other points that deserve attention of the speakers. These have been left out because that may lengthen my speech, and also because some points are beyond my comprehension. I will again humbly repeat that the points mentioned above may be viewed as embodiment of my feelings but these have not been raised to restrict the dimension of discussion of the speakers who are well known authorities on Tagore education.

I conclude my initiation speech with the hope that after two days of seminar a Siksha-Satra model of education that will be theoretically viable under present day compulsions without compromising the basic features of the original model, will be developed and that will be ready for experimentation. Some concrete suggestions from the speakers are also expected regarding minimum infrastructural changes required for the present form of institution Siksha-Satra to make itself ready to start with the methodical experimention to test the viability of the developed model.

শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ : চিন্তা ও কর্ম

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাঙ্‌লা বিভাগ, বিশ্বভারতী

অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কথায় আসতে হবে। দুটি অভিজ্ঞতা তাঁকে শিক্ষাচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এবং এই দুটি অভিজ্ঞতাই খুব তিক্ত। তার আগে তাঁরই একটি উক্তি স্মরণ করব— বলছেন, আমাদের দেশে যত সমস্যা আছে, নানাবিধ সমস্যা, তার অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হতে পারে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। স্বাস্থ্য, নানারকম কুসংস্কার এমনকি কিছুটা অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধানের পথ পেতে পারি যদি আমরা আনতে পারি শিক্ষার আলো, যদি দেশকে শিক্ষিত করতে পারি।— এই ছোট্ট কথাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন এটা বোঝা যায়। এমন শিক্ষা, যা জীবনের বিবিধ দিককে স্পর্শ করে, নানান সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারে এবং আমরা যার সুফল পাই জীবনের নানান স্তরে। স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে কত ব্যাপক কত গভীর করে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই ভাবনাটা গড়ে উঠেছে ক্রমশ এবং এই ভাবনা গড়ে ওঠার পিছনে তাঁর দুটি অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। একটি খুব ছেলেবেলাকার অভিজ্ঞতা, আর একটি একটু বড় বয়সের। আমরা জানি, তিনি বালক বয়সে স্কুলে গিয়েছিলেন। তাঁকে দুটি স্কুলে পাঠানো হয়েছিল পর পর। এবং সেই দুটি স্কুলে তিনি বেশীদিন থাকতে পারেননি। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ি চলে এসেছিলেন। এমন নয় যে বালক রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলেন কী ত্রুটি ছিল ঐ বিদ্যালয়গুলিতে। কিন্তু তাঁর অতিসংবেদনশীল মন অনুভব করেছে গভীর কোনো গলদের অস্তিত্ব। ভালো লাগেনি। তাই পালিয়ে এসেছেন। এই শিক্ষার ত্রুটিগুলিকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন অনেক পরে, যখন তাঁর বয়স হয়েছে। তিক্ত হলেও অভিজ্ঞতাটি কিন্তু খুব মূল্যবান। ছেলেবেলায় হয়ত বুঝতে পেরেছেন যে পরিবেশটা ভালো নয়, নিষ্প্রাণ, যান্ত্রিক, নীরস এবং হয়তো খারাপ লেগেছে শিক্ষক-ছাত্রের অবাঞ্ছিত সম্বন্ধ। হয়তো খারাপ লেগেছে পাঠ্যবিষয়ের নীরসতা। কিছুই স্পষ্ট করে বলেননি, কিন্তু পালিয়ে এসেছেন। অনেক পরে, আপনারা সবাই জানেন, এই যেখান থেকে পালালেন সেই বিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। খুব তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ 'জেলখানা'। কোন্ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ঐ ব্যবস্থাকে দেখেছেন, ঐ ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পেয়েছে এমন বিদ্যালয়কে দেখেছেন— তা এই শব্দ-প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত করব আর একটি অভিজ্ঞতা। তাঁর পরবর্তী বয়সের। তাঁকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন পিতৃদেব। তিনি পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে আবার পাঠালেন তাঁর পিতৃদেব যখন তাঁর যৌবন পূর্ববঙ্গে জমিদারি পরিচালনার কাজে, শিলাইদহ পতিসর অঞ্চলে পদ্মাতীরে। সেখানে গিয়ে দেখলেন আর-এক মর্মান্তিক দৃশ্য। আমাদের দেশ তো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'গ্রামে গাঁথা দেশ'। আমাদের দিল্লি, কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ এগুলি বস্তুত আজও আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমাদের দেশের প্রতিনিধি হচ্ছে আমাদের গ্রামগুলি। এই 'গ্রামে গাঁথা দেশ'-কে তিনি দেখলেন প্রথম শিলাইদহে গিয়ে। এবং দেখলেন সমস্ত দেশটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সন্ধের পরই সমস্ত গ্রাম অন্ধকারে এবং এর চেয়ে আরও বড়ো যে অন্ধকার দেখলেন সে হল অজ্ঞানের অন্ধকার। সমস্ত গ্রাম অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এই ভয়াবহ বিভীষিকা তাঁর দ্বিতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা। এই দুটি অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর শিক্ষাচিন্তার পথে সাহায্য করেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। যখন তিনি পরিণত বয়সে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতন এলেন ১৯০১ সালে এবং স্কুলপালানো ছেলে যখন স্কুল গড়লেন তখন কিভাবে গড়বেন এই চিন্তাটার আগে ভাবতে হয়েছে কিভাবে গড়বেন না। কী হবে না সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল। এবং সেই ভাবনাটির অনুসরণ করলে আমাকে বলতে হবে, তিনি তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে-শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে চলছিল (আমি এখন বলব— চলছিল নয়, এখনও চলছে— এ আমাদের চরম দুর্ভাগ্য) সেই ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা— কলোনিয়ল্ সিস্টেম অফ্ এডুকেশন্ মানুষকে মানুষ করার জন্যে আদৌ আগ্রহী নয়।

সে শিক্ষা একটা শাসনযন্ত্রকে চালাবার জন্য কিছু কেজো লোক তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত। হয়ত এরই মধ্যে, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অনেক বড়ো পণ্ডিতকে আমরা পেয়েছি, বিজ্ঞানীকে পেয়েছি, দার্শনিককে পেয়েছি। কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম। এবং ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। সাধারণ শিক্ষিত মানুষ শুধু সাহায্য করেছে শাসনযন্ত্রকে। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করেই বলছি, তিনি বলছেন— শিক্ষায়তন থেকে বেরোয় যারা তারা শিক্ষিত মানুষ নয়, তারা অধিকাংশই Qualified Candidates। রবীন্দ্রনাথের শব্দই ব্যবহার করলাম 'Qualified Candidates'। ক্ষোভের সঙ্গে বলছি, আজও স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরেও জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন ঘটেনি, যা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই। ফলত ব্রিটিশের প্রবর্তিত দুর্বল, অসম্পূর্ণ, পঙ্গু একটা শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরেও চলছে এবং চলবে যদি আমরা সচেতন না হই এবং বড়োরকম ধাক্কা না খাই। কিন্তু ধাক্কা আমরা খাচ্ছি, কেননা আগে অন্তত যারা পাশ করে বেরোতেন— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'Qualified Candidates' তাঁদের কিছু পথ ছিল। অধ্যাপনা করতেন, শিক্ষকতা করতেন, বিজ্ঞানাগারে কাজ করতেন, নানান সরকারী কাজের সঙ্গে যুক্ত হতেন। এখন ক্রমশ দরজাগুলি বন্ধ হচ্ছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে আমরা দেখব প্রায় সব দরজাই বন্ধ। এখন সে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে। আমি জানি এখান থেকে বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরে যারা অধ্যাপনা বা শিক্ষকতা করতে চান, তাঁদের নামের তালিকা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না। এ অবস্থাটা ক্রমশ বাড়বে এবং দরজাগুলি একে-একে বন্ধ হবে। এই যে আজকে আমাদের দেশ থেকে বহু ভালো ছাত্র বাইরে চলে যাচ্ছেন তার একটা বড়ো কারণ কিন্তু এই। দরজাটা বন্ধ হবেই এটা জানা কথা।

রবীন্দ্রনাথ এই পঙ্গু এবং অসম্পূর্ণ ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রতিবাদ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলেন এই শান্তিনিকেতনে ১৯০১ সালে একটি ছোট বিদ্যায়তন শহর থেকে দূরে। আয়োজন আপাতদৃষ্টিতে খুবই সামান্য। গোটা ছয় সাত ছাত্র এবং প্রায় পাঁচ-ছয়জন অধ্যাপক। অনুপাত প্রায় ১:১। বিশেষ লক্ষণীয় এই শহর থেকে দূরে আসার ব্যাপারটা। এই দূরত্ব খুব ভেবেচিন্তেই রাখা। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের কিছু জায়গা ছিল, যেখানে তিনি অনায়াসে একটা স্কুল করতে পারতেন। এবং কোনও-কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সেই পরামর্শ দিয়েছিলেন ১৯০১ সালের আগে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানেই এলেন কলকাতা শহর থেকে দূরে গ্রামের মধ্যে। তাঁর গ্রামে-গাঁথা দেশের একেবারে অভ্যন্তরে। এবং শুরু করলেন নতুন পরীক্ষা সেটা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ। তিনি Qualified Candidates তৈরি করতে চান নি। তিনি চেয়েছেন মানুষ করতে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে যেখানে উন্মুক্ত বিরাট প্রকৃতির মধ্যে শিক্ষক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জ্ঞানের চর্চা হবে এবং সেই জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মুক্ত মনের অধিকারী করে তুলবে। তারা জীবনকে দেখবে একটা পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ, মুক্ত মন নিয়ে। এবং উত্তরকালের জীবনের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতের জন্যে তৈরি থাকবে। রবীন্দ্রনাথ যেটা প্রথম চেয়েছেন তাঁর শিক্ষায়তনে সেটা আজকের ভাবনার বিপরীত। তিনি চেয়েছেন 'সহযোগিতার সুস্থ নীতি' আজকে প্রতিযোগিতার অসুস্থ নীতিরই প্রাধান্য। সকলে মিলে জ্ঞানের সাধনা চলবে এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে গড়ে উঠবে এক সুস্থ সম্বন্ধ। এর সঙ্গে আরও একটি জিনিস উল্লেখ্য। শিক্ষালয়ের পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য তিনি চেয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের স্বায়ত্তশাসন এবং তার প্রবর্তনও ঘটেছিল। ১৯০২ সাল থেকে আশ্রমের সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে জড়িত থাকার ফলে দ্বিধাহীনভাবেই বলতে পারি সে প্রবর্তন ছিল ষোলো-আনা সফল ও সার্থক। ছাত্রদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তখন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটেছে। সেই স্বাধীনতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণী শক্তি হিসাবে কাজ করেছে তাদের অপরিসীম দায়িত্ববোধ। প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের জন্য ছিল একটি শ্রদ্ধার আসন। প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের দেওয়া সেই শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের বলেই ছাত্রেরা তার উপযুক্ত হয়ে ওঠার সাধনা করেছে। তাঁর আস্থা-স্থাপনের যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মূলনীতিগুলি যদি খুব অল্প কথায় বলা যায় তবে তা হচ্ছে— এক, প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। একটা

সময় বলা হ'ত যে রবীন্দ্রনাথ কবি মানুষ। তাই তিনি এত বেশী প্রকৃতির কথা বলছেন। আজকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা নিছক কবিত্ব নয়, অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বাস্তবজ্ঞান. আজকে আমরা প্রকৃতি নিধন করতে-করতে যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে সমস্ত বিশ্বের বিষ মানবজীবনকে মৃত্যুর সামনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে গিয়ে মানুষ আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে। কাজেই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বেশী দরকার (নব্য সভ্যতার যুগেই বিশেষভাবে) প্রকৃতি-চেতনা। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রকৃতি-মনস্কতাকে ছাত্রজীবন থেকেই অন্তরের মধ্যে আনবার চেষ্টা করেছেন, এই প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড় সংসর্গে।

দ্বিতীয়, ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধ। শিক্ষক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটা ছিল এইরকম যে শিক্ষক ছাত্রের সঙ্গী হবেন, নিজেও ছাত্র হবেন, জ্ঞান অর্জন করতে থাকবেন, এবং ছাত্রকে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করবেন Spoon-feeding নয়, বিদ্যাদানের চেয়ে অনুপ্রাণিত করাই বড়ো কাজ হবে তাঁর, তিনি হবেন অনুপ্রেরণার উৎস। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। এবং আমরা জানি এটা শুধু স্বপ্ন ছিল না, তার বাস্তব রূপায়ণও ঘটেছিল। তাঁর আমলের জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ স্যান্যাল, নন্দলাল বসু, তেজেশচন্দ্র সেন এঁরা ছাত্রদের হাতে-কলমে পাঠ দিয়েছেন যত, অনুপ্রাণিত করেছেন তার চেয়ে বেশী। তাতে ছাত্রদের লাভ হয়েছে বেশী। বিশাল গ্রন্থাগার আছে, অজস্র বই আছে, দেশবিদেশের ছাত্ররা পড়ুক। ক্লাস রয়েছে। পাঠ্যবই তো পড়তেই হবে। কিন্তু অনুপ্রেরণা চাই। সেটা শূন্য হয়ে গেলে শিক্ষাজীবন বিপন্ন হয়। আর সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হচ্ছে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমার মনে পড়ছে অবনবাবু একবার বলেছিলেন আমি মাত্র একটি বই পড়ি এবং সারাজীবন পড়ছি এবং পড়ব। তার মাত্র দুটি পাতা, একটি পাতা সবুজ, অন্য পাতাটি নীল। এই বই-এর কাছাকাছি আনার চেষ্টা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। শিক্ষক যে কাজ করবেন তা হল দৌত্যের কাজ। এই বৃহৎ জীবনের গ্রন্থ এবং অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ— এর মাঝখানে খানিকটা দৌত্যের ভূমিকা শিক্ষকের। এটাই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। এবং তাঁর নিজেরও যে ক্লাস নেওয়ার ধরন, আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, তাতে অনুপ্রেরণা ছিল বেশী। তথাকথিত বিদ্যাদান ছিল কম। অনুপ্রাণিত ছাত্রেরা নিজেরাই সন্ধান করত এবং তা হত অনেক বেশি ফলপ্রসূ।

তৃতীয় অভিপ্রায়, পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা এবং সেই পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করার জন্য মানুষের যে বৃত্তিগুলি সেগুলিকে মার্জিত করা ও ঋদ্ধ করা নানান বিদ্যাচর্চার মধ্যে দিয়ে। 'জীবনস্মৃতি'তে পাই নানা বিদ্যার আয়োজন প্রসঙ্গ। বাঙলা, ইংরেজী, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল এসব তো ছিলই। তার সঙ্গে ছিল ছবি আঁকা, গানের চর্চা। যদুভট্ট আসতেন গান শেখাতে। এবং এরই সঙ্গে কুস্তির আখড়াও ছিল। পাঞ্জাবী পালোয়ান তাঁকে কুস্তি শেখাতেন। আমি বলব রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা অনেকটাই মহর্ষির শিক্ষাচিন্তার পথ ধরে এসেছে। তিনিও তাঁর শান্তিনিকেতন-আশ্রমের মধ্যে ঐ নানাবিদ্যার চর্চা করতে চেয়েছিলেন। ছেলেরা লেখাপড়া করবে, ছবি আঁকবে, গান গাইবে, নাচবে, হাতের কাজ করবে। হাতের কাজকে কখনই অসম্মানজনক মনে করবে না। কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ এগুলিও শিক্ষণীয়।

এর মানে এই নয় যে, ছাত্রটি 'Jack of all trades' এবং 'Master of none' হয়ে উঠবে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সে তার নিজের পথ বেছে নিলেও আরও পাঁচ বিষয়ে উৎসাহী হবে। তার কান তৈরি হবে, তার চোখ তৈরি হবে, তার হাত তৈরি হবে, তার রুচি তৈরি হবে। সে একটি পরিশীলিত মানুষ হবে। এবং খুব জোর দিয়ে বলছি, তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা যাঁরা বাইরে যেতেন তাঁরা সম্মান পেতেন এই সামগ্রিক বোধের জন্য। এখানে বিদ্যার্জন করে নিজেকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। নামাবলীতে না গিয়েও এখানকার সৃষ্টির খানিকটা নমুনা দেবার চেষ্টা করছি। তখনকার দিনের ভারতবর্ষের নানা প্রতিষ্ঠানে এবং বিদেশেও আদৃত হয়েছেন এখানকার ছাত্রেরা। শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের অধিকাংশই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেছেন এখানকার শিল্পীরা। আমাদের

ছাত্রেরা গিয়ে অধ্যাপনা করেছেন, অধ্যক্ষতা করেছেন। সৃজনমূলক বিচিত্র কর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যশস্বী হয়েছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনীরা।

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্রেরা হবেন সচেতন, সক্রিয়, সামাজিক। দুটি গুণের উপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। একটি হচ্ছে মনের সচেতনতা, আর দুই, মনের সংবেদনশীলতা। যথার্থ শিক্ষিতের এ দুটি প্রধান গুণ। এ গুণের অধিকারী যিনি তিনি আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থসর্বস্ব হতে পারেন না। তিনি উদার, উপচিকীর্ষু। এমন নাগরিক শুধু দেশের সম্পদ নন, মানবসমাজের ঐশ্বর্য। 'ঔদাসীন্যের জড়তা' থেকে মুক্ত, সংবেদনশীল মানুষ তৈরিই রাবীন্দ্রিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বভারতী শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ-অভীপ্সিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ। যার প্রথম লক্ষ্য প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সার্থক বিনিময়। তাঁর ভাষায় : "where the East would try to offer its best to the West and receive what is best from the West"। এটিই শিক্ষাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা নয়। শিক্ষাচিন্তার সর্বশেষ কথা তিনি উচ্চারণ করেছেন বিশ্বভারতী প্রসঙ্গেই : 'বিশ্বভারতী— 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' অর্থাৎ এই তাঁর বিশ্বভারতী যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষ একটি ছোট্ট নীড়ে এসে মিলিত হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-দেশ-রাষ্ট্র-নির্বিশেষে মানুষকে মানুষের কাছে আনার স্বপ্ন দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদা কৈশোরে তিনি অন্তরের গূঢ়লোক থেকে উচ্চারণ করেছিলেন :

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'

এই একই সুর আমরা শুনেছি তাঁর প্রবীণতার প্রান্তে উচ্চারিত বাণীতে :

'আমি পৃথিবীর কবি
যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে
সাড়া তাঁর জাগিবে তখনি।'

কোনও সংকীর্ণ ভূখণ্ড নয়, কোনও খণ্ডিত সমাজ নয়, সমগ্র বিশ্বই রবীন্দ্রনাথের আবাস, সমস্ত মানুষ তাঁর আত্মার আত্মীয়। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল কথা, মূল উদ্দিষ্ট মানুষকে মানুষের কাছে আনা। শিক্ষা তারই উপায়, সেই মানস-স্বর্গের সোপান। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-দেশ-রাষ্ট্র-নির্বিশেষে মানুষকে মানুষের কাছে আনাই রবীন্দ্রনাথের সর্বোচ্চ আশা। তাঁর বিশ্বভারতী সেই মহামিলনের পুণ্যভূমি। সেই মানবমৈত্রীর মহাতীর্থ। রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ বস্তুত মানবমৈত্রীর তীর্থক্ষেত্র। শিক্ষাবিদ্, শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী স্বপ্ন ও সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য এই বিশ্বমানবমৈত্রীর প্রতিষ্ঠা। তাঁর জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের সুকঠিন তপস্যায় অর্জিত বিশ্বভারতী সেই অসামান্য স্বপ্নের, অসামান্য সাধনার সার্থক সিদ্ধির মূর্তি। শিক্ষার আদর্শকে, সাধনাকে এমন উচ্চগ্রামে বিশ্বের আর কোনও শিক্ষাবিদ বেঁধেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। আমরা শুধু জানি সমকালীন বিশ্বের সমপ্রাণ কিছু বিরল মনীষী— রোম্যাঁ রলাঁর কিংবা আইনস্টাইনের মতো মানুষ শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথকে কী অপরিসীম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন! আমরা শুধু জানি বিশ্বের নানান দেশের শান্তিকামী অগণিত মানুষ কী গভীর অনুরাগে, বিস্মিত আনন্দে অভিনন্দিত করেছেন এই মানবপ্রেমিককে, যিনি সমগ্র জীবন মানবমৈত্রীর জন্য নিবেদন করেছেন নিজেকে। শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ সেই রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিশেষ প্রকাশ।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন।

রবীন্দ্রনাথ : 'শিক্ষাসত্র' - জিজ্ঞাসা

ডঃ তরুণ মজুমদার
প্রাক্তন অধ্যাপক শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

এক

রবীন্দ্রশিক্ষাভাবনার সন্ধিসূত্র

আটদশকব্যাপ্ত রবীন্দ্রজীবনের শেষ চারটি দশক শিক্ষা-সাধনার এক সৃজনশীল অধ্যায়কে তুলে ধরে। এ এক নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসের অনন্যতায় শিক্ষার নবদিগন্ত উন্মোচনের ইতিহাস। বিশ শতকের ঊষালগ্নে এর প্রথম সূচনা শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের বীজাকারে। এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা, ভাবী কর্মপ্রয়াসের উৎস নিহিত ছিল যা থেকে এক ক্রমসম্পুষ্ট শিক্ষাধারার বহু বিচিত্র উৎসার ঘটেছিল। প্রাচীন ভারতীয় জীবন-দর্শন ও শিক্ষার ঐতিহ্য, রবীন্দ্র-মনন ও অনুধ্যানের গভীরতায় যে সঞ্জীবিত নবীকৃত ব্যঞ্জনা লাভ করে তার মধ্য থেকেই গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রশিক্ষার রূপকল্প। শিক্ষা ও বিদ্যার মধ্যে, জীবন ও শিক্ষার মধ্যে, তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছেদ-বিরোধের অসার্থকতায় বিড়ম্বিত সমকালীন শিক্ষা তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত ও বিচলিত করেছিল। এই ঐকান্তিক বেদনাই তাঁর কবি-সত্তাকে বিদীর্ণ ক'রে শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাস ঘটিয়েছিল। প্রচলিত অমানবিক শিক্ষার অপরিমেয় অপচয় তাঁর কাছে অসহনীয় মনে হয়েছিল। বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের মতই 'সঃ তপস্তপ্ত্বা সর্বম্ অসৃজৎ'— কবিচিত্ত এক নবজগৎ সৃষ্টির রূপকার হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রশিক্ষাকৃতির সম্প্রকলা তাঁর কবি-কল্পনা, দর্শন-ভাবনা, ঐতিহ্য-চেতনা ও মানবিক উপলব্ধির মেলবন্ধন ঘটেছিল। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পূর্ণোদ্ভাস তাঁর শিল্প-কর্মের বহু বিচিত্র সৃজন প্রকাশে আর নান্দনিক সুষমার অনুপম বিকাশে। উনিশ শ' এক থেকে উনিশ শ' একচল্লিশ— এই সময়কাল জুড়ে তাঁর ঋষি-কল্প তপোসাধনায় তিল তিল ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল যে শিক্ষা-প্রতিমা ইতিহাসে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। এর মূল্য-মহিমা বিশেষ দেশ-কালের সীমাকে ছাড়িয়ে চিরন্তনত্ব ও সার্বজনীনত্বের দাবিদার। এর মূলে কোনও নিছক তাৎক্ষণিক চাহিদা পূরণের তাগিদ কাজ করে নি। এটিকে ঘিরে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-শিক্ষা-সংস্কৃতির সনাতন সত্যের পুনঃপ্রকাশের ও পুনরুজ্জীবনের যুগবার্তা উচ্চারিত হয়েছিল। এর মধ্যে ভারত ও বিশ্ববার্তার সঙ্গম রচিত হয়েছিল।

এই বার্তা হ'ল প্রাচীন ভারত-ঋষিদের অন্তরোপলব্ধিজাত চিরন্তন সত্যের মন্ত্রোচ্চারণ 'উপনিষদ' যার উদ্‌ঘোষণ। এ যুগের কবি উপনিষদের আলোয় অবগাহন ক'রে সেই শাশ্বত পরম মন্ত্রস্পর্শে রোমাঞ্চিত হন, সত্যদর্শনের দুশ্চর তপস্যায় উজ্জীবিত হন। আধুনিক ঋষি-কবির গোটা জীবনটাই যেন রূপান্তরিত হয় সত্য-সন্ধান ও প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞে। কবিসত্তার গভীর থেকে বেরিয়ে এলেন কর্মসাধক রবীন্দনাথ—এ যুগের নব-বিশ্বকর্মা। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা সত্যসন্ধানী পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছিল, শিক্ষা ও জীবনের সমস্ত বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দিয়েছিল। প্রাচীন তপোবন-শিক্ষা, আশ্রম-শিক্ষার গৌরব-মহিমা ও সার্থকতা তাঁকে স্বতঃই অভিভূত, বিস্ময়-বিমুগ্ধ করেছিল। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'— এই প্রাচীন শিক্ষামন্ত্র তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাধাবন্ধনহীন প্রকৃতির অবারিত স্বতোচ্ছল আনন্দমুখর শান্ত স্বাধীন পরিবেশে যুক্ত হয়েই তো নন্দিত জীবনের পূর্ণাস্বাদন লাভ করা সম্ভব—আশ্রম-তপোবন জীবনশিক্ষা যার জীবন্ত নিদর্শন। এই আদর্শকে অনুসরণ ক'রে রবীন্দ্র-শিল্প-প্রতিভার অনন্য যাদুস্পর্শে রচিত হ'ল

শিক্ষার নব-ইন্দ্রপ্রস্থ : শান্তিনিকেতন। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গুটিপোকাকে উদ্ভিন্ন করে ধীরে-ধীরে প্রকাশিত হ'ল রবীন্দ্র-শিক্ষাভাবনারঞ্জিত বর্ণদ্যুতিময় এক পূর্ণ প্রজাপতি।

রবীন্দ্র-শিক্ষাভাবনার স্বর্ণসূত্র গ্রথিত হ'ল মানবপ্রকৃতি, নিসর্গপ্রকৃতি, আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ এবং সমাজচেতনার সমন্বয়ে। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শের চিরায়ত ঐতিহ্যের যুগোপযোগী নবায়নই তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্য। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনেই এর সার্থকতা। জাতীয়জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিদেশী শাসকের প্রবর্তিত পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শিক্ষার সঠিক বিকল্প জাতীয় শিক্ষার ধ্রুবপথ নির্দেশ এর মধ্যেই সন্নিহিত করেন। জাতীয় জীবনের মর্মমূল থেকে উৎসারিত শিক্ষাকে সর্বমানবিক বিশ্বজনীনতার ব্যাপকতা দান করেন রবীন্দ্রনাথ। ভারতীয় জীবনসাধনার মধ্যে তিনি বিশ্বমানবতাকে অনুভব করেন। তাঁর অনুপম কল্পনা ও সৃজনশক্তির সাবলীলতায় বিশ্ববিদ্যা ও লোকবিদ্যার যুগপৎ সাধনকেন্দ্র গড়ে ওঠে। আকাশ-মাটির এই মেলবন্ধন শিক্ষা-ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব নিঃশব্দ বিপ্লবের পরিচায়ক যা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐহিক অবদানকে স্বীকার করে কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক যান্ত্রিকতা, বাহ্যিক কৃত্রিমতা ও সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে। সৃজনশীলতা স্বাধীনতা, প্রকৃতির বাধাবন্ধহীনতা আর আত্মিক আনন্দকে অনুস্যূত ক'রে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল একদিকে বিশ্বভারতী আর অন্যদিকে শ্রীনিকেতন— শিক্ষাসত্র। একদিকে বিশ্বাকাশ আর অপরদিকে দেশমৃত্তিকা মিলেমিশে রূপমূর্তি লাভ করল ভারত-ভাবনা-নন্দিত নব শিক্ষাপ্রতিমা।

দুই

শিক্ষাসত্র : উৎস ও গতিধারা

অধুনা বাংলাদেশের পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ রবীন্দ্রমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জমিদারির কর্মসূত্রে তিনি গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দিগন্তবিসারী অবারিত নিসর্গপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যমহিমা যেমন কবিচিত্তকে নব-নব সৃষ্টির আনন্দধারায় অভিসিঞ্চিত করেছিল আবার তেমনই পল্লীজীবনের চরম দারিদ্র্য ও শ্রীহীনতা তাঁকে বিচলিত করেছিল। অগণিত গ্রামকে কেন্দ্র ক'রেই তো জাতীয় জীবনস্রোত বয়ে চলেছে। এই মৌল সত্যটিকে কবি একান্তভাবে উপলব্ধি করেন। এখান থেকেই আশ্রমজীবনের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের ভাবনা তাঁর মনে দানা বাঁধে। উপেক্ষা, অশিক্ষা ও নিরক্ষরতাই যে এর জন্য দায়ী এই বাস্তব সত্যটিও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এই সত্যোপলব্ধি ও নব চিন্তার উন্মেষ রবীন্দ্রশিক্ষাভাবনায় সঞ্চারিত হয়ে দিক পরিবর্তনের কারণ হয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে ঘিরে নানা প্রতিকূলতা পদে-পদে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আশাভঙ্গের বেদনায় ও অতৃপ্তির অস্থিরতায় তাঁর মানসিক ভারসাম্যকে বিচলিত করতে উদ্যত হয়েছিল। এমন এক বিশেষ মুহূর্তে শিলাইদহ'র জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে যেন মুক্তির নবদিগন্তকে উন্মোচিত ক'রে দিল। গ্রামবাংলার দর্পণে তিনি দেশ ও জাতির স্বরূপ দর্শন করলেন যা তাঁকে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত করে। আদর্শ গ্রাম নির্মাণের পথে পল্লীমানুষের সার্বিক উন্নয়নই জাতীয় দুর্ভাগ্য মোচনের একমাত্র পথ— এটি তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু হ'য়ে উঠল। এই বিশ্বাসেও তিনি নিঃসংশয় যে, একমাত্র শিক্ষাই এই অসাধ্যসাধনের শক্তি ও অধিকার দাবী করে। শিক্ষার পথেই গ্রামীণ জীবনের অশক্ততা, মলিনতা, দীনতা ও বদ্ধতার প্রাচীরগুলিকে অপসৃত করে বহতা স্রোতধারাকে জোয়ারের উচ্ছলতায় চেতিয়ে তোলা সম্ভব।

শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুলে গড়ে উঠল আদর্শ গ্রাম সৃজনের যজ্ঞপীঠ শ্রীনিকেতন। সূচনা হ'ল এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের। কিন্তু এই যজ্ঞের ঋত্বিক হলেন কে? একজন ভারতপ্রেমী, রবীন্দ্র-অনুরাগী মার্কিন যুবক এল্‌ম্‌হার্স্ট যিনি শিক্ষায় একাধারে ইতিহাসবিদ্ ও কৃষিবিজ্ঞানী। রবীন্দ্রমননজাত এই নূতন শিক্ষাপ্রকল্পের রূপায়ণভার অর্পিত হ'ল তাঁর উপর। কালীমোহন ঘোষ ও সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের মত কর্মসাধকদের সহযোগিতায় ধীরে-ধীরে কবির বিদ্যালয় Poet's School তার রূপমূর্তি লাভ করল। রবীন্দ্রনাথ তার নামকরণ করলেন 'শিক্ষাসত্র'। শ্রীনিকেতনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পল্লীবালকবালিকাদের শিক্ষামূলক স্বনির্ভরতাদানের কেন্দ্র হিসাবে 'শিক্ষাসত্র' তার অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরল। এটি কিন্তু একদিনে হয়নি— বছরের পর বছর নানা বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, নিরলস শ্রম, একান্ত নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা, সুগভীর লোকহিতৈষণা ও নিরন্তর কঠিন পরীক্ষানিরীক্ষার মূল্য চুকিয়ে এ এক বন্ধুর পথপরিক্রমার অবিস্মরণীয় কাহিনী।

পল্লী-প্রকৃতি-পরিবেশে গ্রামীণ জীবনবিকাশের সৃষ্টি-কর্মকেন্দ্র-রূপে 'শিক্ষাসত্র'কে গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিকতার সংক্রমণ থেকে সযত্নে রক্ষা ক'রেন। এটি যাতে নিছক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় হয়ে না ওঠে অথবা দক্ষকর্মী মাত্র গড়ে তোলার মধ্যেই সার্থকতাকে সন্ধান না করে, স্বাধীন সৃষ্টিশীল মানুষ গড়ে তোলার বৃহত্তর লক্ষ্যে অবিচল থাকে সে বিষয়ে তিনি সদাসতর্ক ও যত্নবান ছিলেন। তাই প্রথম থেকেই এখানকার শিক্ষায় হস্তশিল্প, কুটীরশিল্প ও গৃহকর্মের সঙ্গে খেলাধূলা, নাচ-গান ও নান্দনিক শিল্পকর্মের সমন্বয় ঘটেছিল। শিশুর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা ও স্বাধীনতার আনন্দকে এই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষাসত্র'কে শান্তিনিকেতনের বহু বিচিত্র শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেন নি, বরং এর সূচনাপর্ব থেকেই তাঁর নিরলস ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পারস্পরিক আদান-প্রদানের এক অবাধ অবারিত মিলনক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে তিনি শহুরে ও গ্রাম্য শিক্ষা, তত্ত্বমূলক ও কর্মমূলক শিক্ষা, অভিজাত ও লোকশিক্ষার ভেদবিচ্ছেদকে ঘোচাতে চেয়েছিলেন। একই শিক্ষার বহুধাগামিতা ও বৈচিত্র্যধর্মিতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যার মানবিক মূল্যগত ফারাক নেই।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কবির বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্রে'র উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এলমহার্স্টের ভাষায়—'The aim of the 'Siksha-Satra' is to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunity for the joy of play that is work and of work that is play, to give the child that freedom of growth which the young tree demands for its tender shoot, that field for self-expansion in which all young life finds both training and happiness'. রবীন্দ্রনাথের কথায়—'To educate ones limbs and minds not merely to be in readiness for all emergencies, but also to be in perfect tune in the symphony of response between life and the world.'

শিক্ষাসত্র'র উদ্দেশ্যগত তিনটি দিক হ'ল : (১) শিক্ষার্থীকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিবিড় সম্পর্ক রচনার পূর্ণ সুযোগ দান করা।

(২) ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী অধিকতর সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা।

(৩) সৃজনধর্মী জীবিকামূলক ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে সাহায্য দান করা।

এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধক শিক্ষালাভের মধ্য দিয়ে পল্লীশিক্ষার্থীদের জীবন গঠিত হ'লে এদের সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিণতিরূপে গ্রাম-জীবনে যে উন্নয়নশীল রূপান্তর ঘটবে তাকেই রবীন্দ্রনাথ 'আদর্শ গ্রাম' (Model Village) বলেছেন। 'শিক্ষাসত্র' এই আদর্শ গ্রাম-নির্মাণের ব্রতধারী। এই ব্রত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : 'If I can free only one

or two villages from the bonds of ignorance an l weakness there will be built on a tiny scale, an ideal for the whole of India.' এই আদর্শ-গ্রাম তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সারা ভারতবর্ষের সামনে মুক্তির বার্তাকে তুলে ধরবে। 'শিক্ষাসত্র' তাই শুধুমাত্র রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি নূতন সংযোজনমাত্র নয়, এর মাধ্যমে তাঁর জাতীয় জীবন পুনর্গঠনে এক সুবিশাল প্রত্যয় ও সঙ্কল্পের নিঃসংশয় ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে মহাত্মা গান্ধীও অনুরূপ শিক্ষা-চিন্তার উদ্ভাবন করেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন 'নঈ তালিম'। গ্রাম-ভারতবর্ষকেই তিনিও এর কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন। তুলনামূলক বিচারে ও শিক্ষা-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে রবীন্দ্রনাথ যে এক্ষেত্রে শুধু পূর্বগামী ছিলেন তা নয়, তিনি ধারণাগত দিক থেকেও নিঃসন্দেহে অগ্রবর্তী ছিলেন।

এই শতকের চল্লিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল। এই দুটি ঘটনা রবীন্দ্র-শিক্ষাজগতের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া রেখে গেল। স্বাধীনতা-পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনাপর্বে অপরিসীম আশা-ভরসা-উদ্দীপ্ত এক সম্ভাবনাগর্ভ ভবিষ্যৎ রচনার যে স্বপ্ন রচিত হয়েছিল তা মিলিয়ে যেতে বিলম্ব হ'ল না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে ঘিরেও এক অভাবিত বিপর্যয়ের কালো ছায়া নেমে এল। এই ছায়া সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে দীর্ঘতর হয়ে শেষপর্যন্ত এর স্বরূপকে আচ্ছাদিত করেছে। এযুগের মহত্তম সৃষ্টির এমন এক বেদনাদায়ক ট্রাজিক অপমৃত্যু এমন নিঃশব্দে ঘটে যাওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

স্বাধীনতা-লাভের পর রবীন্দ্রনাথের পরিণত চিন্তা-গভীরতার অনন্য ফসল* 'বিশ্বভারতী— যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্', সরকার-নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হ'ল। কবির কল্পিত বিশ্বজ্ঞানসাধনার মিলনক্ষেত্র গতানুগতিক উচ্চশিক্ষাচর্চার অচলায়তনে আবদ্ধ হ'ল। 'শিক্ষাসত্র'-ও তার গতিধারায় বদল ঘটাল আর একই সঙ্গে তার লক্ষ্যও পরিবর্তিত হ'ল। এর বীজ উপ্ত হয়েছিল ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে যে বছর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ঘোষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন-শিক্ষার নিকেতন সরকারী নিয়ন্ত্রণ-জালে আবদ্ধ হ'ল। সরকারী প্রভবের দীর্ঘবাহু ক্রমশ প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হ'ল। 'শিক্ষাসত্রে'র পক্ষেও এই প্রভাব এড়ানো সম্ভব হ'ল না। এই প্রভাব বিস্তারের সময়পঞ্জীটাকে এভাবেই তুলে ধরা যায় :

ক. ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে শ্রীনিকেতনের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বালিকা-বিদ্যালয় শিক্ষাসত্র-র সঙ্গে একীভূত হ'ল।
খ. ১৯৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাসত্র একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে গ্রহণ করল।
গ. ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাসত্র দশ-শ্রেণীযুক্ত গতানুগতিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হ'ল।
ঘ. ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষাসত্র অনাবাসিক বিদ্যালয় হ'ল।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকের মধ্যে 'শিক্ষাসত্র' তার নবরূপান্তরিত দৃশ্যপটের আলো-আঁধারিতে যে রূপমূর্তিকে তুলে ধরল সেটি দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতির অপ্রতিরোধ্য চাপের পরিণাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-প্রশ্নটা থেকে যায় তা' হ'ল— দেশের রবীন্দ্র-শিক্ষা-ভাবনা ও আদর্শের অনুরাগী বুদ্ধিজীবী বিদ্বজ্জন-সমাজ কোনও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরলেন না কেন? আদর্শ গ্রাম ও দেশ পুনর্গঠনের এই দুর্লভ ও সঠিক পথনির্দেশক পরীক্ষণ প্রয়াসকে অসহায় আত্মসমর্পণের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দিলেন কেন? রবীন্দ্র-শিক্ষা সাধনার উজ্জ্বল ঐতিহ্যকে পলে-পলে মসীলিপ্ত হতে দিলেন কেন? এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ ইতিহাস আজও প্রতীক্ষায় রয়েছে।

তিন

আত্মসমীক্ষার আলোয় নব উজ্জীবন

এই উত্তর সন্ধানের জন্যই আত্মসমীক্ষা ও নব-উজ্জীবনের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে আজ আমরা দাঁড়িয়েছি। লুপ্তপ্রায় রবীন্দ্রশিক্ষাঐতিহ্যের স্বর্গকে পুনরুদ্ধার করার অতি কঠিন দায়িত্ব পালনের ডাক এসেছে। যে গতানুগতিক শিক্ষার ফাঁস এই পবিত্র শিক্ষা-মন্দিরের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে নিরুদ্ধ করেছে, সেই শিক্ষাই চরম ব্যর্থতার মরু-বালুকায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমরা তো রবীন্দ্র-শিক্ষাভাবনার শবকে বহন ক'রে চলেছি। রবীন্দ্রনাথের পুণ্যনাম ও স্মৃতিকে মূলধন ক'রে আমরা কি অপশিক্ষার দায়ভারকে বাড়িয়ে যেতে সাহায্য করছি না? এটাই কি নির্মম বাস্তব সত্য নয় যে আমরা রবীন্দ্রনাথের চারদশকব্যাপী নিরলস ত্যাগ ও সাধনামণ্ডিত শিক্ষার মহিমান্বিত ঐতিহ্যের প্রতি ক্ষমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত? এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের নির্মোহ আত্ম-সমীক্ষা ভবিষ্যৎ পথনির্দেশ দান করতে পারে। মূল প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে তাৎক্ষণিক আপস রফার পথে কোনও সুস্থ সমাধান লাভ করা নিছক আত্মপ্রতারণার নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে যে অবিসংবাদী শিক্ষা-সত্যের প্রতিষ্ঠা দান ক'রে গিয়েছেন তাকে সাময়িক প্রলোভন ও মোহের বশে আমরা মিথ্যা হতে দিয়েছি— এত বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার ব্রত আজ আমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে। 'শিক্ষাসত্র'র পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েই আমরা কি তা করতে পারি না? আজ 'শিক্ষাসত্র'কে পাঠভবনের এক নূতন সংস্করণ ছাড়া আর কী বলা যায়। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে যে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতন পল্লীসংগঠন বিভাগের পরিচালনাধীন ছিল তাকে ঐ মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র করা হয়েছে। শিকড়হীন শিক্ষাসত্র তাই নিরক্ত নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের কঙ্কালসার রূপটিকে কোনক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আজ সময় এসেছে রবীন্দ্র শিক্ষাধারায় পুনঃপ্রত্যাবর্তনের। তিনি বিশ্বমানবিক শিক্ষার যে পূর্ণাঙ্গ যুগোপযোগী আদর্শকে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছেন তাকে নূতনভাবে জানা, বোঝা ও গ্রহণ করার সঙ্কল্প আমাদের নিতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে ফিরে তাকাতে হবে 'শিক্ষাসত্র'র দিকে। একে তার উন্মূলিত শিকড়ের সঙ্গে আবার যুক্ত করার উপায় সন্ধান ক'রতে হবে, এর অপহৃত স্বরূপকে পুনরুদ্ধার ক'রতে হবে। রবীন্দ্র-গান্ধী পল্লীকেন্দ্রিক শিক্ষা ও তার মাধ্যমে আদর্শপল্লী ও ভারতজীবন পুনর্গঠনের যে ধ্রুব পথনির্দেশ আমরা বহু পুণ্য ও সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেছি তাকে উপেক্ষা প্রদর্শনের নির্বুদ্ধিতা ও ধৃষ্টতা যেন আমাদের আর বিড়ম্বিত না করে এই একান্ত প্রার্থনা। আজ যেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ঋষি-কবি যুগমানব-পথিক ভবিষ্যদ্রষ্টা 'শিক্ষাসত্রে'র স্রষ্টা-রূপকার রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত মন্ত্রকে স্মরণ, মনন ও স্বীকার করতে পারি :

"Our aim must be to give these villages complete freedom, education for all, the wind of joy blowing across the villages music and recitations going as in the old days. Fulfil the ideal in a few villages only, and I will say that these few villages are my India. And only it that is done will India be truly ours."

তাঁর এই মন্ত্র হ'ল শাশ্বত ভারতবর্ষের কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী মহামন্ত্র যাকে তিনি 'শিক্ষাসত্র'র মধ্য দিয়ে নবযুগমন্ত্র ক'রে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। দীর্ঘ পরাধীনতা পল্লীজীবন জুড়ে যে সীমাহীন নিঃস্বতা ও পরবশতার গ্লানিকে সঞ্চারিত করেছিল তার অপনোদনকেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ স্বাধীনতা বলেছিলেন, নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনই স্বাধীনতার পূর্ণতাকে বোঝায় না। যতদিন গ্রাম-পরবশতা থাকবে ততদিন স্বাধীনতার পূর্ণতা ঘটবে না। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' এই গ্রামীণ পরবশতাকে ঘুচিয়ে স্বাধীন, স্বনির্ভর, সুখী, স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ গ্রাম নির্মাণের শিক্ষা-প্রকল্প

রূপায়ণের অমিত সম্ভাবনাপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে গড়ে উঠেছিল। আমাদের মূঢ়তায় এটি আজ নানা ভ্রান্তির শিকার হয়ে তার সার্থকতাকে বহুলাংশে হারিয়েছে এবং উপেক্ষার অন্তরালে আত্মগোপন করেছে। তাসত্ত্বেও তার অন্তর্নিহিত মূল্য এতটুকু হারায়নি, এর উপযোগমূল্য বিন্দুমাত্র কমেনি। মনে রাখতে হবে 'শিক্ষাসত্র' পুনরুজ্জীবনের মধ্যেই রবীন্দ্র-শিক্ষা-ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার এবং ভারতজীবন পুনর্গঠন ও পূর্ণস্বাধীনতা-রূপায়ণ নিহিত রয়েছে।

সবশেষে সব চেয়ে বড় যে সত্যটি 'শিক্ষাসত্র'র অমূল্য আন্তরসম্পদ তা হল আদর্শ মানুষ রচনার সর্বার্থসাধক ও সর্বতোসার্থক শিক্ষা কী হবে তার মডেল বা রূপকল্প রবীন্দ্রনাথ এর মধ্য দিয়েই উপস্থিত করেছেন। পুনরুজ্জীবিত 'শিক্ষাসত্র' শিক্ষা-মুক্তির নূতনতর দিশারী হয়ে উঠুক এটাই এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমাদের মিলিত কামনা হোক।

শিক্ষাসত্র : প্রেক্ষাপট ও পরিণতি

সৌম্যেন সেনগুপ্ত
অধ্যাপক, শিক্ষাসত্র

১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষাসত্র নানান ঘাত-প্রতিঘাতের চড়াই-উতড়াই অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে যাবার পথে বিভিন্ন পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধন করেই শিক্ষাসত্র এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতেও নিশ্চয় শিক্ষাসত্র প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়েই তার এগিয়ে যাবার পথ করে নেবে। গোড়াতে এই স্বীকারোক্তি বোধকরি করে নেওয়া ভালো যে, শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সমকালের প্রয়োজনে। শিক্ষাসত্র-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। সমকালের প্রয়োজন, সামাজিক দাবী এবং নিজের বিশ্বাস সম্বল করেই রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন শিক্ষাসত্র।

বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫) রবীন্দ্রনাথ আন্দোলনের এক নতুন পন্থার কথা বলেছিলেন। নরমপন্থী আন্দোলন, বর্জন-বয়কটের আন্দোলন কিংবা সশস্ত্র আন্দোলনের থেকে স্বতন্ত্র এক আন্দোলনের কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ; — 'গঠনমূলক স্বদেশী আন্দোলন' (Constructive Swadeshi Movement)। একথা বোধকরি নিশ্চিন্তে জোর গলায় বলতে পারি যে, গান্ধীজীর আগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন যে, প্রথাসিদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কর্তব্য হবে প্রত্যেকটি গ্রামকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা। তবেই ঔপনিবেশিক শাসনের উপরে আমাদের অসহায় মুখাপেক্ষিতা, নির্ভরশীলতা ঘুচবে। আর তখনি আমরা একেবারে ভিতর থেকে প্রকৃতই 'স্বাধীন' হতে পারব। 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক স্বদেশী-আন্দোলনের বিস্তারিত রূপরেখা তৈরী করে দিলেন; যার মূল কথাই ছিল প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি একটি করে গ্রামের দায়িত্ব নেবে এবং গ্রামকে সমস্ত দিক থেকে সুগঠিত করবে। অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য এবং আরও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা দূর করে প্রত্যেকটি গ্রামকে সুন্দর ও স্বাবলম্বী ক'রে তুলবে। এই কাজে গ্রামের মানুষই সাহায্য করবে। 'গ্রামে গাঁথা এই দেশ' এইভাবেই নতুন জীবন লাভ করবে। দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথের এই আহ্বান সেদিন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। উপরন্তু উল্টোদিক থেকে এক বিরূপ আলোড়ন লক্ষ্য করি। এ কবির কল্পনা— রোম্যান্টিক ভাবনা— ইউটোপিয়া ইত্যাদি নানাভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছে। সেদিন এই ভাবনা উপেক্ষা করা যে গর্হিত অন্যায় হয়েছিল এ সত্য দেশনায়কেরা অনেক পরে বুঝেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হতোদ্যম না হয়ে প্রথমে শিলাইদহ-কুষ্ঠিয়া এবং পরে শ্রীনিকেতনে নিজের মতো ক'রে সীমিত সাধ্যের মধ্যে এই কাজ করেছিলেন। শ্রীনিকেতনে এল্‌ম্‌হার্স্ট, কালীমোহন রবীন্দ্রনাথকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল গ্রামের, অবশ্যই পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অশিক্ষা দূরীকরণের জন্যে।

সুতরাং যুগের প্রয়োজনেই যুগন্ধর রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সময়ে বাংলার এই প্রত্যন্ত প্রান্তে গ্রামগুলির অবস্থা খারাপ ছিল। অশিক্ষা, অসচেতনতা, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী ছিল। শ্রীনিকেতন সংলগ্ন বল্লভপুর গ্রামের দৃষ্টান্ত দিলেই আশেপাশের অন্যান্য গ্রামের চেহারাটা অনেকটাই বোঝা যাবে। ১৯২৬ সালে বল্লভপুরে মোট ৮৪ জন অধিবাসীর মধ্যে সাক্ষর ছিলেন[১] মাত্র ১৩ জন। এঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র ২। আর একজনই মাত্র I.A. (first year) পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। এখানকার ২৪ টি পরিবারের মধ্যে ২৩ টি পরিবারই ঋণ-জর্জরিত ছিল। সুদ গুণতে হত ১২ থেকে ৩০ শতাংশ। কাবুলিওয়ালাদের কাছে ধার নিলে সুদের হার ১৫০

---

১ কালীমোহন ঘোষ, কৃত বল্লভপুর গ্রামের সার্ভে রিপোর্ট - ১৯২৬।

থেকে ১৭৫ শতাংশ পর্যন্ত হ'ত।[১] অন্যদিকে গ্রামটিতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। গরীব মানুষগুলো অর্থাভাবে সঠিক চিকিৎসাও করাতে পারতো না। একদিকে পল্লী-সংগঠন বিভাগের মাধ্যমে গ্রামবাসীর এই প্রায়-বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা শুরু হ'ল; অন্যদিকে শিক্ষাসত্রের মাধ্যমে গ্রামের অশিক্ষা দূরীকরণের কাজ শুরু হ'ল। এই সময়ে গ্রামের মানুষের এমন শিক্ষা প্রায়োজন ছিল যে, শিক্ষা একদিকে যেমন তাদের চলনসই শিক্ষিত করবে, অন্যদিকে তাদের জীবীকার্জনের বৃত্তি-শিক্ষা দেবে। "The Primary object of an institution of this kind (Siksha-Satra) should not merely be to educate one's limbs and mind to be in efficient readiness for all emergencies, but to be in perfect tune in the symphony of response between life and world."[২] চাষের কাজ, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ শেখাই ছিল মুখ্য। সেই সঙ্গে চলত লেখা-পড়া ও প্রাথমিক গণিতের শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে, এখানে ছাত্ররা 'learn to earn an honest livelihood' অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সৎভাবে জীবিকা নির্বাহের শিক্ষা পাবে। অনেকদিন পর্যন্ত এইভাবেই শিক্ষাসত্র সময়ের ও স্থানীয় গ্রামের প্রয়োজন পূরণ করেছে। গান্ধীজী এই শিক্ষাসত্র-পরিকল্পনার অনুসরণে তাঁর বুনিয়াদি শিক্ষাবিধি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন।

কিন্তু একটু-একটু করে শিক্ষাসত্র পরিবর্তিত হতে শুরু করে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবীও ছিল। পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রবহমানতারই অঙ্গ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি লাইন এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। "জীবন ও জীবিকা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা।... তাই আবহমান কাল থেকে পুরুষানুক্রমে জীবিকার্জনের বিচিত্র বিধি ও বৃত্তি শিক্ষার মাধ্যমে চালু হয়ে আসছে। কিন্তু দেখা যায় রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক কালবদলের সাথে সাথে ভাবী নয়া সমাজে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা মাণবকদের জন্য পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হয়ে আসছে।... প্রতি যুগে যুগন্ধররা নূতন কালের উপযোগী শিক্ষাবিধি উদ্‌ভাবন করেছেন, সমাজ বা রাষ্ট্র কখনো তা গ্রহণ করেছে, কখনো বা করে নি।"[৩] যুগের প্রয়োজনেই ও সময়ের দাবী মেটাতেই শিক্ষাসত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। যে সঙ্কট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসত্র তৈরী হয়েছিল সেই সঙ্কট ও সমস্যা ক্রমশই দূরীভূত হয়েছে, এসেছে নতুন সঙ্কট ও নতুন সমস্যা। এই সঙ্কট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাসত্রের ভূমিকাও পাল্‌টে যেতে বাধ্য। ১৯৪০-এর পর থেকেই শিক্ষাসত্র একটু-একটু করে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এই সময়ে অভিভাবকরাই চাপ সৃষ্টি করেন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষাদান করার জন্য। অভিভাবকদের এই দাবী শিক্ষাসত্র উপেক্ষা করতে পারে নি। এরপর ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবার পরে শিক্ষাসত্রের জীবনধারায় বড় ধরনের কিছু-কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হ'ল। ১৯৫৪ সালে শ্রীনিকেতনের সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বালিকা বিদ্যালয়টি শিক্ষাসত্রের সঙ্গে একীভূত হয়। সেইসঙ্গে শিক্ষাসত্র দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আরও বড় পরিবর্তনটি এ'ল ১৯৫৬-৫৭ সালে। এই বছর শিক্ষাসত্রে 'All-India system of Higher Secondary Education' গৃহীত হ'ল। এখন শিক্ষাসত্র এক উল্লেখযোগ্য দশম শ্রেণীর স্কুল— হয়তো কেউ-কেউ বলবেন আর পাঁচটা সাধারণ স্কুলের মতোই একটি স্কুল। অনেকে এমন কথাও বলেন যে, শিক্ষাসত্র পাঠভবনেরই প্রতিরূপ। তর্কের অবকাশ থাকলেও এই মুহূর্তে তর্ক পাশ কাটিয়ে এটা দ্বিধা না রেখে বলা ভালো যে, শিক্ষাসত্র তার সূচনালগ্নের কর্মকাণ্ড থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এর জন্যে শিক্ষাসত্র অনেকেরই সমালোচনার শিকার। ব্যক্তিজীবনে বা প্রতিষ্ঠানের জীবনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়েরও বেশ কিছু পরিবর্তন মেনে নিয়েছিলেন, হয়তো-বা নিতান্তই অনিচ্ছাসত্ত্বে। কিন্তু তিনি এটা বুঝেছিলেন যে, যদি এই নবতর পরিবর্তনের সঙ্গে আপস না করা যায়, তাহলে 'There would be no chance of having a single

২ 'A Poet's School'— Rabindranath Tagore

৩ 'শিক্ষাসত্র ও বুনিয়াদি বিদ্যালয়'— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শতবর্ষে গান্ধী স্মরণ সংখ্যা, বিশ্বভারতী

student in my school।' কে বলতে পারে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষাসত্রও যদি নিজেকে সময়ানুযায়ী পরিবর্তন না করত তাহ'লে এই একই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হ'ত না। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, যুগের দাবী মেটাতই হবে। আর এই যুগের দাবী মেটাতে গিয়েই শিক্ষাসত্র বদলেছে। শিক্ষাসত্র গড়ে উঠবার সময় শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামগুলির যে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা আগের থেকে এখন অনেকটাই উন্নত। প্রত্যেক গ্রামে তৈরী হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, কোথাও-কোথাও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। মানুষ সচেতন হয়েছে। এখন প্রায় প্রত্যেকেই চায় তার ছেলে বা মেয়ে পড়াশোনা করবে— পাশ করবে— জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। এখন গ্রামের মানুষেরও চাহিদা যে, তাদের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়-শিক্ষা শেষ করে অভিজ্ঞান-পত্র পাবে, যা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে বা জীবিকার্জনের পথে সহায়তা করবে। গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমোন্নয়নের সঙ্গে-সঙ্গে— মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে এই দাবী ক্রমশই প্রসারিত হচ্ছে। এই যুগ-দাবীর সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত না করে শিক্ষাসত্রের উপায় ছিল না। আর এই কাজটা না করলে, বলতে দ্বিধা নেই, শিক্ষাসত্রের অস্তিত্ব অবশ্যই বিপন্ন হ'ত।

এখানকার গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়েছে। নতুন অর্থনীতির প্রভাবে গ্রাম আর শহরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘুচে গিয়ে গ্রাম-শহর কাছাকাছি এসেছে। ফলে গ্রাম-শহরের মানুষের সামাজিক চাহিদা, তাদের মানসিকতাও অনেকটাই একাকার হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষও শহরবাসীর মতোই বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। নিছক চাষের কাজ বা কাঠের কাজ শেখানোর জন্যে তারা ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে চায় না। গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্যে একরকম শিক্ষাব্যবস্থা, শহরের ছেলেমেয়েদের জন্যে অন্য আর-এক রকম— এমন দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থার কথা এখনো যারা তাদের কল্পলোকে সযত্নে লালন করেন তাদের ভেবে দেখা উচিত যে এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। গ্রামের অতীত সমস্যাগুলি যথা অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, অসচেতনতা এখন আর প্রায় নেই। অতীতের এই যে সমস্যাগুলি মোকাবিলা করবার জন্যে যে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল, সমস্যাগুলি প্রায়-অন্তর্হিত হওয়ায় এবং নতুন সমস্যাগুলিকে আবার নতুন ক'রে দেখে নেবার জন্যে অতীতের ঐ শিক্ষাবিধি নতুন করে গড়ে নিতেই হবে। এখন গ্রাম-শহরের মূল সমস্যাগুলি একই রকম। কাজেই আলাদা-আলাদা ক'রে নয়, একইভাবে - একই পথে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সুতরাং শিক্ষাসত্র সেই প্রথম যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখবে বা তা রাখা উচিত বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা রথের পেছনের দিকে ঘোড়া জুড়ে দিতে চান বলেই মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের, বোধকরি মূল কথা হ'ল 'পূর্ণ মনুষ্যত্বের শিক্ষা।' বাহ্যিক অনেক রদ-বদল ঘটলেও শিক্ষাসত্র রবীন্দ্রনাথের মূল শিক্ষাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় নি বলেই বিশ্বাস করি। সাধারণ বিদ্যালয়ের থেকে শিক্ষাসত্র-পাঠভবন এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মনের ও দেহের বিকাশের যে প্রভূত আয়োজন আছে তা অন্যত্র সম্ভবতঃ নেই। একটা বিষয় ভালো লাগে, যখন দেখি শিক্ষাসত্র বা পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যেতে ভালাবাসে। এমনকি কোনো কারণে ছুটি হয়ে গেলেও স্কুলকে নিয়েই ছুটির অনাবিল আনন্দ ভোগ করে। গান-নাচ-হাতের কাজ-ছবিআঁকা-খেলাধুলো-সাহিত্যসভা এসবের মধ্যে দিয়েই মন-চোখ-হৃদয়-শরীরের বিকাশ হয়ে চলেছে। শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়, সার্বিক বিকাশের মধ্যে দিয়েই ছেলে-মেয়েরা পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠছে। শিক্ষাসত্র রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের অন্তর্নিহিত সত্য অস্বীকার করে নি; বরঞ্চ নিরলস প্রচেষ্টায় সযত্নে তা প্রতিপালন করে চলেছে।

একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, নিয়মের কড়াকড়ি, প্রশাসনিক বাধা-নিষেধ শিথিল করে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সুন্দর ও সুস্থ করা দরকার। খণ্ড-খণ্ড শিক্ষাবিধি আলাদা-আলাদা নিয়মনীতি নয়, বিশ্বভারতীতে সামগ্রিকভাবে এক Integreated Education System চালু করা দরকার। প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একটা continuity বা

ধারাবাহিকতার অবকাশ থাকা দরকার। পড়াশোনায় যারা অনাগ্রহী বা অসফল বিদ্যালয় স্তর থেকেই তাদেরকে তাদের পছন্দের বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। ধরা যাক, কেউ গানে অত্যন্ত পারদর্শী তাকে চিহ্নিত করে অষ্টম শ্রেণীর পরেই শুধু গানের শিক্ষা দিয়ে সঙ্গীতভবনে প্রবেশ করানো দরকার। continuity বলতে আমি এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন এটা নিয়ম-নীতির কল্যাণে সম্ভব নয়। সঙ্গীতভবনে প্রবেশ করতে গেলে উচ্চমাধ্যমিক তাও ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করতেই হবে। সর্বত্রই এই একই অবস্থা। তাঁত, কাঠ, চাষ, ছবি-আঁকা সবকিছুতেই এই প্রতিবন্ধকতা আছে। এর ফলে কোনো বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা ও প্রতিভা থাকলেও শুধুমাত্র বিধিবদ্ধ পড়াশোনায় অসফলতার কারণে অনেককেই হতাশ হতে হচ্ছে। খুঁজে নিতে হচ্ছে জীবিকার্জনের জন্য অন্য কোনো পথ। অথচ সঠিক সুযোগ দিতে পারলে হতভাগ্য ছাত্র বা ছাত্রীটি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি-নির্ধারকদের সহৃদয় ভাবনা-চিন্তা আবশ্যক বলে মনে করি। মনে রাখা দরকার elemination না, assimilation-ই বিশ্বভারতীর মন্ত্র— "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্"।

শিক্ষাসত্র-প্রসঙ্গে

অভিনন্দন সেন
দশমশ্রেণী, শিক্ষাসত্র

প্রাচীনকালের জীবনাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অতীতের ভারতবর্ষের তপোবনের রূপটি তাঁর মনে সর্বদা ছবির মতো ভেসে উঠত। তাই তিনি মনে-মনে সংকল্প করলেন যে প্রাচীন ভারতের বিদ্যাচর্চার ধারা ও আদর্শকে তিনি বাস্তবায়িত ক'রবেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ল মনুষ্যত্বের বিকাশ, মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলা। প্রচলিত প্রথা-অনুযায়ী শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার্জনের একান্ত বিরোধী ছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়সীমা ও ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষার তৎকালীন ব্যবস্থাকে তিনি কোনভাবেই সমর্থন করেন নি। তাঁর নিজের ছাত্রজীবনের বন্দিদশার কথা তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভোলেননি। ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' তৈরী করবার জন্য ইস্কুল নামক যন্ত্রটি তাঁর কাছে একান্তই অবাঞ্ছিত ছিল। তিনি চাইতেন গণ্ডীর বাইরে এসে প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে শিশুরা পাবে মনের ছুটি। সমস্ত আকাশ, বাতাস, পাখী, নদী আর গাছপালা থেকে তারা পাঠ নেবে,— যে পঠনে নেই কোনও শুষ্কতা, নেই আনন্দহীন উপলব্ধি, হৃদয় দিয়ে তারা অনুভব করবে সমস্ত মানুষের সুখ, দুঃখ, সমব্যথী হবে অন্যের ব্যথায়। সেই ভাবধারাতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাকে আমরা বর্তমানে পাঠভবন ব'লে জানি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তখন প্রকৃতই ছিল আশ্রমের পরিবেশ। ছবি আঁকা, নাচ, গান, নাটক অভিনয়, সাহিত্যসভার মাধ্যমে ছাত্রদের আনন্দলাভের ব্যবস্থা ছিল। পরিবেশকে সুখকর ও আনন্দময় করবার জন্য নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'ত। মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর শিক্ষাচিন্তা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে বিকশিত ও পল্লবিত হয়ে উঠল। দেশ-বিদেশের নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, শিক্ষার্থীরা এসে মিলিত হ'ল বিশ্বভারতীর প্রাঙ্গণে। তখনই তিনি অনুভব করলেন তিনি যা চেয়েছিলেন, ঠিক তা পাননি। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতির বাইরে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন ক্রমে সে তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ইস্কুল কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা প'ড়ে গেছে। মনে-মনে বড় ব্যথিত হলেন তিনি। আর তারই পরিণতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা হ'ল আর-একটি নূতন বিদ্যালয় 'শিক্ষাসত্র।' তাঁর চিন্তা ছিল এই বিদ্যালয়ই তাঁর স্বপ্নের স্থান যেখানে মিলবে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ, এবং তিনি তাঁর আদর্শের সার্থক রূপায়ণ করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন গ্রামের মানুষরা অশিক্ষার অন্ধকারে থাকলে কোনওদিনই গ্রামের উন্নতি হবে না এবং গ্রামের উন্নতি না হ'লে সমাজ ও দেশের অগ্রগতি কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের যথেষ্ট সুযোগ এই বিদ্যালয়ে রাখা হবে। কিছু ছাত্র এল গ্রামের সাধারণ পরিবার থেকে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকে কেন্দ্র ক'রেই তাই যাবতীয় পরিকল্পনা করা হ'ল। শিল্পগুলি তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল, যেমন : গৃহশিল্প, হস্তশিল্প ও বহিঃকক্ষ শিল্প। এইসব শিল্পকাজের সঙ্গে অন্যান্য নানারকম শিক্ষাব্যবস্থাও রাখা হ'ল। যেমন ভাষা-সাহিত্য, ভূ-বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি। এ ছাড়াও সামাজিক পরিবেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণমূলক ভ্রমণের ব্যবস্থাও করা হ'ল। এই ভ্রমণের মাধ্যমে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ কেন্দ্র, থানা, জেল, তেলকল, ইঁটভাটা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। প্রথাগত শিক্ষার ফলে শহরের শিক্ষিত মানুষ আর খেটে-খাওয়া গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। সেই বিচ্ছিন্নতাই দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আনে দূরত্ব। সেই দূরত্বকে অপসারিত ক'রে এক সার্বজনীন শিক্ষার

সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হ'ল শিক্ষাসত্র। এই অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের চিন্তাপ্রসূত।

১৯২৪ সালে ছ'টি ছেলে নিয়ে শিক্ষাসত্র স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতনে। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ছাত্রদের রান্নাবান্না, বাগান করা, ঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিজের হাতে শেখাতেন। তাছাড়া গীতিনাট্য, কলাচর্চা, ব্যায়ামও শেখাতেন। তিনি মন-প্রাণ দিয়ে শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন ক'রেছিলেন। সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্র স্থানান্তরিত হ'ল শ্রীনিকেতনে। যখন কোন একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা রূপায়িত করার কথা ভাবা হয়, তখন প্রাথমিক কতকগুলি বিষয় চিন্তা ক'রে নিতে হয়। যেমন, এই শিক্ষানীতি কোন্-কোন্ ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদা পূরণ করবে এবং কোন্ প্রকারের পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে এই শিক্ষানীতি সফল হবে। রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্ট গভীরভাবে চিন্তা ক'রেই সেই প্রয়োগগুলি করেছিলেন। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষাধারাকে এক নূতনধারায় প্রবাহিত করলেন তাঁরা। এভাবে প্রথাবহির্ভূতভাবে শিক্ষাসত্রের পাঠক্রম চলছিল। দশবারো বছর কাটতে-না-কাটতেই গ্রামীণ্ ছাত্ররা আবেদন জানাল তাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার জন্য। কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের এই আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই শিক্ষাসত্রে কর্মভিত্তিক পাঠক্রমের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের প্রস্তুতি হিসাবে প্রাথমিক লেখাপড়ার আয়োজন ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভুক্ত হ'ল। স্বভাবত তখন থেকেই শিক্ষাসত্রের শিক্ষাধারা অনেকটাই পরিবর্তিত পথে চলতে লাগল।

তখনকার শিক্ষাসত্রের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। জীবনযাত্রা ছিল আরও সহজ সরল। শ্রীনিকেতনের সকলের সঙ্গেই শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের সম্পর্ক ছিল ঘরের ছেলের মতো। তখন এখনকার মতো এত আয়োজন ছিল না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে গান, ছবি, নানাধরনের শিল্পকর্ম, নাটক অভিনয়, সাহিত্যসভা ইত্যাদি ছাত্রদের সদাব্যস্ত ও আনন্দময় করে রাখত। গ্রামদরদী পরম শ্রদ্ধেয় এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর সৃষ্টিধর্মী মন এমনটিই চেয়েছিল। তাই তিনি শিক্ষাসত্রের কর্মকাণ্ডে পরিতৃপ্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কৃষিকার্যকে কতখানি প্রাধান্য দিতেন তা আমরা তাঁর 'হলকর্ষণ' উৎসবের পরিকল্পনা দেখেই বুঝতে পারি। শিক্ষাসত্রের এই কর্মকাণ্ডের পিছনে শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসুর অবদানও কম নয়। পরিশেষে এই কথাই বলা যায়, তখনকার দিনের সঙ্গে আজকার পঠন-পাঠনে খুব বড় রকমেরই প্রভেদ দেখা যায়। তখন পড়াশুনোর উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রকৃত জ্ঞানার্জন করা। তখন কোনও নম্বরভিত্তিক প্রতিযোগিতা ছিল না। ছিল না সার্টিফিকেট নিয়ে কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা। শুধু বিষয়ভিত্তিক প্রকৃত জ্ঞানলাভ ক'রলেই তাকে সেই কাজের উপযুক্ত ব'লে মনে করা হ'ত। কেবলমাত্র পুঁথিগত নয়, হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ আজও আমাদের উন্নতি-সাধনের জন্য নানাভাবে আমাদের সহায়তা করেন। তাঁদের স্নেহ ভালোবাসা ও সহমর্মিতা না পেলে শিক্ষসত্রের গতিপথ নিশ্চয়ই রুদ্ধ হয়ে যেত। আমরা সেজন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। শিক্ষাসত্রের শিক্ষাধারার পরিবর্তন হ'লেও শিক্ষকদের আন্তরিকতার পরিবর্তন হয় নি। তাঁদের আদর্শ ও নিষ্ঠাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে ও তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ ক'রছি।

প্রথম অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ

শ্রীমতী আরতি সেন
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিনয়ভবন, বিশ্বভারতী

এই আলোচনাচক্রে আমার আগে যাঁরা বলেছেন আমি বিশদভাবে তাঁদের প্রত্যেকের নোট নিয়েছি। আমি দু-একটি কথা বলব। আলোকনাথ সেনশর্মা প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। শিক্ষাসত্র এবং পাঠভবন এই দুটো কি আলাদা মডেল না এটা একই মডেলের উন্নয়ন? পাঠভবনেরই মডেল যেটা সেটাই রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আরও পূর্ণতার রূপ পেয়েছে কি না শিক্ষাসত্রের মধ্যে এই একটা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি এই প্রশ্নের মধ্যেই তাঁর উত্তর নিহিত রেখেছেন। আমার মনে হয়েছে ওঁর মতে একই মডেল বলতে চান।

মডেলের অংশগুলি বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করার কথা বলে মূল্যায়ন করার কথা বলেছেন। গ্রাম এবং নগর এই দুই ধরনের আলাদা শিক্ষার কথা আমরা বলি, এ দুটো আলাদা শিক্ষা হওয়া উচিত কি না? এটা উনি তর্কের আকারে রেখেছেন। এর উত্তর উনি নিজে দিয়ে দেননি।

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেছেন। তিনি একটি খুব মূল্যবান কথা বলেছেন। শিক্ষাবিদ অথবা যে-কোনও চিন্তকের চিন্তার মধ্যে যে বড় কথা থাকে, বিরাট কথা থাকে সেই বিরাট কথার মধ্যে একটা চিরন্তনত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যেও সেইরকম একটা চিরন্তনত্ব ছিল। যার ফলে তাঁর সময়ে যেমন এখনও তেমনি তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় আছে। কিন্তু তবু তিনি তাঁর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার কথাটাও উল্লেখ করেছেন। ওই রকম চিরন্তনের কথা নয়। তিনি যে কথাগুলো বলেছেন তা হচ্ছে আজকে বিশ্ব যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে সেই দৃশ্যটার বিপরীতে যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে রাখি, আজকে বিশ্ব যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে তা হচ্ছে, প্রতিযোগিতা, হিংসা, যুদ্ধ, মানবসম্পর্কের হানি, যান্ত্রিকতার প্রসার এবং অপরাধ প্রবণতার বৃদ্ধি। বিশদভাবে বিস্তৃতভাবে যে বিশ্বকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্ব এই বিংশশতকে শেষ হতে চলেছে সেই বিশ্বকে সামনে রেখে আমরা রবীন্দ্রচিন্তাকে আলোচনা করি তাহলে দেখব রবীন্দ্রচিন্তার মধ্যে এমন কিছু উপাদান আছে যা এই বর্তমান বিশ্বের ঠিক উলটো। বর্তমান বিশ্ববাসী কিন্তু এর সমাধান খুঁজছে। দুঃখের বিষয় যে বর্তমান বিশ্ববাসী রবীন্দ্রনাথের কথা জানে না। অতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত শোনে নি। এই রকম অবস্থা বিশ্বের। কিন্তু আমি নিজে এটা বিশ্বাস করি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা তাঁর কর্মের মধ্যে সবসময় রূপায়িত হয় নি। কিন্তু তাঁর চিন্তার মধ্যে বিশ্বের অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সোমেন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তরুণ মজুমদারের মিল রয়েছে। আজ বিশ্ব যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে হিংসা, নানা ধরনের বৈপরীত্য, শিল্পায়নের দরুণ সমস্ত অপরাধ-প্রবণতা তৈরী হচ্ছে। বর্তমান শতাব্দীটা শুরু হয়েছিল শিশুমুক্তির কথা দিয়ে, বর্তমান শতাব্দীটা শেষ হচ্ছে শিশুর আগাগোড়া আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনের মধ্য দিয়ে। শিশুর সেই বন্ধনমুক্তির পথ রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাতলে দিয়েছিলেন। শুধু এখনকার জন্য নয় একবিংশ শতাব্দীর জন্যও যা প্রযোজ্য।

অভিনন্দন সেন আমাদের ছাত্র। সংক্ষেপে অথচ খুব সুন্দরভাবে সে তার বক্তব্য বলেছে। সে মনুষ্যত্বের বিকাশের কথা বলেছে, গ্রামের উন্নতির কথা বলেছে, শিল্প, শিক্ষা এবং সামাজিক পরিবেশের কথা বলেছে, যা শিক্ষাসত্রের মূল ভাবনা ছিল। শিক্ষাসত্রের পাঠক্রমের কথা উল্লেখ করে দেখিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা গ্রামের বিশেষ করে কৃষকদের কাজকর্মের সঙ্গে কতটা যুক্ত ছিল।

সৌম্যেন সেনগুপ্ত রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তিনটি বিষয়ের ওপর জোর

দিয়েছেন— ১) প্রাসঙ্গিকতা ২) একবিংশ শতাব্দী ৩) শিক্ষাসত্রের ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে তিনি খুব জোর দিয়েছেন পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের উপর— শিক্ষাসত্রের মডেলে যে গ্রামজীবনের প্রাধান্য ছিল।

উনি একটা কথা বলেছেন যা বিতর্কিত বিষয়। যদিও বিতর্কের অবতারণা করার সময় এখন আসে নি। আজ গ্রাম আর শহরের পার্থক্যটা অনেকখানি কমে যাচ্ছে। গ্রামের শিক্ষা শহরের শিক্ষা বলে আলাদা কিছু নেই। গ্রামের লোকেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা শহরের লোকেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। শিক্ষাসত্রের আলাদা করে গ্রামীণ লোকেদের শিক্ষাক্রম তৈরী করবার যে দায়িত্ব সে দায়িত্বটা থাকছে না। কিন্তু তাসত্ত্বেও আরেকটা দায়িত্ব তার থাকছে। সেটা হচ্ছে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের দায়িত্ব। সৌম্যেন সেনগুপ্ত ব্যক্তি আর জীবনের মূল লক্ষ্যের কথা বলেছেন। গ্রামে বিজ্ঞান আনার কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলতে চেয়েছেন বিজ্ঞান যখন গ্রামে আসবে তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে প্রযুক্তিও আসবে। এবং প্রযুক্তি আসার মধ্য দিয়ে গ্রাম শহরায়িত হয়ে যাবে।

এই হচ্ছে প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিতর্কিত বিষয়গুলিতে আমি প্রবেশ করছি না। রবীন্দ্রচিন্তার মধ্যে, শিক্ষাচিন্তার মধ্যে এবং সমাজচিন্তার মধ্যে, আমরা রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তাকে সমাজচিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখব না তাহলে রবীন্দ্রশিক্ষাচিন্তাকে আমরা ভুল করে দেখব। প্রথমে আলোক সেনশর্মা শিক্ষাসত্রের মডেলের কথা বলেছেন। কিন্তু একথা উল্লেখ করেন নি যে শিক্ষাসত্রের মডেলটা কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন মডেল নয়। গোটা শ্রীনিকেতনের অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল হিসাবে, শ্রীনিকেতনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে উনি শিক্ষাসত্রকে দেখেছিলেন। তাঁর শিক্ষাসত্রের সে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমকে সমস্ত গ্রাম পুনরুজ্জীবনের যে কার্যক্রম তারই একটা কেন্দ্রস্থল হিসাবে তিনি দেখেছেন। তাহলে এই মডেলটাকে আলাদা করে বিচার করলে বোধহয় একটু ভুল করা হবে।

কিন্তু এটা আমার প্রধান কথা নয়। আমি বলব একথা যে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে সমাজচিন্তা খুব ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল এবং তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটা বিশ্বচিন্তা ছিল। বিশ্ব মানে শুধু মনুষ্য নয়, বিশ্ব মানে তার চেয়ে বড় যাকে আমরা Universe বলি। সেই বিশ্বের একটা অংশ হল মনুষ্য। কিন্তু সেই মনুষ্য বিশ্বপ্রকৃতির কোলে সংস্থিত। মনুষ্যের একটা নিজস্ব গুণ আছে। মনুষ্যের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু উনি বিশ্বকে তার চেয়েও বড় করে দেখেছেন। এবং সেই বিশ্বের সঙ্গে যোগ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মূল কথা। শিক্ষার মধ্য দিয়ে, সমাজের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির মধ্য দিয়ে যা কিছুর মধ্য দিয়ে হোক না কেন যুক্ত হওয়া। যুক্ত হওয়া হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার এবং জীবনের মূল লক্ষ্য। যুক্ত হও বিচ্ছিন্ন থেকো না যুক্ত হও। উনি মনে করেছেন, উনি নিজে অনুভব করেছেন যে এটা হচ্ছে মানুষের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। মিলনের আকাঙ্ক্ষা। মিলনের আকাঙ্ক্ষা মানে কার সঙ্গে মিলন? একদিকে হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলন ও অপরদিকে হচ্ছে মনুষ্যের সঙ্গে মিলন। মনুষ্যের সঙ্গে মিলনটা একটু আলাদা রকম। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাটাই তার শিক্ষাচিন্তার মধ্যে রূপ পেয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মিলন এবং মনুষ্যের সঙ্গে মিলন। এজন্য তাঁর শিক্ষাতে তিনি বলছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে গাঢ় সাহচর্য, মানুষের সঙ্গেও গাঢ় সাহচর্য। তিনি বলছেন যে to be natural with man and to be human with human beings. যখন মানুষের সঙ্গে মিলবে তখন মানুষের মতন গুণ অর্জন কর। যখন প্রকৃতির সঙ্গে মিলবে তখন প্রাকৃতিক হও। তোমার ভেতরে একই মানুষের মধ্যে কিন্তু নানা স্তর আছে। সেই নানা স্তরের মধ্যে যে প্রাকৃতিক স্তর, সেই প্রাকৃতিক stand animal, প্রাণমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। লিপিকাতে প্রাণমন বলে একটি লেখা আছে। মানুষের মধ্যে সেই প্রাণমনের দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এই প্রাণমন একই মানুষের মধ্যে আছে। তার প্রত্যেকটা স্তরে আপনারা যারা এখানে শিক্ষার তত্ত্বের ছাত্র আছেন তাঁরা জানেন যে আব্রাহাম ম্যাসলোর একটা তত্ত্ব আছে। আমাদের উপনিষদে ঋষিরাও বলেছেন যে মানুষের বিভিন্ন স্তর আছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়— উপনিষদের কথায়। তেমনি ম্যাসলোও বিভিন্ন স্তরের কথা বলেছেন। এবং সেই যে স্তর প্রত্যেকটা স্তরেরই চরিতার্থতা দরকার। রবীন্দ্রনাথ

সেই কথা বলেছেন যে তার যে Natural মন, প্রকৃতির সঙ্গে যে এক হতে চায় সে প্রাকৃতিক, প্রকৃতির সাহচর্যের সঙ্গে এক হতে পারবে। মানুষের সঙ্গে যে এক হতে চায় সে মনুষ্যোচিত। মানব-সমাজের উপযুক্ত মানুষের সঙ্গে এক হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী অর্জন করা দরকার সেই গুণাবলীর মধ্য দিয়ে সে মানুষের সঙ্গে এক হতে পারবে। সুতরাং এই দুটো হচ্ছে তার কাছে শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য। কি করে প্রকৃতির সঙ্গে মেলা যায়, কি করে মানুষের সঙ্গে মেলা যায়? এখন যদি দেখি আমাদের এই জগৎটাকে, কি অবস্থায় দাঁড়িয়েছে এই বিংশ শতাব্দীটা। একদিকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন যে আমাদের সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে মানবসম্পর্কের হানি। মানবসম্পর্কের হানির মধ্য দিয়েই শনি, আমাদের এই ছিদ্রপথেই শনি প্রবেশ করে। মানুষের সভ্যতার যেখানে যেখানে সর্বনাশ হয়েছে সেই সর্বনাশ এইজন্য হয়েছে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের হানি হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন (Industrialisation) বা শিল্পায়ন সে কি করেছে, সে মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীতে লিখছেন যে মানুষগুলো সব নরসংখ্যা হয়ে গেছে। কেবল মানুষ নেই, সব সংখ্যা হয়ে গেছে। এবং তারা যন্ত্রের মতন একটা উদ্দেশ্য সাধিত করছে। তারা জানে না যে তারা কি কাজ করছে। আপনারা মার্সের কথা বললে বেশি জানতে পারবেন, রবীন্দ্রনাথের কথার চেয়ে। মার্স যে অ্যালিয়ানেশনের কথা বলেছেন সেটাও সেই একই কথা। একটা বড় অভিশাপ হচ্ছে যে শ্রমিকরা যারা যন্ত্র পরিচালনা করছে তারা জানে না যে এই গোটা যন্ত্রটা দিয়ে কি কাজ হবে। তারা শুধু অংশটার কথা জানে। বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সে। এই যে অ্যালিয়ানেশন বা বিচ্ছেদ এই বিচ্ছেদটাকে দূর করবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেছেন যে একদিকে যন্ত্র বা প্রযুক্তি এরা, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিজ্ঞানকে মোটেই হেয় করেননি। তিনি বরঞ্চ বলেছেন যে বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দান করেছে। সেই মহাশক্তিকে মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও দেখেছেন যে বিজ্ঞান কি কাজে লাগছে? বিজ্ঞান কতকগুলি অল্প, শক্তিশালী মানুষের ব্যক্তিগত লাভের কাজে লাগছে বা গোষ্ঠীগত লাভের কাজে লাগছে। সুতরাং আজ যন্ত্রায়নের ফলে মানুষও যন্ত্রায়িত হয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি প্রেমের ক্ষেত্রেও মানুষের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক থাকছে না। এই যে অবস্থা, এ একটা ভয়াবহ অবস্থা।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে আমাদের আবার সেই রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করতে হবে— কি করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত করতে হয়। কি করে সমাজটাকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যায় যাতে মানুষের সঙ্গে মানুষের খুব নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সারা পৃথিবীতে কিন্তু Socialist-রা বা সমাজবিজ্ঞানীরা আজকাল এই বিষয়ে চিন্তা করছেন যে কি করে face to face community তৈরী করা যায়। অর্থাৎ গ্রামসমাজ। Face to face community মানেই কিন্তু অন্য এক অর্থে গ্রামসমাজ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে রবীন্দ্রনাথের কত বড় অবদান রয়েছে। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রভাবনাকে যদি সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্ববাসী এর মধ্যে থেকে নতুন আলোর সন্ধান পাবে। দ্বিতীয় যেটা সম্ভবত সৌম্যেনবাবু বলেছেন যে আমরা প্রকৃতিকে ধ্বংস করে তাকে লাভের এবং লোভের উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছি। বিজ্ঞান মানুষের অনেক উপকার করেছে। কিন্তু একটা বড় ক্ষতি করেছে। মানুষের মধ্যে মানুষ যে একটা সম্রাট এই রকম একটা ভাব তৈরী করেছে। মানুষ এই বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে— এইরকম একটা মনোভাব তৈরী করেছে। মানুষ প্রকৃতিকে ভালবাসার পাত্র হিসাবে না দেখে দাসী হিসাবে দেখছে। এই কথা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। এবং প্রকৃতি আর মানুষের কাছে ভালবাসার সামগ্রী নয় সে তার দাসী, সে তার ভোগের উপকরণ মাত্র। তাই মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে। এইখানে নদীর বাঁধ বেঁধেছে, ওখানে সেতু বেঁধেছে, ওখানে কি করেছে, এইসব করতে-করতে আজকে প্রকৃতি এমন একটা অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে যা Mental Crisis। আজকে আমরা সারা বিশ্বের লোকেরা Mental Crisis-এর কথা চিন্তা করছি। রবীন্দ্রনাথ কত আগে চিন্তা করেছিলেন এই

কথাটা। তিনি যখন বৃক্ষরোপণ উৎসবের কথা বলেছিলেন, তখন বলেছেন যে প্রকৃতির বুকে যে ক্ষত আমরা সৃষ্টি করছি কৃষিকার্যের মধ্যে দিয়ে, বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে তার কিছুটা প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। শুধু কৃষিকার্যের মধ্যে দিয়ে তো ক্ষত নয়, অতখানি বেশি রবীন্দ্রনাথ দেখেনও নি, কত বেশি ক্ষত আমরা নানাভাবে তৈরী করেছি। সেই ক্ষত দূর করবার জন্য যে চিন্তা অর্থাৎ পরিবেশ উন্নয়নের চিন্তা, পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তা এই চিন্তার জন্য সবচেয়ে প্রথম যিনি চিন্তা করেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। আজ তাঁর চিন্তা কতখানি প্রাসঙ্গিক। এই দুটো কথা আমি বিশেষ ভাবে বলব যে মানব-সম্পর্কের উন্নয়ন এবং পরিবেশ-উন্নয়ন এই দুটোর জন্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তা আমাদের কাছে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। এবং তৃতীয় আরেকটা কথা হচ্ছে— উপলব্ধির কথা। রবীন্দ্রনাথ একটা বিশেষ উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। সোমেনবাবু বলেছেন যে একটা বিশেষ বোধের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সে বোধটা হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ। এখানে আমি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা এসমস্ত শব্দ ব্যবহার করছি না ইচ্ছে করে। কারণ এইসব শব্দ তুললেই সঙ্গে-সঙ্গে অনেক রকমের বিতর্ক উঠতে থাকে। কিন্তু নিশ্চয়ই আপনারা প্রত্যেকে বিশেষ-বিশেষ মুহূর্তে নিজের মনের মধ্যে উপলব্ধি করেছেন যে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ বলে একটা জিনিস আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির জিনিস। যখন আমরা এই একাত্মবোধ করি সেটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে moments of grace, তখন আমাদের সবচেয়ে আনন্দ হয় সবচেয়ে সুখ হয় সবচেয়ে শান্তি হয়। তো এই যে অনুভূতিটা গাছের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, নদীর সঙ্গে যখনি তার খুব কাছাকাছি আমরা আসি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো যখন খুব উন্মুখ হয়ে ওঠে তখন সেই উন্মুখতার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু ওর সঙ্গে মিলিত হই। ওকে আমাদের তখন জীবন্ত বলে মনে হয়। এই যে অনুভূতি তা মানুষের জীবনে একটা পরম মূল্যবান অনুভূতি। এবং আমাদের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এই অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। শুধু তাই নয় এই অনুভূতিকে আরও সূক্ষ্ম করতে হবে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার একটা খুবই উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ তো মনে করতেনই। আমার মনে হয় যে একবিংশ শতাব্দীর মানুষেরা যারা নতুন শিক্ষাবিদ্ তারা এটা মনে করবে। আজকে বিশ্বব্যাপী যে সভ্যতার সংকট দেখা দিয়েছে যে ড্রাগ অ্যাডিক্সনের কথা বললেন, আমেরিকার সত্তর ভাগ লোক ড্রাগ অ্যাডিক্সনে ভুগছে, কেন ভুগছে? না তাদের মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরী হয়েছে। তাদের নিজের মনের মধ্যে নিজেকে নিয়ে নিজের পূর্ণতা নেই। এই যে শূন্যতাবোধ— এই শূন্যতাবোধ আসলে যন্ত্রের সৃষ্টি। এই শূন্যতাবোধ আসলে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি। যখনই আমরা মিলিত হব মানুষের সঙ্গে এবং বিশ্বের সঙ্গে এবং আরও কিছুর সঙ্গে সেটা আমি জানি না, তখনই এই শূন্যতা বোধ চলে যাবে। সুতরাং এই অনুভূতিটা তৈরী করা শিক্ষার একটা বড় লক্ষ্য। এইসমস্ত দিক দিয়ে আজকে আমি একবিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতাকে খুব বিশ্বাস করি এবং খুব নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করি যে একদিন বিশ্ববাসী রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাগুলোকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে। এটা তারা যে গ্রহণ করছে না তার কারণ তারা রবীন্দ্রনাথকে জানে না। এটা আমাদের দোষ যে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে পারিনি। এই কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন

শিক্ষাসত্র

পবিত্র গুপ্ত
প্রাক্তন কর্মসচিব, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

মাননীয় সভাপতি মশাই, এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

আমি উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁরা এই শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে আগামী শতাব্দীতে মানবসভ্যতা কোন্ পথে চলবে, এই সভ্যতা আদৌ থাকবে কিনা সে সম্পর্কে আমাদের ভাববার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখি মানবসভ্যতার অন্যতম নির্মাতা হিসাবে। আমাদের সভ্যতাই যদি না থাকে তাহলে কোনও শিক্ষাভাবনা নিয়ে আলোচনা চলে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে আমাদের সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন যে সভ্যতার ভবিষ্যৎ আগামী দিনে এই বিশ্বে মনুষ্যবাসের উপযোগী ক্ষেত্র থাকবে কিনা এসব কিছুর সঙ্গে রবীন্দ্র-ভাবনা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বোলপুরকে অতিক্রম করে, বঙ্গদেশকে অতিক্রম করে, ভারতবর্ষের ভূখণ্ডকে অতিক্রম করে বিশ্বের সঙ্গে মিশে গেছেন। কাজেই শিক্ষাসত্রের কী ভূমিকা বা রবীন্দ্রভাবনার কী ভূমিকা একবিংশ শতাব্দীতে এটা বড় প্রশ্ন নয়। বড় প্রশ্ন হ'ল একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যাঁরা বিচরণ করবেন, কোন্ পৃথিবীতে তাঁরা আলো বাতাস গ্রহণ করবেন? এবং যদি সেই পৃথিবী মনুষ্য-বসবাসের উপযোগী থাকে তাহলে তাকে কেমনভাবে পরিশুদ্ধ করবেন এবং সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে সেই শতাব্দীর মানুষদের কাছে পাঠক হিসাবে থাকবেন। কাজেই আলোচনা ক্ষুদ্র পরিসরের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর পরিধি কিন্তু ব্যাপক এবং বিস্তৃত। আমি সকাল থেকে এখানে বসে-বসে অনেকগুলো অভিভাষণ শুনছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যের ভাষণ শুনলাম, বর্তমান উপাচার্যের ভাষণও শুনলাম। আমার শিক্ষক-প্রতিম অধ্যাপক সোমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর চমৎকার অভিভাষণ শুনলাম। তরুণদার বক্তৃতা শুনলাম, আর এখানকার ছাত্র অতি সংক্ষেপে নির্যাসটুকু সুন্দর ক'রে ব'লল, তাও শুনলাম। শুনতে-শুনতে আমার মনে হচ্ছিল যে এই শিক্ষা ব্যাপারটা কাদের জন্য, কীসের জন্য। আমি যেহেতু শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আছি, তাও দেখতে-দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল, আটত্রিশটা বছর, স্কুল-কলেজ শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিক্রম করে চ'লে এলাম। আমার জীবনের দুটি ঘটনা মনে পড়ছিল যখন বসে-বসে বক্তৃতাগুলি শুনছিলাম।

একটি হচ্ছে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। আমি তখন উত্তরবঙ্গের একটি প্রত্যন্ত মহকুমা শহরে একটি কলেজের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত। সেখানে একবার পণ্ডিত মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয়কে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভারতীয় দর্শনে ওঁর মত সুপণ্ডিত খুব কমই আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য অনেকে তাঁর নাম জানেন না, গ্রন্থ পড়া তো অনেক দূরের কথা। অনেকেই জানেন না যে উনি শিকাগোতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্মেলনে ১৯৩৩ সালে গিয়েছিলেন। আমি মহানামব্রত ব্রহ্মচারীকে নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে এক আলোচনা বসিয়েছিলুম। হঠাৎ বক্তৃতা করতে-করতে ব্রহ্মচারী মহাশয় ভারতীয় জীবনচর্চা এবং জীবনচর্যা, তাঁর মূল ভিত্তিগুলোর কথা বলছিলেন এবং ভারতবর্ষের কাছে ধর্ম যে জীবনেরই একটি অঙ্গ একটি পরিপূর্ণতা অখণ্ডতা— এর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। করতে-করতে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যে এই প্রিন্সিপ্যালকে যদি জিজ্ঞেস করি ওহে বাপু, তোমার কলেজে তো এত ছাত্রছাত্রী, এরা কেমন ভাল? প্রিন্সিপ্যাল সঙ্গে-সঙ্গে বলবে এবার পরীক্ষায় আমার কলেজ থেকে ৮৮% পাশ করেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে নিজের কৃতিত্বকে জাহির করার জন্য বলবে যে পাশের দুটি কলেজে পরীক্ষায় পাশের হার আমার থেকে

অনেক কম। আলিপুরদুয়ার কলেজের পাশের হার কম, কুচবিহার কলেজের পাশের হার কম। আমার কলেজের পাশের হার বেশী। তারপর মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি যদি এখন অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করি ওহে বাপু, খুব তো বড়াই করলে, তোমার ৮৮% ছাত্র পাশ করেছে, এদের মধ্যে কজন উত্তরজীবনে তার পিতামাতাকে খেতে দেবে? এদের মধ্যে ক'জন তার দুঃস্থ প্রতিবেশীর পাশে এসে দাঁড়াবে? এদের মধ্যে কজন সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎকোচ গ্রহণ ক'রবে না? এই অধ্যক্ষ কোনও উত্তর দিতে পারবে কি? আমার মনে হয় এর উত্তর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিতে পারবেন না। এই মুহূর্তে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর কোনও শিক্ষক দিতে পারেন না। কারণ আমরা ডিগ্রী অর্জনে সাহায্য করি, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ছাত্রের বন্ধু হই না। এই আমার একটি ঘটনা। পঁচিশ বছর ধরে এই ঘটনা তাড়িয়ে নিয়ে চলছে।

আর একটি ঘটনা আমার অভিজ্ঞতা। সেটা আজ থেকে প্রায় ষোল বছর আগে। তখন আমি বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকেই নানারকম যন্ত্রণা ভোগ করছে। যখন কর্মসচিব পদে যোগদান করলাম '৮২ সালে, তার কিছু পরেই ওখানের একটি ফ্যাকাল্টি বন্ধ। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী মহা উদ্যোগ তৈরী করে তাঁরা এমন কাণ্ড করলেন যে পশু-বিজ্ঞান পশু-চিকিৎসার যে শাখা তার কোনও পড়াশুনা হচ্ছে না, মাসের পর মাস। এই নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একটি সভা ডাকা হ'ল মহাকরণে এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেইসময় বিদেশে ছিলেন। তারিখ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন নি, তাই প্রবীণ সদস্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিনয়দা, সভায় সভাপতিত্ব করলেন। তাঁর সঙ্গে আরো দুজন মন্ত্রী একজন কৃষিমন্ত্রী, একজন পশুপালন দপ্তরের মন্ত্রী এবং সেখানে শিক্ষকদের প্রতিনিধি ছাত্রদের প্রতিনিধি আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপাচার্যের সঙ্গে আমি উপস্থিত। হঠাৎ একজন অধ্যাপক বলে উঠলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও Standard education নেই। এখানে অনেকে উপস্থিত আছেন যাঁরা বিনয়দাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। বিনয়দা খুব মৃদু স্বভাবের লোক, কখনো উত্তেজিত হন না, কটু কথা বলেন না। আমি দেখলাম বিস্ময়ের সঙ্গে, বিনয়দা সেদিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হঠাৎ তিনি সেই মাস্টার মশাই-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ব'ললেন আপনি? বললেন ভূপতিদার নাম শুনেছেন? ভূপতি মজুমদার। আমরা রাজনীতিতে যখন দীক্ষা নিয়েছিলুম তখন মাস্টার মশাই ছিলেন আমাদের মহাগুরু আর তারপরেই ছিলেন ভূপতিদা। যখন বিধানসভার প্রথম সদস্য হয়ে এলুম বিধানসভায় বিরোধী দলের লোক, ভূপতিদা তখন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী। ভূপতিদা একটা কমিটি করলেন তার নাম দিলেন Standardisation Committee অর্থাৎ শিল্পসামগ্রী যে উৎপাদিত হবে তার মান নির্ণয় ক'রবে সেই কমিটি। ওদের সেই কমিটিতে ভূপতিদা আমাকে সদস্য করলেন। প্রথম সভা ডাকলেন মহাকরণে, সেখানে গেলাম। ভূপতিদা বিভিন্ন expert-রা যা বললেন সমস্ত কিছু শুনলেন। ঠিক হ'ল কীভাবে Standard product করা হবে। সবাই চলে গেলেন। ভূপতিদা বিনয় চৌধুরীকে বললেন, বিনয় তুমি একটু বস। ভূপতিদা বলছেন, বিনয় ওরা তো Standard product এর মানদণ্ড ঠিক করে দিয়ে গেল, কিন্তু যে শ্রমিক কারখানায় উৎপাদন ক'রবে সে যদি Standard না হয়, তাহলে Product standard হবে তো? যদি নিষ্ঠার সঙ্গে তার শ্রমকে দান না করে, কাজে যদি ফাঁকি দেয়, গাফিলতি থাকে, তাহলে Product standard হবে তো? Standard শ্রমিক ছাড়া Standard product হয় না। বিনয় চৌধুরী কথাটি বলেই বললেন, Writers' Building-এ যেদিন থেকে মন্ত্রী হয়েছি যখন lift-এ উপরে উঠি, এই বারান্দা দিয়ে হাঁটি আমার সামনে যেন ভূপতিদার ছায়া হেঁটে যায়। Standard product, Standard শ্রমিক। তখন মাস্টার মশাই-এর দিকে তাকিয়ে বললেন : Standard শিক্ষক ছাড়া কি Standard education হয়? আপনি কি Standard শিক্ষক?

আপনারা নিশ্চয় ব'লতে চাইছেন যে এই দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি কী বোঝাতে চাই বা কী বুঝতে চাই?

রবীন্দ্রনাথ মানুষ তৈরী ক'রতে চেয়েছিলেন। যে মানুষের সঙ্গে সমাজের যোগ থাকবে, যে মানুষের সঙ্গে বিশ্বের যোগ থাকবে, প্রকৃতির যোগ থাকবে, সেই মানুষ নির্মাণ ক'রবেন কারা? সেই মানুষ নির্মাণের স্থপতি হবেন কারা? সেই স্থপতি নির্মাণের যে কর্ম এবং তাদের যে কর্ম-সম্পাদনার বৃহৎ পরিবেশ, তা যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি তাহ'লে হাজার রবীন্দ্রনাথের ভাবনার উপর সেমিনার করি না কেন, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত সেই মানুষ কিন্তু নির্মাণ হবে না। আমাদের মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শিক্ষাভাবনা গড়ে উঠেছিল তাঁর সমাজচেতনা থেকে, তাঁর স্বদেশভাবনা থেকে এবং রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা বিশ্বভাবনার সঙ্গে যুক্ত, সেই বিশ্বচেতনা এবং সমাজচেতনা স্বদেশচেতনা তার একটি অঙ্গ হিসাবে তাঁর এই শিক্ষাভাবনা। কারণ রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিল আগামী দিনের মানুষ এবং পৃথিবী আর পশ্চাতে ছিল হাজার-হাজার মানুষের উত্তরাধিকার এবং গর্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন এই প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিদের, যাঁরা তাঁদের জীবনচর্চা এবং জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে যে বিরাট সম্পদ বিশ্বকে দান করেছেন সেই সম্পদকে আমরা যদি অঞ্জলি পেতে গ্রহণ ক'রে আবার ছড়িয়ে দিতে পারি বর্তমান পৃথিবীর মানুষের মধ্যে, তাহলে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের নবজাগরণ ঘটবে। যে মানুষ মুক্ত মানুষ হিসাবে শুধু নিজেকেই পূর্ণ করবে না, অন্য মানুষকেও পূর্ণত্বের সন্ধান দেবে। রবীন্দ্রনাথের গোটা শিক্ষাভাবনা এই বস্তুকে কেন্দ্র করে, তার জন্য দরকার সমাজকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসা যেটা সোমেনদা বলে গেছেন, সংবেদনশীল হতে হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ সংবেদনশীল ছিলেন এবং ভাবতে আমার অবাক লাগে যে এই আমাদের পুণ্যভূমিতে মাত্র এগার বছরের ব্যবধানে চারজন পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা মোটামুটি বিশ্বনির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রপথিক এবং তাঁদের ভাবনা কাছাকাছি। অনেক মতপার্থক্য আছে, পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ আছে, কিন্তু এই চারটি মানুষ এগার বৎসরের ব্যবধানে আবির্ভূত হয়ে স্বদেশ-নির্মাণ, বিশ্ব-নির্মাণ, সভ্যতা নির্মাণের জন্য যে উপকরণ রেখে গেছেন আমাদের জন্য তার কোনও তুলনা হয় না এবং এদের মধ্যে দুজন জন্মেছিলেন কলকাতায় পাশাপাশি দুটি পাড়া একটা সিমলে পাড়া আর-একটা জোড়াসাঁকো একজন জন্মেছিলেন খুব বড়লোকের ঘরে এবং একটা অভিজাত ঘরে, নবজাগরণের যাঁরা স্রষ্টা সেই পরিবারে। আর একজন ইংরেজী শিক্ষিত এ্যাটর্নি পরিবারে এবং দু'বছরের ব্যবধানে। কিছু মানুষের মধ্যে কিন্তু এই ভারতবর্ষের প্রাণসম্পদ বিতরণ করার ক্ষেত্রে মানুষকে ভালবাসার ক্ষেত্রে একেবারে কাছাকাছি। ১৮৯০ সালে স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দুনিয়া জয় করে স্বদেশে ফিরলেন, তখন মাদ্রাজের শিষ্যরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। উত্তরে স্বামীজী বললেন, "হে মাদ্রাজের যুবক সম্প্রদায় তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ তোমাদের কোটি-কোটি প্রতিবেশী দু'বেলা খেতে পায় না, তারা নিরন্ন। তোমরা কি জানো যে তাদের কোনও আশ্রয় নেই, পরিধেয় বস্ত্র নেই, চিকিৎসার সুযোগ নেই। তারা নিরক্ষর, কুসংস্কারের জালে আবদ্ধ। তাদের এই বেদনা, তাদের এই দুঃখ তোমার মধ্যে দুঃখের সঞ্চার করে তো? তুমি এদের জন্যে কাঁদো তো? যদি এদের জন্যে তুমি কাঁদো তাহ'লে এগিয়ে এসো। মাভৈ, ঈশ্বর তোমার সহায়। একেবারে মানুষের দুঃখে বেদনায় বিগলিত প্রাণ, কেঁদে ফেললেন এবং কান্না বিমোচনের জন্য তাঁর সংগ্রাম। তাই স্বামীজী জাতি নির্মাণের জন্য, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য যেমন ডাক দিয়েছিলেন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তাকে— উত্তরণের জন্য জাগিয়ে দেওয়ার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। সমস্ত জগৎকে একটা পরিবারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভাবনা নিয়ে অমৃতস্য পুত্রা, তোমরা শোন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। চরৈবেতি, চরৈবেতি, আমরা এগিয়ে যাব আমরা থামব না। সভ্যতাকে নির্মাণ করব। এ কটি কথা বলে, আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের অনুলিখন

আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা

মোহিত চক্রবর্তী
অধ্যাপক, বিনয়ভবন, বিশ্বভারতী

শিক্ষার গোড়ার কথাই হল শীলিত বীক্ষণ। সে-হিসেবে শিক্ষার ভূগোল অসীম। এ শীলিত বীক্ষণের প্রেক্ষিতে কাজ করে যায় যুগপৎ বা সমন্বয়হীনভাবে জানা বোঝা দেখা শোনা অনুভব করা প্রশস্তির সম্পদে মূল্যায়ন করা। শেষটায়, এ সবেরই প্রার্থিত লক্ষ্য হল শীলায়নিক ভঙ্গিতে প্রকৃষ্ট প্রকাশমানতায় উত্তরণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-ভাবনায় যাকে বলেন 'প্রৈতি', সে 'প্রৈতি'র উপকরণ হিশেবে এ-সবের শুদ্ধিকরণই শিক্ষার আদর্শ হিসেবে কাজ করে যায়। কাজ করতেই শতেক বাধা। যোজন-যোজন পথ পরিক্রমা। পাহাড়-প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা, যাদের অন্য নাম সন্দেহ, অবিশ্বাস, যাচাই। ইদানিং প্রাসঙ্গিকতা। কোন্ বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার কথা আলোচনীয় হ'তে পারে, কোন্ বিষয়ের না—এতে যদি সন্দেহ, অবিশ্বাস, যাচাই-এর সমূহ প্রশ্ন আমাদের ভিতরে নাড়া দিয়ে যায়, দানা বেঁধে ওঠে তাহলে অন্তত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশই থাকে না— সে আগামী বা আগামীর আগামী শতাব্দীই হোক না কেন। কেননা, রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদী শিক্ষাদর্শের পথিকৃৎ। সুতরাং, প্রথমেই ব'লে রাখা প্রয়োজন : আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতায় বর্তমান লেখকের কোনো সন্দেহ, অবিশ্বাস বা অনাস্থা নেই।

এবার রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষাসত্রের ভূমিকার বিষয়ে আসা যাক। অনুরাগী ও শিক্ষাসচেতন অনেকেই জানেন, শিক্ষাসত্র রবীন্দ্রনাথের বড়ো আন্তর সৃষ্টিশীল অনুভূতির বর্ণমালার প্রকাশক 'প্রাণীন্' শিক্ষাশালা। বলা বাহুল্য, প্রাণীন্ কথাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথের ব'লেই এ শিক্ষাশালার ভিন্নতা, ব্যাপকতা ও সংবেদনশীল বৈভবের ভূমিকা এ শতকের ক্রান্তিলগ্নে নতুন ক'রে ভেবে দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন শিক্ষাসত্রের শিক্ষাদর্শ প্রসারণে একটি অবহেলিত, অনুপস্থিত অনভিপ্রেত সত্যের যথোচিত সম্মাননা তা হচ্ছে : এ শিক্ষাশালা কবির শিক্ষাশালা, রবীন্দ্রনাথ যাকে আলাদা করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে নামকরণ করেছেন 'A Poet's School'. আসন্ন নতুন শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনার আলোকে শিক্ষাসত্রের ভূমিকার বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সকল স্তরের শিক্ষায় এ সত্যটিকে স্মরণ রেখে শিক্ষা কেমন ক'রে সার্থক ব্যক্তিক ও সামাজিক বিকাশমানতায় অর্থবহ ও প্রাণীন্ হতে পারে তা গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের আলোকে শিক্ষাসত্রের যে ভূমিকার কথা নতুন শতকের প্রেক্ষিতে স্মর্তব্য তার জন্যে শিক্ষাসত্রের শিক্ষাসূচীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যটি যদি গভীরভাবে বিবেচিত হয় তাহলেই শ্রেয়। সেটি হচ্ছে এ শিক্ষাশালা হবে এমন শিক্ষাশালা যেখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা গ্রামে-গ্রামে নেতৃত্বের পরিচয় রাখবে, রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের নতুন রূপায়ণে সনিষ্ঠ হয়ে নতুন দেশ গড়বে। গতানুগতিক 'কেজো', কিছু 'পাইয়ে দেবার', পুঁথির বুলিসর্বস্ব 'জাঁতাকলের শিক্ষা' বা 'দশটা-পাঁচটার আন্দামানে'র নিষ্করুণ নির্জীব নিরানন্দময় শিক্ষা—বলা বাহুল্য, এ সবই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার উত্তর-শ্রুতি—তখনই পরিবর্তিত হ'তে পারে যদি শিক্ষায় আসে সংবেদনশীল সর্বজনীনতার জোয়ার এবং এ জোয়ার আসবে পল্লীতে-পল্লীতে শিক্ষাবঞ্চিত যুবকদের তরফ থেকে যাদের ভিতরে সুপ্ত হয়ে আছে বিস্ময়কর অন্তহীন শক্তি ও শিক্ষাসাধনার বীজ। এদের কার্যকরী ব্যবহারিক ও প্রাণদ শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারলে এরাই নতুন গোষ্ঠীচেতনার জোয়ার গ্রামে-গ্রামে এনে দেবে। এ প্রাণদ শিক্ষার জন্যেই শিক্ষাসত্র। রবীন্দ্র-শিক্ষানুরাগী দেশিকোত্তম প্রাপ্ত মারজোরি সাইক্স্-এর ভাষায় :

'Rabindranath knew that some of the most intelligent boys ought to have more education

than they could obtain there, so as to be really useful in their villages'.এই অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষা বা 'more education-এর জন্যেই যে শিক্ষাসত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের ঈঙ্গিত নতুন শিক্ষাশালার শুভারম্ভ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি বক্তব্য বারেবারে ভেবে দেখা দরকার। একটি হচ্ছে ঃ 'The tradition of the community which calls itself educated, the parents' expectations, the upbringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official university, were all overwhemingly arrayed against the idea I had cherished.' দ্বিতীয়টি :'... I waited for men and the means to be able to introduces into our school an active vigour of work, the joyous exercise of our inventive and constructive energies that help to build up character and by their constant movements naturally sweep away all accumulations of dirt, decay and death. In other words, I always felt the need of the western genius for imparting so my educational ideal that strength of reality which knows how to clear the path towards a definite and of practical good.'

উপরোক্ত রবীন্দ্রনাথের দু'টি বক্তব্য স্মরণ রেখে আগামী শতকে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-শিক্ষাভাবনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা তুলে ধরা যেতে পারে :

(অ) আমরা যে জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-ঐতিহ্যের অধিকারী সে-ঐতিহ্য থেকে যে রবীন্দ্রনাথ সরে আসতে চেয়েছেন এবং যে-কারণে কবির শিক্ষাশালা অর্থাৎ শিক্ষাসত্রের জন্ম, আগামী দিনে শিক্ষাসত্র কি সে-ভূমিকা থেকে সরে আসবে, নাকি জনগোষ্ঠীর ধরাবাঁধা চলছে-চলুক মেরুদণ্ডহীন শিক্ষা-ঐতিহ্যের নামগোত্রহীন চেতনা-লাজুক ঐতিহ্যের শিকার হবে?

(আ) রবীন্দ্রনাথ 'parents' expectations' বা অভিভাবক-অভিভাবিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মর্মভেদী, তীক্ষ্ণ, প্রচ্ছন্ন অথচ যথার্থ যে মন্তব্য করেছেন, শিক্ষার সার্বিক কর্মকাণ্ডে তথাকথিত শিক্ষা-সচেতন ও শিক্ষা-অনুরাগী অভিভাবক-অভিভাবিকার শিক্ষার সংসার সম্পর্কিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভাবনা ও উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষার দাপট ও বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষাসত্র এক আগামী দিনে'The Poet's school-এর প্রার্থিত স্বাভিমান ও গৌরব বজায় রাখতে পারবে?

(ই) রবীন্দ্রনাথ 'upbringing of the teachers' এর মাধ্যমে শিক্ষাদানে শিক্ষকদের গড়ে ওঠার মানসিকতার ও স্পষ্টত সমাজসচেতনতার অনুকূল ভাবমূর্তিতে সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের প্রকাশমানতা ও অনুক্ষণ নিবিড় চর্চার যে ইশারা দিয়েছেন, সেই ইশারাকে সশ্রদ্ধ স্মরণে রেখে শিক্ষক-শিক্ষণ কি নতুনতর ধারায় শিক্ষাসত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে? যদি তা হয়, তাহলে তা কেমন করে প্রযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সে-ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন তার জন্যে অবাধ, উদার, সনিষ্ঠ ও ধনাত্মক কর্মসূচী গ্রহণে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা সমাজ কি তৈরি? এ প্রসঙ্গে পূর্বাহ্নিক সতর্কতা হিসাবে কয়েকটি উপপ্রশ্ন রাখা যেতে পারে :

ই$_১$: এই'upbringing of teachers' এর জন্যে প্রকৃত যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাবে তো?

ই$_২$: যে-সব শিক্ষক-শিক্ষিকা এ-কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবেন, তাঁদের কী ধরনের যোগ্যতা প্রার্থিত?

ই$_৩$: এ-কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকাদের শিক্ষাসত্রের বাইরে অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে?

ই$_৪$: জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচীতে এ ধরনের'upbringing of teachers' এর ভূমিকা কী হবে এবং তার অবদান গ্রহণযোগ্য হবে কি?

এই শেষোক্ত উপপ্রশ্নটি শিক্ষাসত্রের জন্মলগ্নে রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিত করে তুলেছিল, যে কারণে তিনি 'the

claim and the constitution of the official university'-র কথাটি ধ্রুপদী সত্যের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন এবং তার জাঁতাকলে প'ড়ে তাঁর প্রিয় 'The Poet's school' সাম্প্রতিককালে আর পাঁচটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এমনকি শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রথম বিদ্যালয় থেকে খুব কমই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে। বলাবাহুল্য, প্রায় নিঃসঙ্গ অথচ দৃঢ়চেতা রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্রের শিক্ষাযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে তোয়াক্কা না করেই এবং সেক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন লেনার্ড নাইট এল্‌ম্‌হার্স্ট, ধীরানন্দ রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, পি. সি. লাল প্রমুখ কৃতী শিক্ষা ও সমাজ-সচেতন কর্মী, যদিও উত্তরসূরীর অক্লান্ত নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল নিদর্শন শিক্ষাসত্র এ-শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই স্বধর্ম-চ্যুতির শিকার হল। শংসাপত্র-প্রেমিক আখড়ায় শিক্ষাসত্র যেদিন নাম লেখাল সেদিন থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের বিশেষ করে বিশ্বভারতীর সবার একই ভাবনা-জিজ্ঞাসা : আবার কি শিক্ষাসত্র তার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মলগ্নে উনিশ'শো চব্বিশ-এর পয়লা জুলাই-এর উচ্চারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ফিরে যাবে? আমাদের ঠকে ও ঠেকে শিক্ষার গোলকধাঁধায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আমাদের সক্রিয় ও সনিষ্ঠ সমর্থন আছে কি না তার উপরেই আগামী শতকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতার অনেকটা নির্ভর করে না কি? ধরা যাক, শিক্ষাসত্র আবার হৃত-গৌরবে ফিরে আসার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেক্ষেত্রেও সমাজ ও ব্যক্তিমানসের বিবর্তন ও পুনরুজ্জীবনের ক্রূর-জটিল বিষয়টিকে মনে রেখে নবতর প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণে যথোপযুক্ত প্রাক্‌-সচেতনতা ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া কাঙ্ক্ষিত নয় কি? আবার সেই পুরনো ভাবনাগুলোই কিন্তু মৃত্যুশেল হয়ে আসবে যে ভাবনাগুলোর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন community-tradition বা গোষ্ঠী ঐতিহ্য, 'parents' expectations'বা শিক্ষাবিষয়ে অভিভাবক-অভিভাবিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি তির্যক অথচ সত্য প্রকাশমালায়। তবু স্বীকার্য : আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শকে সর্বত্র-লভ্য ও প্রাসঙ্গিক ক'রে তোলার সুবিশাল কর্মকাণ্ডে শিক্ষাসত্র পথিকৃতের ভূমিকা নিতে পারে এবং সে-ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী ভেবে দেখা ও যথেষ্ট সতর্কতার মাধ্যমে রূপায়িত হ'তে পারে ঃ

(ক) 'গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তির অনুকূল বিকাশ ও বর্ধনে মানসিক শক্তি, চিত্তের প্রসার ও বলিষ্ঠতা লাভে শিক্ষার সর্বতোমুখী চর্চায় শিক্ষাসত্র শিক্ষা ও জীবনকে নতুনতর মেলবন্ধনে উদ্যোগী হতে পারে। বলাবাহুল্য, ১৮৯৫-এ লেখা 'শিক্ষার হেরফের' নিবন্ধ যা শিক্ষাসত্রের নাভিমূল এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলে অভিহিত হতে পারে, তার পুনরুজ্জীবনে সবদিক থেকে সচেতনতা একান্তভাবে কাম্য। তবে সঙ্গে-সঙ্গে একথাও স্বীকার্য : এ ধরনের শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষা-অনুশীলনে কয়েকটি প্রশ্ন সরাসরি ও স্পষ্ট উত্তরের অপেক্ষা রাখে :

(এক) শিক্ষাসত্রের শিক্ষাসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কতটা সমর্থন মিলবে সরকারী/বেসরকারী তরফ থেকে?

(দুই) এ ধরনের শিক্ষার প্রায়োগিক দিক সমাদরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হবে তো?

(তিন) শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পঠনীয় বিষয় পাঠক্রম মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে প্রথানুসারী শিক্ষার সম্পর্কই-বা কেমন হবে?

(খ) শিক্ষায় স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবনা বিকাশের শিক্ষায় শিক্ষাসত্র সৃজনধর্মী বিভিন্ন শিক্ষাপ্রকল্প নিতে পারে। তাতে স্বয়ম্ভরতার শিক্ষার আবার নতুন পরিবেশ সংযোজিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির যুগপৎচর্চায় শিক্ষাকর্মকাণ্ডের নতুন-নতুন সরণি বেছে নেওয়া যেতে পারে।

(গ) শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধে শিক্ষাসত্র গ্রামীণ শিক্ষাপ্রসারে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের রূপায়ণে আগামী শতকে শিক্ষাসত্র প্রকৃত 'কবির শিক্ষাশালা' বলে শংসিত হোক, হোক নিবেদিত প্রাণ, শিক্ষা হোক আনন্দ, প্রজ্ঞান, বিনয়, অনুরাগ ও মুক্তির পাদপীঠ। শিক্ষাসত্রের পঞ্চসপ্ততিবর্ষের জন্মলগ্নে রবীন্দ্র-বাণীতে উচ্চারিত হোক বিধাতার কাছে আমাদের প্রার্থনা :

'হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।'

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাসত্র

পাপিয়া গুরুং
নবম শ্রেণী, শিক্ষাসত্র

মাননীয় সভাপতি এবং সভায় উপস্থিত সকলকে প্রণাম জানিয়ে আমার পাঠ শুরু করছি।

কবি তপোবনের শিক্ষাকেই মূলত প্রাধান্য দিয়েছিলেন। প্রকৃতির সঙ্গে অবাধ মিলনের মধ্যে দিয়েই ছাত্ররা শিক্ষা পাবে, তাদের চরিত্র গড়ে উঠবে— এই ছিল কবির ইচ্ছা। প্রকৃতিই হবে ছাত্রদের প্রথম শিক্ষক।

ভারতবর্ষে বৈদিকযুগে শিক্ষার পীঠস্থান ছিল তপোবন। তপোবনে গুরুর আশ্রমে নানারূপ কাজকর্মের দ্বারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠত ছাত্ররা। কবি বলেছেন, "আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।"

ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের কেবলমাত্র স্কুল-কলেজে পাশ করতে আর সরকারী অফিসে চাকরী গ্রহণ করার উপযুক্ত করে তুলত। কবি বাল্যকালে নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা সে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। নিজের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মবিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়ে প্রাচীন তপোবনের রূপ পরিস্ফুট হয়েছিল। আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। আশ্রমবিদ্যালয়ের মূল আদর্শ ছিল ঃ

"শিক্ষাকে জীবনের অঙ্গ হতে হবে। জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক নির্বস্তুক কিছুতে পরিণত হওয়া উচিত নয়।"

অপরদিকে গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা উভয়ই ছিল রবীন্দ্রচিন্তার অপর বিষয়। শিলাইদহে পতিসরে জমিদারির কাজ করার সময় কবি গ্রাম ও গ্রামবাসীদের সংস্পর্শে আসেন। কবি প্রত্যক্ষ ক'রলেন গ্রামবাসীদের দৈন্যদুর্দশাগ্রস্ত করুণ অবস্থা। তাদের আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে গেছে। তারা কুসংস্কারের জালে জর্জরিত। গ্রামের মানুষদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার-মোচনের সংকল্প নেন কবি। তিনি সেখানে নানাভাবে কাজকর্ম শুরু করেন। কিন্তু তিনি পদে-পদে বাধাপ্রাপ্ত হন। সেদিন গ্রামের মানুষের অশিক্ষা তাদের উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকায় পাঠালেন কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শিখে আসার জন্য। এইরকম নানাভাবে চেষ্টা ও চিন্তা ক'রতে লাগলেন তিনি।

এইসময়ে তিনি সুরুলের নিকট একটি বাড়ী ক্রয় করলেন। ভেবেছিলেন শিলাইদহে যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, এখানেও তাই করবেন। এই কাজে কবির বন্ধু লেনার্ড নাইট এল্‌ম্‌হার্স্ট মহাশয় তাঁকে অত্যন্ত সাহায্য করেন। তিনি এই জায়গায় স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলেছিলেন। এল্‌ম্‌হার্স্ট মহাশয়ের স্ত্রী ডরোথি স্ট্রেইটের আর্থিক সহায়তায় এর কাজ অনেকখানি এগিয়ে যায়।

শুধুমাত্র গ্রামবাসীর উপকার করলেই গ্রামের সার্বিক উন্নতি ঘটবে না, কবি একথা সহজেই বুঝেছিলেন। গ্রামবাসীর মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে, অশিক্ষার অন্ধকারকে তাড়াতে সচেষ্ট হন। আত্মসচেতন ক'রে তোলাই হবে শিক্ষাদানের প্রথম পদক্ষেপ। কবি বলেছেন :

"আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করব একটি বা দুটি ছোট গ্রাম...। আমি যদি কেবল দুটি-তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমস্ত ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরী হবে।"

পল্লীর শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে কবি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। আবার নানা কারণে আশ্রমবিদ্যালয়ের

যে ছবি কবি কল্পনা করেছিলেন তা ব্রহ্মবিদ্যালয়ে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। কবির মনে পূর্ব থেকেই খেদ ছিল। তাই তিনি দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। শিক্ষাসত্রের দায়িত্ব নেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। তাদের জন্যই কবি এই দ্বিতীয় বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন যাদের পরীক্ষায় পাশ ক'রে অফিসে চাকরী করার কোনও তাগিদ নেই। তাই তারা কবির আদর্শকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, যা তাদের কাজেকর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রাচীন তপোবনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ছাত্রদের নিকট হতে কোনও প্রকার বেতন নেওয়া হত না। তারা নিজেরাই সকল কাজকর্ম করত।

কবি প্রথম থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, শিক্ষাসত্রের শিক্ষা হবে গ্রাম-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, গ্রামের মানুষদের জীবিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রধানত হবে হাতে-কলমের শিক্ষা। এর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার যে পুঁথিগত অংশটি থাকবে সেটি হবে পরীক্ষামুক্ত। কেবল পরীক্ষার জন্যই ছাত্রদের প্রস্তুত করার কবি ঘোর বিরোধী ছিলেন। কবি বলেছেন :

"... গ্রামবাসীদের জন্য একটি বিশেষ ইস্কুল খোলা হয়েছে। এই তফাতটা কেন করলাম এ প্রশ্ন আপনারা করতে পারেন। উচ্চশ্রেণীর লোকেদের জন্য যে ইস্কুল, গ্রামের ছেলেমেয়েদের কেন সেখানে পড়তে দিলাম না? তার কারণ অপেক্ষাকৃত ধনী ঘর থেকে যারা আসে তারা সবাই জীবিকা-নির্বাহের জন্য পরীক্ষা পাশ করে ডিগ্রী নিতে উৎসুক। তাই তাদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

... সেই কারণেই আমি আরেকটি ইস্কুল খুলি। সেটি গ্রামের যাদের সরকারী বা সওদাগরী অফিসে চাকরীর উচ্চাশা নেই তাদের জন্য। এই অপর ইস্কুলটিতে পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য যা কিছু আমি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করি তা প্রবর্তনের চেষ্টা করছি। অনতিকাল পরে এই গ্রামের ইস্কুলটি সত্যিকার আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠবে, অন্যটি পাবে অবহেলা।" কবি বলেছিলেন : "আমার জীবনে যে দুটি সাধনা, এখানে হয়তো তার একটি সফল হবে।"

কবির জীবনের দুটি সাধনা হল গ্রাম-উন্নয়ন ও তপোবনের আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন করা। শিক্ষাসত্র তাঁর এই দুই সাধনার সাধন-ক্ষেত্র। এখানে যেমন স্থাপিত হয়েছে আদর্শ বিদ্যালয়, তেমনই শিক্ষাসত্রই গ্রাম-উন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করেছে।

বিষয় : আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।

স্বপন মজুমদার
অধ্যক্ষ, রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী

শ্রদ্ধেয় সোমেনদা, আমার সতীর্থ সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রী। আমি আজ খুব সংকোচের সঙ্গে আপনাদের সামনে এসেছি কারণ গতকালের আলোচনায় আমি উপস্থিত থাকতে পারি নি। ফলে আমি হয়ত যে দু-একটি কথা বলব সে-কথাগুলো আপনাদের অনেকেরই জানা, হয়ত আলোচনাও হয়েছে কাল থেকে। ফলে যদি পুনরুক্তি ক'রে ফেলি সে জন্য আগে থেকেই আপনাদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

এই আলোচনাচক্রের বিষয় বলা হচ্ছে, আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা। যখন 'প্রাসঙ্গিকতা'র কথাটা আমরা বলছি, তখন এই-যে বাক্যাংশ গঠন করা হচ্ছে, ভাষার দিক থেকে এর মধ্যে একটা সংশয় লুকিয়ে থাকে। অর্থাৎ এই প্রয়োগের মধ্যে, এই বাক্য-নিবন্ধের মধ্যে ভেতরের একটা অনুস্যূত সংশয় আছে যা এই নামের মধ্যে ধরা পড়ে। আপনারা অনেকেই মনস্তাত্ত্বিক ভাষাতত্ত্বের কথা জানেন, সেখানে এর ব্যাখ্যা পাবেন। যখনই আগামী শতাব্দীতে 'রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শে'র প্রাসঙ্গিকতার প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে তার মানে কোথাও সংশয় থাকছে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ আগামী শতাব্দীতে প্রাসঙ্গিক না-ও হতে পারে। ফলে, আমি একটু, প্রায় বলতে গেলে, উল্টো দিক থেকে আমার কথা শুরু করছি। স্মরজিৎবাবু এবং সোমেনদা আমায় মার্জনা করবেন।

এই শব্দচয়নের মধ্যে একটা সংশয় তাহলে আছে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ আমরা মেনে নিচ্ছি খুব ভালো ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু আগামী শতাব্দীতে সেটা কতদূর প্রাসঙ্গিক এটা নিয়ে তাহলে আমাদের মধ্যে সংশয় আছে, সংশয় আছে ব'লেই আলোচনা করতে বসেছি। আরেকটা বাক্যাংশে আছে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শ। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, যখন রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে আপনার শ্রেষ্ঠ গুণ কী? তিনি বলেছিলেন, 'স্ববিরোধ'; যখন বলা হয়েছিল আপনার দুর্মর দোষ কোন্‌টি? বলেছিলেন, 'স্ববিরোধ'। এ-কথাটা কিন্তু শুধু একটা শেভিয়ান পারিপাট্য নয়। এ-কথাটার একটা গূঢ় সত্য আছে ব'লে আমি মনে করি। একজন কবিই এ-কথা বলতে পারেন। একজন কর্মী এ-কথা বলতে পারেন না। এ-কথা গান্ধী কখনও বলতে পারতেন না, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বলতে পারতেন। কারণ রবীন্দ্রনাথ কবি, গান্ধী মূলত কর্মী। শুধু এই প্রসঙ্গে নয়, অন্য প্রসঙ্গও আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে। দিলীপকুমার রায়কে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন, যখন দিলীপকুমার রায় তাঁকে নানাভাবে প্রায় বিব্রত ক'রে তুলছেন গানের সুর, গায়কের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে— রবীন্দ্রনাথ একটা চিঠি শুরুই করছেন, "মত বদলেছি, বহুবার মত বদলেছি..."।

এই রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু আমরা খুব একটা জানবার চেষ্টা করি না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের সময়ও কিছু অনড় মতের সমষ্টিমাত্র ছিলেন না। একজন মানুষ যিনি প্রোটিউসের মতো প্রায় পরিবর্তনশীল, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে পরিবর্তন করেছেন, এবং পরিবর্তন করেছেন ব'লেই তিনি এত বড় আমাদের কাছে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে একজন মানুষ শুধু নিজেকে সৃষ্টি করছেন এবং নির্মাণ করছেন। একেই প্রতিভা বলা হচ্ছে। তিনি যে শুধু 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' ব'লে তাঁকে প্রতিভা বলা হচ্ছে তা নয়, তিনি আত্মনির্মাণও করছেন। আত্মসৃজন করছেন এবং সেই আত্মশক্তি তাঁর আছে। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা সবাই বলি। কিন্তু যখন তাঁর শিক্ষাদর্শের কথা বলা হয়, এটা ঠিকই যে তার কয়েকটা সামান্য লক্ষণ ও সাধারণ ধর্ম আছে; কিন্তু, আমরা যদি একটু খুঁটিয়ে পড়ি বা পড়ার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পাব, ধরা যাক, ১৯০১ থেকে যখন তিনি তাঁর শিক্ষাধারণাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন, তখন থেকেই, ১৮৯৮-এর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের কথা যদি বাদও দিই, তাহলে তো আমরা সত্যি বলতে পারব, যে ১৯০১-এ ঠিক যেভাবে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কথা ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় চ'লে যাওয়ার পরও কি ঠিক তাই ভাবলেন? মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন চিঠি

লিখছেন তখন যে-কথা ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন মতের পার্থক্য, প্রায় বিচ্ছেদ এনে দিচ্ছে, রামানন্দ ছেড়ে দিচ্ছেন বিশ্বভারতীর দায়িত্ব, তখন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ অভিন্ন আছে? অর্থাৎ, আমি যে-কথাটা বলতে চাইছি, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার এই ধারণা বা আদর্শ এ-ও কিন্তু একটা জায়মান আদর্শ। এ কোনও স্থাণু, অনড় আদর্শ নয়। অর্থাৎ একজন ১৯০১ সালে তাঁর চিন্তার কতগুলো সূত্র তৈরি ক'রে ফেললেন এবং '৪১ সাল পর্যন্ত সেগুলিকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন, রবীন্দ্রনাথ সে-ধরনের মানুষ ব'লে আমার মনে হয়নি।

আমার মনে হয়েছে, তিনি এমন একজন মানুষ যিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তাঁর নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এ-কথা তাঁর সাহিত্যের যারা পাঠক তাদের পক্ষে মেনে নেওয়া বা বোঝা খুব সহজ; কারণ আমরা জানি ভাষায়, ছন্দে, প্রকরণে কীভাবে তিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে ভাঙছেন। একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। রবীন্দ্ররচনাবলী যখন বেরোচ্ছে তখন 'মানসী'র ভূমিকায় তিনি বলছেন যে, এই সেই প্রথম বই যেখানে কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিল, এই কথা আমরা পরের প্রায় পাঁচটা বই সম্বন্ধেও বলতে পারি। আমরা বলতে পারি, 'পুনশ্চে'র ক্ষেত্রেও এরকম অনেকটা পরিবর্তন এল। আমরা বলতে পারি, তার আগে 'বলাকা'তেও এরকম একটা পরিবর্তন এসেছে। তার আগে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'তেও একটা পরিবর্তন এসেছে। কেউ হয়ত সেটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলবেন 'খেয়া'তেও একটা পরিবর্তন এসেছে। আসলে শিল্প ও শিল্পীর ধারণা ও ভূমিকাই বারবার বদ্‌লে গিয়েছে তাঁর কবিজীবনে। ফলে সাহিত্যেও যেমন তিনি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনমুখী ছিলেন, তেমনি তাঁর চিন্তাও একান্ত পরিবর্তনশীল ছিল। পরিবর্তনশীলতাকে আমি তাঁর একটা মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করি।

তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে আদর্শটা অনড় নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে মনে হয় যে বাস্তব অবস্থাটাকে অনুধাবন করার যে-কাণ্ডজ্ঞান, তাও তাঁর মধ্যে আছে। আছে যে তার প্রমাণ, এই যে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আপত্তি সত্ত্বেও। তিনি কিন্তু তাঁর নিজের আদর্শটাকে একান্ত ক'রে আঁকড়ে থাকতে চান নি, প্রতিষ্ঠানের জন্য এতজনের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি আপস করবার সাহস পেয়েছিলেন। সে-সাহস যদি না-পেতেন, বিশ্বভারতীর হয়ত অকালমৃত্যু ঘটত; বিদ্যালয় হিসাবে বিশ্বভারতী নিয়ে শোকগাথা রচনা চলতে পারত। আজকের বিশ্বভারতী হতে পারত না। এই কথাটা একটু অন্যদিক থেকে বোঝবার আছে।

যে-শিক্ষাদর্শের কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন তার সার যদি আমরা ভাববার চেষ্টা করি তাহলে সেই সার হ'ল— যেখানে শিক্ষা কোন পীড়ন হয়ে উঠবে না, তার মধ্যে আনন্দ থাকবে। কিন্তু এরই পাশাপাশি আরো কতকগুলি কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন, যে-কথাগুলো সচরাচর আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি না বা ভুলতে চাই। এটা ঠিকই যে পরীক্ষা থাকলেই এক-ধরনের প্রতিযোগিতা থাকে। ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থাটিকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি, যেমন চেয়েছিলেন দেশী এবং বিদেশী তাঁর সমকালীন শিক্ষাবিদরাও। ফলে এখানে তিনি অন্য অনেকের সঙ্গে সহমত, সহপথও বটে। কিন্তু তাঁদের থেকে আরেকটু বেশি এগিয়ে যাচ্ছেন হয়তো। কোনও মন্তেসরি, কোনও ফ্রয়বেল, কোন গান্ধীজির পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না।

মনের বিকাশের ক্ষেত্র হ'ল একটা শিশুর সুপ্ত যে সৃজনশীলতা আছে তাকে জাগিয়ে দেওয়া। জানানো নয়, জাগিয়ে দেওয়া। এই জাগিয়ে দেওয়ার একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমরা জানি। 'শান্তিনিকেতনে'র "জাগরণে"র মতো প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন, ভাষণ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর যে-শিক্ষাব্যবস্থা, তাঁর যে-শিক্ষাদর্শতা শুধু জানাতে চায় না, শুধু জ্ঞাপন করতে চায় না, জাগিয়ে দিতে চায়। এবং এই জাগিয়ে দেওয়া কিসের জাগিয়ে দেওয়া? আমার জ্ঞানের ক্ষুধাকে যে শুধু জাগিয়ে দিচ্ছে তাই নয়, আমার চিত্তকে জাগিয়ে দিচ্ছে। হয়ত কোন কাজেই কোন ক্ষেত্রেই সে খুব পারঙ্গম নয়, কিন্তু তারও একটা কৌতূহল আছে, তারও একটা উৎসাহ আছে। যারা অনেক কিছু পারে বা হয়ত কোনও একটাই খুব ভালো ক'রে

পারে তাদের ঝোঁকটা গিয়ে পড়ছে সেইখানে। কেউ যদি কোনকিছুই খুব ভালো ক'রে না-করতে পারে তারা কী করবে? ঠিক এতটা প্রশ্নের মতো ক'রে বলেন নি, কিন্তু তাঁর কাজগুলোকে যদি আমরা ব্যাখ্যা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, এটাই ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এবং এমন হতেই পারে, যে-ছেলেটি পড়াশুনা খুব ভালো ক'রে পারে না, সে খুব ভালো বাঁশি বাজাতে পারে, যে হয়ত বাজাতে পারে না, গলায় যার সুর নেই, সে হয়ত খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে, সে হয়ত খুব ভালো নৌকা বাইতে পারে, ওই রঞ্জনদের কিন্তু আমাদের দরকার।

রঞ্জন পড়াশুনা করেছিল কিনা এমন কোন প্রমাণ দেওয়ার দরকার পড়েনি নাট্যকারের বা নন্দিনীর। নন্দিনী যখন রঞ্জনের পরিচয় দিয়েছিল তখন সে খুব বড় মুখে বড় মনে বড় গলায় বলতে পেরেছিল যে শঙ্খিনী নদীতে সে কীভাবে দুহাতে বাইচ করতে পারে। এও তাহলে জীবনের একটা দিক অর্থাৎ স্বাস্থ্যটাও বা শারীরিক সামর্থ্যও শিক্ষার আরেকটা দিক হতে পারে। যা আমরা অনেক পরে বুঝতে পেরেছি, তা রবীন্দ্রনাথ বহু আগে বুঝতে পেরেছিলেন। তাহলে যে-শিক্ষার কথা রবীন্দ্রনাথ বলছেন তা শুধু বিদ্যার আহরণমাত্র নয়, তার পূর্ণতা অন্য যে-সমুদয় চিত্তবৃত্তি, সেই চিত্তবৃত্তির বিকাশেরও একটা কথা আছে। এবং তার সঙ্গে তার শরীরের পুষ্টি এবং মনের একটা একত্রিত বিকাশ বা সামগ্রিক বিকাশের কথা রবীন্দ্রনাথ তাহলে বলছেন। এইটুকুকে বলা যেতে পারে হয়ত তাঁর শিক্ষার মূল কথা। মূল কথা কিন্তু শেষ কথা নয়।

বিশ্বভারতীর স্কুল বিভাগ যখন গঠিত হচ্ছে এবং তার পরে যখন অল্প কিছুদিনের মধ্যে— মাত্র তিন বছরের মধ্যে— শিক্ষাসত্রের কথা ভাবছেন তিনি, তখন আরেকটা ছাত্রগোষ্ঠী বা সম্ভাব্য ছাত্রগোষ্ঠীর কথা ভাবছেন, যারা সামাজিক আলোকপ্রাপ্ত নয়, তেমন কোন পরিবার থেকে আসে নি, যাদের বিত্ত-অবস্থান মধ্যকোটিরও নয়, এমন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কী হবে ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ, যখন শিক্ষাসত্রের কথা ভাবছেন। যদি আমরা সচরাচর সামাজিক যে-মূল্যবোধ তার দিক থেকে দেখি তাহলে অনেকেই মনে করেন যে একটাকে আমরা বলতে পারি উচ্চবর্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর একটাকে প্রায় নিম্নবর্গের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ এইধরনের একটা মূল্যবোধ আমাদের মনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায় এবং রবীন্দ্রনাথ সেটাকে স্বীকার ক'রেও ভেঙে দিতে চান।

অর্থাৎ তিনি যে কাজটা করতে চান সেটা প্রায় এই মূল্যবোধ, এই-যে একটা আরোপিত মূল্যবোধ আছে, যে আরোপিত মূল্যবোধ আসছে প্রধানত একটা ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারা থেকে, সেইটাকে তিনি উল্টে দিতে চাইছেন। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে ইউরোপীয় শিক্ষা যখন আমাদের দেশে আসতে শুরু করে তখনও কতকগুলো মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে তৈরি ক'রে দেওয়া হচ্ছিল। গোপাল অতি সুবোধ বালক, সেই গোপালের কী কী গুণ ব'লে দেওয়া হচ্ছিল। বলা হচ্ছিল, 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'। অর্থাৎ লেখাপড়া কী না আমার সামাজিক উন্নতির কতকগুলো সিঁড়ি। আমি লেখাপড়া করব কেন? কারণ আমি গাড়িঘোড়া চাপব। আমি লেখাপড়া করব কেন? কারণ আমার চাই খেতাব-জুড়ি-গাড়ি নইলে করি ফিরি ফলে খেতাব আমার চাই।

এই-যে শিক্ষাধারা, এই শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ বিশ্বভারতী। অর্থাৎ সেই শিক্ষাধারার একধারে প্রতিবাদ করছেন তাঁর নিজের উদ্ভাবিত শিক্ষাধারার মধ্যে, সে-কথা তিনি খুব স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন। এ-কথা তিনি এতটা স্পষ্ট ক'রে বললেন না যে, এই-যে ঔপনিবেশিক শিক্ষা এই শিক্ষাকে আমাদের বর্জন করতে হবে। কিন্তু তিনি একটা বিকল্প ক'রে দেখালেন। আমি বলব, ঠাকুরবাড়ির যে গোটা শিক্ষাধারা যে-শিক্ষাধারার বেশ-কিছুটা কৌতুকই তিনি করেছেন 'জীবনস্মৃতি' বইয়ের মধ্যে বা 'ছেলেবেলা'য়; তার মধ্যে থেকেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে ঔপনিবেশিক শিক্ষাধারার বাইরে আরেকটা শিক্ষাধারা গ'ড়ে তুলেছিলেন এঁরা। যখন ইংরেজি রাজভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে তখনও কিন্তু সংস্কৃত শেখার চেষ্টা করছেন, বাড়িতে পণ্ডিতমশাই আসেন, সংস্কৃত শেখান, বাবা উপনিষদের পাঠ দেন এবং ছেলেমেয়েরা কোন্ ভাষায় লিখবার চেষ্টা করে? বাংলায়। এমন-কি বাড়ির যে আই. সি. এস. ছেলে সে-ও কিন্তু লেখার চেষ্টাটা করে বাংলায় এবং কী বিষয় নিয়ে সে লেখে? 'বোম্বাই রায়ত'। একজন ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর— তিনি কিন্তু

বোম্বাইয়ের হিরে ব্যবসায়ীদের নিয়ে লিখলেন না, তিনি বোম্বাইয়ের মননশীল সম্প্রদায়ের কথা লিখলেন না, তিনি বোম্বাইয়ের বাণিজ্যিক মণ্ডল নিয়ে লিখলেন না, তিনি লিখলেন মারাঠি সন্তকবিদের বিষয়ে, বোম্বাইয়ের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা নিয়ে।

আমার মনে হয় এর থেকে বড় প্রতিবাদ, কাজের মধ্যে দিয়ে করা প্রতিবাদ খুব কম মানুষই করতে পেরেছেন। ফলে ঠাকুরবাড়ির শিক্ষার মধ্যেই আমি মনে করি এই একটা তেজ ছিল, এই একটা জোর ছিল যেখানে হয়ত তাঁরা প্রতিবাদের জন্য কোনও শ্লোগান আওড়াননি কিন্তু কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদটা করতে শিখেছিলেন। আমি যতটুকু পড়েছি, তার থেকেও আরো কম যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ সব সময়েই একটা দিকে এই প্রতিবাদী ভূমিকাটা সমাজে পালন ক'রে গিয়েছেন। এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও এটাই ছিল তাঁর প্রধান ভূমিকা যার জন্য তাঁর নজর পড়েছিল সমাজের এই অন্ত্যবর্গের উপর। এই পর্যন্ত যদি আমরা রবীন্দ্র-ধারণার কথা ভাবি তাহলে আলোচনার দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উঠে আসে শিক্ষাসত্রের ভূমিকা।

আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্র বলতে যা ভেবেছিলেন বর্তমান শিক্ষাসত্র তার থেকে বহু বহু যোজন দূরে স'রে এসেছে। এই শিক্ষাসত্র আজকে আরো পাঁচটি বিদ্যায়তনের মতোই। বিশেষ ক'রে পাঠভবন তার কাছে প্রায় উত্তমর্ণের মতো, এবং শিক্ষাসত্র সেই পাঠভবনের অনুসারী হওয়ার চেষ্টা করেছে, তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েও। এই শিক্ষাসত্র যদি আগামী শতাব্দীতে এইভাবে চলে তাহলে তার পরিণতি কী হবে তা নিয়ে ভাবার খুব একটা প্রয়োজন আছে ব'লেও আমি মনে করি না, কারণ আরো পাঁচটা স্কুল যেমন টিঁকে থাকে তেমনি শিক্ষাসত্রও টিঁকে থাকবে কারণ কোন স্কুল বা কলেজ একবার প্রতিষ্ঠিত হ'লে আর উঠে যায় না। তাহলে আমার মনে হয় যাঁরা উদ্যোক্তা তাঁদের প্রশ্ন বা সমস্যাটা এই নয় যে আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে আবার নতুন ক'রে আবিষ্কার করব এবং শিক্ষাসত্রের যে-ভূমিকা আজ আমরা দেখছি, তার পুনর্বিবেচনা করব কি না।

আমার মনে হয়েছে যে যখন আমাদের দেশে সমাজের অন্তর্বর্তী মানুষের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না যখন বয়স্ক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, যখন হাতের কাজ শেখানোর কোন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা ছিল না, তখন রবীন্দ্রনাথ এসব ভাবতে পেরেছেন। তারপরে অনেকে এ-বিষয়ে ভেবেছেন এবং তাঁরা অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছেন। এখন adult education-এর কথা, vocational education-এর কথা আপনারা সবাই জানেন; ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই কোন-কোন কেন্দ্র সে-বিষয়ে যথেষ্ট মান্যতা অর্জন করেছে। আর আমাদের একটা সম্পন্ন উত্তরাধিকার ছিল আমরা সেই উত্তরাধিকারকে নষ্ট হ'তে দিয়েছি, বেপথু হ'তে দিয়েছি, দিয়েছি একটা ভ্রান্ত সামাজিক মর্যাদাবোধের পিছনে ছুটে। অর্থাৎ আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা, কাগজ-কলমের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হওয়া, শিক্ষক হওয়া, অনেক বেশি মূল্যবান, আমাদের সমাজে একজন খুব ভালো দক্ষ কারিগরী শিল্পী হওয়ার চেয়ে। এই মূল্যবোধগুলোকে ভাঙতে বা পরিবর্তিত করতে আমরা রাজি কি না এই প্রশ্নটাই কিন্তু সবথেকে বড় প্রশ্ন হবে।

আমার খুব অবাক লাগে ভাবতে যে আমাদের দেশে যাঁরা পদ্মশ্রী থেকে ভারতরত্ন হন তাঁরা বিচিত্র বিদ্যায় কৃতবিদ্য, কিন্তু এঁদের মধ্যে কোন একজনকে এমন পাবেন না যিনি কিনা একেবারে হাতের কাজে অত্যন্ত ভালোরকমভাবে দক্ষ। কোন স্বর্ণকার, কেউ হয়ত সোলার কাজ জানেন, হাতির দাঁতের কাজ জানেন, এমন কোন শিল্পী কিন্তু এইরকম পুরস্কার পান না। রবিশঙ্কর সে-দিন বলছিলেন, আমি ভারতরত্ন পেলাম, নদু মল্লিক কিন্তু কিছুই পান নি। আপনারা জানেন, নদু মল্লিক সেই বিখ্যাত যন্ত্রী— যিনি যন্ত্রগুলো তৈরি করেন আর তাতে সুর তোলেন এই শিল্পীরা। ফলে আমাদের সমাজের এই-যে মূল্যবোধের একটা উচ্চ-নীচতা, হায়ারারকি তৈরি হয়েছে, সেই হায়ারারকিটাকে যদি আমরা ভাঙতে রাজি থাকি, যেটা রবীন্দ্রনাথ ভাঙতে রাজি ছিলেন, চেয়েছিলেন এবং অনেকটা ভাঙতে পেরেছিলেন, তাহলেই কিন্তু আজকে আমাদের সামনে এই চ্যালেঞ্জটা আসবে যে আমরা কীভাবে তাঁর শিক্ষাদর্শকে ব্যবহার করব। এবং সেই ব্যবহার করার সূত্রে আমরা

শিক্ষাসত্রকে কীভাবে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।

অর্থাৎ যে-কথা আমি হয়ত বেশি বাক্যব্যয়ে বললাম, এই কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক সহজ এবং সরলভাবে ব'লে গিয়েছেন তাঁর লেখা প্রবন্ধগুলোতে। "শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শে"র মধ্যে শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে তাঁর যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবনা আছে তার খুব সুন্দর একটি সংকলন শিক্ষাসত্রই বের করেছে। ফলে রবীন্দ্রনাথ যে কী বলতে চেয়েছিলেন সেগুলো যে আমরা জানি না তা কিন্তু নয়। অজ্ঞানকে হয়ত ক্ষমা করা যায় কিন্তু যারা জেনেও সে-কাজটা করতে পরাঙ্মুখ তাদের ক্ষমা করা যায় কিনা আমি জানি না, আমি তাদের মধ্যে নিজেকেও গণ্য করি।

আমরা একটা শিক্ষাদর্শের কথা ভাবছি, শিক্ষাদর্শটা কিন্তু কখনোই একটা মূল্যবোধের পরিকাঠামোর বাইরে থাকতে পারে না। ফলে এই মূল্যবোধের পরিকাঠামোটা কী হবে সেটা আমাদের নিজেদের কাছে খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার। সেটা যদি স্পষ্ট হয় তাহলে শিক্ষাদর্শ একটা আলাদা ব্যাপার হয়ে থাকতে পারে না, জীবনযাপনটাই সেই আদর্শের অনুপন্থী হয়ে ওঠে। আমি মনে করি না, কোন শিক্ষাদর্শ জীবন থেকে বিযুক্ত কোন একটা সন্ধান। খেলার মাঠে যুদ্ধজয়ের যে-গৌরবগাথা অবশ্যপাঠ্য ছিল একসময়, তার একধরনের বিনির্মাণ করা চলে এইভাবেও যে, জীবনের যে-কোন কৃত্যই শেষপর্যন্ত কোন জাতির স্বাজাত্যবোধের, তার আত্মতার ভূমিকা রচনা করে।

অর্থাৎ একটা জাতিকেও তার সেই সমগ্রতার মধ্যে দেখতে হয়, এবং সেই সমগ্রতাটা যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাকে আমরা বলি মূল্যবোধ। সেই মূল্যবোধটাকে আমরা কোথাও আঁকড়ে ধরব, কোথাও তাকে হয়ত আমাদের সময়ের সঙ্গে ঈষৎ পাল্টে নেব— যেটা রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে বা তাঁর মতো আজ যদি কেউ থাকতেন তাহলে পাল্টে নিতেন। সেটাই আমাদের প্রধান পরীক্ষার বিষয় হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ কোন ফরমুলা নন; আমি মনে করি না যে সেই ফরমুলা গাণিতিক ছকের মতো প্রয়োগ করলেই অসামান্য পরিণতি পেয়ে যাব। তা যদি পাওয়া যেত ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা শান্তিনিকেতনে পুনর্জাত হতেন। তা হয় না।

রবীন্দ্রনাথও সেইরকম কোন ছক নয়, ফরমুলা নয়, কিন্তু তার সারবান্ সত্তা একটা আছে। সেইটাকে আমরা কীভাবে বুঝব, বোঝাবার চেষ্টা করব এটা একটা জরুরি কথা। আরেকটা কথা যেটা মনে রাখা দরকার— যেটা আমি একটু আগেই বলেছি— যে, রবীন্দ্রনাথ যে-শিক্ষার কথা বলেছিলেন সে-শিক্ষা শুধু জ্ঞাপনের নয়, জানানোর নয়, জাগানোর। ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয় হোক, আমরা যে-যুগে প্রবেশ করছি সেটা কিন্তু ওই জ্ঞাপনের, যা বিশেষরূপে জ্ঞাপিত হ'লে বিজ্ঞাপিত হয়, বিজ্ঞাপনের যুগ। এর মধ্যে যে জাগানো, তার কি কোনো স্থান নেই? তাও আছে। তারও নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা আমরা কীভাবে করতে পারব সেটাও কিন্তু আমাদের নিজেদের বুঝে নিতে হবে।

মার্শাল ম্যাকলুহান যখন 'অ্যাড এজে'র কথা বলছিলেন তখন কিন্তু তিনি এই সমস্যাগুলোর কথাই বলছিলেন। একটা বিজ্ঞাপন যখন বেরোচ্ছে সে ছাপা হয়েই বেরোক কি টিভি পর্দায় আপনারা সেই বিজ্ঞাপন দেখুন, সেই বিজ্ঞাপন কিন্তু আমাদের মূল্যবোধ এবং রুচির পরিচয় দিচ্ছে। সেগুলোকে আমরা দেখছি, আমরা তার খরিদ্দার, আমরা তার ক্রেতা। এবং তার মধ্যে থেকে আমাদের সমাজ আমাদের মূল্যবোধ তৈরি করছে। সেখানে আমাদের ভূমিকা কী?

তাই শিক্ষাসত্রের ভূমিকা আগামী শতাব্দীতে কী হবে, এটা কোনও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয়ে থাকতে পারে না। তবে যে-মূল্যবোধ বিশ্বভারতী গ্রহণ করবে বা করতে চায় সেই মূল্যবোধটাকে আগে স্পষ্ট ক'রে বুঝে নিতে হবে। তাহলেই আমরা বলতে পারব আমাদের স্থানাঙ্ক কোথায়, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এই কথাটা বলতে পারব। আমরা যদি ঠিক না-জানি আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত ওপরে বা নিচে, তাহলে আমরা কোনওদিনই সেই মাত্রাঙ্কগুলো ঠিক ক'রে নিতে পারব না। আর পারছি না যে তার মস্ত বড় প্রমাণ আমাদের বর্তমান সমাজ, 'অদ্ভুত উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'।

নমস্কার।

শিক্ষাসত্রের পঁচাত্তর বছর

ললিতকুমার মজুমদার
প্রাক্তন রেক্‌টর, শিক্ষাসত্র

শিক্ষাসত্রের মাননীয় অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, স্নেহের ছাত্রছাত্রীগণ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

শিক্ষাসত্রের পঁচাত্তর বছরপূর্তি উৎসবের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল উপস্থিত হ'য়ে যেমন আনন্দবোধ করেছি, তেমনি আমার তিরিশ বছর আগেকার কর্মক্ষেত্রে এসে তখনকার শিক্ষাসত্রের কথা, তখনকার সহকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের কথা স্বভাবতঃই স্মরণে আসছিল। তখনকার কয়েকজন সহকর্মী এখনও শিক্ষাসত্রে কর্মরত আছেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে খুবই প্রীতিলাভ করেছি। তখনকার কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীদের পুত্রকন্যারা হয়তো শিক্ষাসত্রেই পড়ছে, বা তারাও পাশ করে বেরিয়ে গেছে। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঁচাত্তর বছর পার হ'য়ে আসা একটি স্মরণীয় ঘটনা এবং দিকচিহ্নস্বরূপ। কাজেই শিক্ষাসত্রের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'য়েছে যাতে আমাদের সকলের মনে এই বছরটি চিহ্নিত হ'য়ে থাকতে পারে এবং আমরা সকলে আমাদের শিক্ষাসত্রকে আরও আপন করে নিতে পারি।

উৎসবের অঙ্গরূপে আজকে সাধারণভাবে শিক্ষা সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে শিক্ষাসত্রের ভবিষ্যৎ কর্মধারা সম্বন্ধে আলোচনাসভা আহ্বান করা হ'য়েছে। এই আলোচনাচক্রে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে উদ্যোক্তাগণ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত দেবার যোগ্যতা আমার একেবারেই নেই, কিন্তু অধ্যক্ষ স্মরজিৎবাবু এবং বন্ধুবর বিজয়বাবুর বিশেষ অনুরোধক্রমে উক্ত প্রসঙ্গে আমার কতকগুলি কথা যা মনে হ'য়েছে তা লিখিতভাবে এখানে নিবেদন করছি।

প্রথমেই বলি আজকের আলোচনাসভার বিষয়বস্তুরূপে যে শিরোনামটি দেওয়া হ'য়েছে সেটি সম্বন্ধে আমার একটু খটকা আছে। একটা নতুন শতাব্দী বা নতুন সহস্রাব্দ যাই বলুন না কেন সেই সুবিশাল প্রেক্ষাপটে আমাদের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করা কি বাস্তবোচিত হবে? আমরা বড় জোর পাঁচ বছর করে বা দশ বছরের মত পরিকল্পনা হাতে নিতে পারি। জাতীয় স্তরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি কী রকম অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হ'চ্ছে সেকথা গতকাল শ্রদ্ধেয় অম্লান দত্ত মহাশয়ের গভীর চিন্তাপ্রসূত ভাষণে আমরা শুনেছি। অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণো যেমন কাজের কথা নয় তেমনি অতি দীর্ঘমেয়াদী বা অত্যুচ্চ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সেটা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হবে না। সুতরাং আজ এই মুহূর্তে শিক্ষাসত্র যে অবস্থায় আছে তারই ভিত্তিতে আমরা কোন্ কোন্ দিকে উন্নতি লাভ করতে পারি সেটাই চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত হবে মনে হয়। কোনো আমূল পরিবর্তন আমরা চাইলেও করতে পারব না। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করবে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়স্তরে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে শিক্ষাসত্রকে তারই অনুসরণ করতে হবে।

দেশ স্বাধীন হবার পরই আমাদের মনে হ'ল ইংরেজরা যা কিছু ক'রে গেছে সবই ভুল বা খারাপ, কাজেই সংস্কারের নামে সবকিছুই বদলে ফেলতে হবে। শিক্ষাসংস্কারকল্পে স্বাধীনতার পর থেকে মুদালিয়ার কমিশন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশন থেকে আরম্ভ করে কতগুলি কমিশন যে নিযুক্ত হ'ল তার ঠিক নেই। প্রত্যেক কমিশনই নিজের-নিজের একটা শিক্ষানীতি নির্ধারণ ক'রে আগেরটাকে ঢেলে সাজিয়েছেন, কিন্তু এত পরিবর্তনে কাজের কাজ কতটা হ'য়েছে তা দেখার আগেই আবার একটা কমিশন বসানো হ'য়েছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংরেজ আমলে Matriculation Course উচ্ছেদ করে যে School Final Course প্রবর্তিত হ'য়েছিল সেটি ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত

একটি শিক্ষাসংস্কার। ঐ সংস্কারের ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইতিহাস, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞান অবশ্যপাঠ্য হ'ল। আমি নিজে ১৯৩৯ সালে Matriculation-এর শেষ বছরের ছাত্র। ঐ তিনটি বিষয়ে আমার বিদ্যা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। নব প্রবর্তিত School Final Courseটির দ্বারা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছিল।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা বড় রকম রদবদল করা হল Degree College থেকে দুই বছরের Intermediate Courseটি তুলে দিয়ে তার প্রথম বছরটি একাদশ শ্রেণীরূপে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা। এটি একটি চরম ভ্রান্ত পদক্ষেপ নেওয়া হ'য়েছিল। আগে দশ বছরের ইস্কুলের পড়া শেষ করে ছেলেমেয়েরা কলেজের অধ্যাপকদের কাছে I.A. বা I.Sc. পড়ার সুযোগ পেত এখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য ইস্কুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হ'ল। Intermediate Course-এর দ্বিতীয় বছরটির জন্য একটি পৃথক পাঠক্রম তৈরী ক'রে Degree College-এর সঙ্গে জোড়াতালি দেওয়া হ'ল। এই এক বছরের পাঠক্রম ছিল না ঘরকা না ঘাটকা। যতদূর মনে পড়ে মাধ্যমিকস্তরে একাদশ শ্রেণী সৃষ্টির সঙ্গেই বা তার অল্প কিছুদিন পরেই Multipurpose system বা বহুমুখী বিদ্যাদানের আয়োজন করা হ'ল। আমি যখন ১৯৬৫ সালে শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত হ'য়ে আসি তখন এখানে Humanities ও Science Streams ছাড়াও Agriculture, Technical, Home Science এমনকি Woodcraft Streamও চালু ছিল। আমি এখানে থাকতেই বৃত্তিমূলক streamগুলি উঠে গেল, কারণ সরকার উপলব্ধি করলেন এই Streamগুলির ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে যাবার পর তারা না পাচ্ছে কোনো technological education-এর সুযোগ, না হ'চ্ছে তাদের কোনো কর্মসংস্থান। দেখতে-দেখতে ইস্কুল থেকে একাদশ শ্রেণীও উঠে গেল। সরকার কেঁচে গণ্ডুষ ক'রে আবার দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষায় ফিরে গেলেন। অনেকগুলি ইস্কুলে এগারো ও বারো ক্লাস জুড়ে দিয়ে সেগুলিকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হ'ল। অন্যত্র উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসগুলিকে আগের মত কলেজের অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। বিশ্বভারতীর পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রে যাঁরা একাদশ শ্রেণীতে পড়াচ্ছিলেন তাঁরা অনায়াসেই দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাসও নিতে পারতেন। এই দুটি বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত হ'ত। তা না করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ উত্তরশিক্ষাসদন নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বেশ কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে পাঠভবন ও শিক্ষাসত্র থেকে সরিয়ে এনে উত্তরশিক্ষাসদনে আনা হ'ল, কয়েকজনকে সেখানে বাড়তি ক্লাস নেবার জন্য বলা হ'ল, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। পরে উত্তরশিক্ষাসদনের নিজস্ব কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হ'লেন। শুধুমাত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে উত্তরশিক্ষাসদন একটি ত্রিশঙ্কুর মত বিরাজ করছে। আমার দৃঢ় মত এই যে উত্তরশিক্ষাসদনটি তুলে দিয়ে সেখানকার শিক্ষকশিক্ষিকাকে পাঠভবন এবং শিক্ষাসত্রে নিয়ে আসা উচিত এবং এই দুটি বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা উচিত। সেইসঙ্গে এটাও খুবই প্রয়োজন যে পাঠভবন, শিক্ষাসত্র এবং বর্তমানে উত্তরশিক্ষাসদনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাগণই পালা ক'রে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হয় পাঠভবন অথবা শিক্ষাসত্রে ক্লাস নেবেন। এঁদের সকলেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বপ্রকারে এক, সুতরাং তাঁদের মধ্যে নিয়মিত পারস্পরিক কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনে কোনোই বাধা থাকার কথা নয়। বর্তমানে উত্তরশিক্ষাসদনের অধ্যক্ষ মহাশয় যে বিষয়ের লোক সেই বিষয়ে উচ্চতর বিভাগে পড়াবার ভার নিয়ে বিশ্বভারতীর ভবনান্তরে কাজ করতে পারেন।

আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যখন এল্‌মহার্স্ট সাহেবের সহায়তায় শ্রীনিকেতনের অধীনে শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন এটি একটি গ্রামীণ বিদ্যালয় রূপেই গড়ে উঠবে এই ভেবেছিলেন। এখন গ্রামের মানুষ বলতে

গ্রামের জমিদার পরিবার থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষেতমজুর পর্যন্ত নানা শ্রেণীর লোক বোঝায়। আমি যতদূর জানি শিক্ষাসত্রের প্রথম যুগে গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাই পড়তে আসত। প্রকৃত চাষী যারা লাঙল চালায় বা সামান্য কারিগর শ্রেণীর লোকেরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখতে ইস্কুলে পাঠানোর কথা ভাবতেই পারত না। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষা ক্রমে সমাজের উচ্চ স্তর থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে সাধারণ মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেচে। The Schoolmaster is abroad. আমি যখন ১৯৬৫ সালে শিক্ষাসত্রের ভারপ্রাপ্ত হ'য়ে আসি তখন এই বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ছিল প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। প্রকৃত চাষীমজুরের সন্তান যদিই বা ছিল তা নামমাত্র। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ছিল প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। আজ তিরিশ বছর পরে শিক্ষাসত্রে পড়ুয়ারা শতকরা কতজন গ্রামের একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে আগত তা আমার জানা নেই। অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যাতে অবাধে শিক্ষাসত্রে পড়ার সুযোগ পায় সে বিষয়ে শিক্ষাসত্রের তথা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। বাড়িতে এদের পরিবারে পড়াশোনার কোনো background নেই বলে এই ছেলেমেয়েরা হয়তো ক্লাসের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে নিজেরা এগোতে পারবে না, হয়তো ফেল করতে-করতে তারা দুই-এক বছর পরেই ইস্কুল ছেড়ে দেবে, কিন্তু তারা যতদিন রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকে, যতটুকু লেখাপড়া শেখে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে বা নাচতে শেখে এবং বিদ্যালয়ের আনন্দময় পরিবেশে যতটুকু সময় কাটাতে পারে ততটুকুই তাদের বাল্যজীবনের লাভ। সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষা যে পরিমাণ পরিব্যাপ্ত হবে সেই পরিমাণেই শিক্ষাসত্রের প্রকৃত সার্থকতা। আমি বলছি না লেখাপড়ায় কাঁচা ছেলেমেয়েদের খাতিরে শিক্ষাসত্রে শিক্ষার মান নামিয়ে আনতে হবে। তাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। জোর ক'রে প্রমোশন দিয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বজায় রাখার কোনো দরকার নেই। ছাত্রছাত্রীরা নবম দশম শ্রেণীতে যখন পৌঁছবে তখন তারা পাঠভবন অথবা বাইরের যে-কোনো বিদ্যালয়ের সমকক্ষ যাতে হ'য়ে উঠতে পারে সেই চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু, একেবারে নিচের দিকে অর্থাৎ সন্তোষ পাঠশালা বা শিক্ষাসত্রের প্রাথমিক স্তরে গ্রামাঞ্চলের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে প্রকৃত দরিদ্রসন্তান যারা ভর্তি হ'তে আসবে, ভর্তির পরীক্ষায় তারা পাশ না করলেও তাদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা ক'রে সকলকেই স্থান দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এর জন্য যদি আরও শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়োজন হয়, যদি ক্লাসের জায়গা বাড়াতে হয় তাহ'লে বিশ্বভারতীকে সে দায় বহন করতেই হবে। অন্নসত্রে যেমন ক্ষুধার্তমাত্রকেই আহ্বান, তেমনি শিক্ষাসত্রে দরিদ্র শিক্ষার্থী সকলের জন্য অবারিত দ্বার রাখা হোক।

আসন্ন শতাব্দীতে শিক্ষাসত্র ঃ প্রাতিষ্ঠানিকতা বনাম চ্যালেঞ্জ

দেবী মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বিনয়ভবন, বিশ্বভারতী

শিক্ষাচিন্তক রবীন্দ্রনাথ, আরো অনেক ভারতীয় যুগপুরুষের মতই, যতটা প্রশংসিত, ততটা পর্যালোচিত হন নি। আবেগতাড়িত প্রশংসা ও ঔদাসীন্য— দুইই সমান নিরর্থক। তার চেয়ে ভালো, সমালোচনা, এমনকি যদি তা নিন্দামুখর হয়, তাও। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা বহুলাংশে প্রশংসাধন্য হয়েছে, তাতে তার প্রয়োগযোগ্যতা পরীক্ষিত হয় নি। শিক্ষাসত্র-পরিকল্পনা এমনি এক মডেল, যা জাতীয় স্তরে স্বাধীনভারতে বিদ্যালয়-শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে ব্যবহৃত বা পরীক্ষিত হতে পারত; অথচ সাহস করেই বলা যায় ১৯৮৪ সালে শিক্ষাসত্রের ষষ্টিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের আগে পর্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষামনস্কতার পরিণত ফসল এই মডেলটির সম্পর্কে তথাকথিত শিক্ষাবিদগণের তেমন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না।

আশার কথা, ধারণা গড়ে ওঠা শুরু হয়েছে। ১৯০১ সাল থেকে ১৯২০ পর্যন্ত, প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে, বিদ্যালয়শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করলেন রবীন্দ্রনাথ, যার পরিণতিতে বিদ্যালয়-উত্তর শিক্ষার ভিত তৈরি হল বিশ্বভারতী-পরিকল্পনায়। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও রূপকল্প নিয়ে অনেক উক্তি আছে তাঁর। সেগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত বৈপ্লবিক উক্তিকে এই আলোচনায় গ্রহণ করা যাক— যে উক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়-গোত্রীয় কোন প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গে স্বীকার করতে গেলে মনকে প্রথামুক্ত ক'রে নিতে হবে। উক্তিটি এই :

> 'ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।... এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি বিশ্বভারতী নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।'

এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে উঠল শ্রীনিকেতন-প্রকল্প, যার মধ্যে উক্ত আদর্শ বিদ্যালয়ের রূপায়ণ-প্রয়াস প্রতিফলিত দেখা গেল। এরপর তিনবছরের মধ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষাসত্রের সূচনা করলেন যার প্রস্তাবনায় ১৯০১ থেকে গড়ে ওঠা ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা শান্তিনিকেতন স্কুলের প্রথাবদ্ধতার প্রতি অনীহা প্রকাশ পেলো এবং তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় ব'লতে ১৯২৪ সালে যা বুঝলেন, তারই রূপায়ণে শিক্ষাসত্র গড়তে চান— এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হল। কি বুঝলেন তিনি— সে কথার অনেকটাই পূর্বোক্ত বিশ্বভারতী-ভাবনায় শুনেছি আমরা। এ বিষয়ে 'A Poets School'-এ যা লিখলেন, তা এই :

> '...education is a permanent part of the adventure of life... it is a function of health, the natural expression of the mind's vitality.
>
> ...imparting the strength of reality which knows how to clear the path towards a definite end of practical good.... Here in Siksha Satra, I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education.'

এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ ছিল :

(১) প্রয়োগধর্মী সাধারণ শিক্ষা, যথা ভাষা ও সাহিত্য, ভূবিদ্যা, পরিবেশ-বিজ্ঞান, স্থানীয় ইতিহাস, সামাজিক পরিবেশ, গণিত ইত্যাদির সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার শিল্পকাজের উৎপাদনধর্মী নৈপুণ্য গড়ে তোলা হবে যার ফলে চাকুরী প্রত্যাশী না হয়েও নানাবিধ স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সাহায্যে জীবিকার্জন করতে পারবে।

(২) শিল্পকাজগুলিকে সেকালের গ্রামীণ পরিবেশের চাহিদার নিরিখে বিন্যস্ত করা হয়েছিল। যেমন,

(ক) গৃহশিল্প

(খ) হস্তশিল্প

(গ) বহিঃকক্ষ শিল্প—প্রয়োজনভিত্তিক ও প্রত্যক্ষভাবে অর্থকরী উৎপাদনশীল শিল্পকর্ম।

(৩) পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশে নানা পর্যায়ের কাজের জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে কর্ম-অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ সৃষ্টি।

শিল্পকাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

দারুশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, কাগজ তৈরি ও বই বাঁধাই, মাদুর তৈরি, বাঁশবেতের কাজ, উদ্যানশিল্প— ফুল ও ফসল উৎপাদন।

সাইকেল মেরামতি, পাম্পমেশিন মেরামতি, অন্যান্য ছোটোখাটো কৃষিযন্ত্রপাতি মেরামতির কাজ, মেশিনে কাপড় সেলাই—দর্জির কাজ ইত্যাদি।

শ্রীনিকেতন শিল্পসদনে শিক্ষানবিশীর মাধ্যমে উৎপাদনের গুণমান উন্নয়নের ব্যবস্থা ছিল যাতে সেগুলি বাজারে বিক্রয়যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে।

(৪) বিষয়শিক্ষার সঙ্গে শিল্পকর্মের ও কারিগরী কুশলতার যতবেশী সম্ভব সাঙ্গীকরণের প্রয়াস ছিল। ১৯৩৭-১৯৩৮ থেকে প্রথাগত পরীক্ষানির্ভর লেখাপড়ার সমাজচাহিদা এই বিদ্যালয়েও পরিবর্দনের ঢেউ বইয়ে দিলে। পঞ্চম দশকের প্রারম্ভ পর্যন্ত শিক্ষাসত্র কিছুকাল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ধাঁচে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটি বিদ্যালয়ই পাঠক্রম পরীক্ষাব্যবস্থা ও অভিজ্ঞানপ্রদানের ক্ষেত্রে সমধর্মী হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেল।

তারপর থেকে আরো প্রায় পাঁচদশক কেটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিভিন্ন প্রস্তাবে বিদ্যালয়-উত্তর আন্ডার গ্রাজুয়েট পাঠক্রমকে ঢেলে সাজাবার কথা শোনা যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যালয়শিক্ষাব্যবস্থাকেও যে নোতুন রূপ দিতে হবে, সে বিষয়ে ১৯৯৫-এর আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (ডেলর্স কমিশন) কিছু স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে থেমেছিলেন, সেখান থেকেই যে আমাদের শুরু করতে হবে— একথা প্রমাণ হবে যদি আমরা উপরিউক্ত উভয় কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে যোগসূত্রটির সন্ধান করি।

ডেলর্স কমিশন মানবজাতির শিক্ষাব্যাপারের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে :

> "Education is one of the principal means avai'able to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and fear."

রিপোর্টের নামটির মধ্যে শিক্ষার ভারতীয় বোধের প্রতিফলন আছে যার সঙ্গে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী সকলেই একমত: "Learning: The Treasure Within." অর্থাৎ, শিখন মানুষের অন্তর্নিহিত সম্পদ। এই সম্পদের ভিত্তি চারটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত :

Learning to Know,
Learning to Do,
Learning to Be, and
Learning to Live together.

অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ করতে শেখা, জীবনযাপনের জন্য কাজ করতে শেখা, ক্রমশঃ আরো উন্নত মানুষ হয়ে ওঠবার শিক্ষা, এবং সমাজ ও প্রকৃতি-পরিবেশের সহযোগে বাঁচতে শেখা।

রবীন্দ্রনাথের 'A Poet's School'— যার অনেকটাই আদর্শে ও প্রয়োগে শিক্ষাসত্র সম্বন্ধেই লিখিত, তার কল্পনা ও পরিকল্পনায়, এবং এল্‌ম্‌হার্স্ট-এর Siksha-Satra নামক প্রবন্ধে বর্ণিত এর কর্মসূচীতে উপরিউক্ত চারপ্রকারের শিখনের বিস্তৃত ব্যবস্থাপনার প্রকাশ ছিল— এর ব্যবহারিক পাঠক্রমের সনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ মিলবে।

অনুন্নত গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়-পর্বের (প্রাথমিক স্তর) জন্য উপযুক্ত বিকল্প শিক্ষা (Alternative Education) বিষয়ে কমিশন বলেছেন :

> "Provisions of alternatives must be qualitatively better and ensure the integration of such system into the mainsteam education"— Innovations should be home-grown rather than prescribed from the central level.

রবীন্দ্রনাথের কালে mainstream education অর্থাৎ বিদেশী মডেলে formal শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষাসত্র নামক Alternative model-এর integration-এর প্রশ্ন ছিল না— এখন সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়েছে। তবে এই নবীকরণ, এই বিকল্প অনুসন্ধান যে home-grown হতে হবে, তা এখন যেমন কমিশন বুঝেছেন, রবীন্দ্রনাথ সাতদশক আগে তা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

কমিশন বলছেন, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হবে একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার প্রবেশপথ এবং কর্মজগতের সঙ্গে ব্যবহারিক সংযোগের রাস্তা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নয়নশীল দেশের বিদ্যালয়-পাঠক্রমকে কেবলই পুনর্গঠিত করতে হবে।

কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ-এর কথা বলছেন :

(১) কোর্স-এর বহুমুখীনতা।

(২) সমাজ-উন্নয়নের কাজ ও পেশাগত কাজের দক্ষতাবিধানের জন্য কিছু বিকল্প-কার্যক্রমের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলা।

(৩) এইসব নৈপুণ্যের গুণগত উৎকর্ষসাধন।

প্রাইভেট-সেক্টর ও পাবলিক সেক্টর— উভয়প্রকার লেবার মার্কেট-এর বর্তমান ও ক্রমপরিবর্তনশীল পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যবহারিক কর্মভিত্তিক পাঠক্রমকে বিন্যাস করতে হবে। ভাষা, বিজ্ঞান ও পরিবেশের সাধারণ জ্ঞান কেন্দ্রস্থ উপাদান হিসেবে অবশ্যই থাকবে, পাশাপাশি কর্মজগতের জন্য অর্থকরী বৃত্তিশিক্ষা সমান গুরুত্ব পাবে, যাতে নমনীয় ব্যবস্থার দ্বারা লেখাপড়া, কর্মনিযুক্তি, পুনরায় নূতনতর জ্ঞানলাভের জন্য লেখাপড়ায় ফিরে আসা, উন্নততর মানের কর্ম সন্ধান ও বৃত্তিগ্রহণ চলতে থাকবে। অর্থাৎ Linear movement-এর বদলে Spiral/circular movement. এজন্য প্রয়োজনে অধ্যয়ন ও কর্মনৈপুণ্য অর্জন— এদের যোগসাধনের উদ্দেশ্যে Sandwitch কোর্স প্রবর্তিত হবে। প্রথাবহির্ভূত ব্যবস্থা ও মুক্তবিদ্যালয়ব্যবস্থা এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

যদি শিক্ষাসত্র-মডেলকে আমরা কেবলমাত্র একটি গ্রাম্যশিক্ষাপ্রকল্প বলে ব্রাত্য ক'রে না রাখি, যদি রবীন্দ্রনাথের

নিজের কথাকেই সত্য বলে মেনে নিই, 'here I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education', তবে বিশ্বভারতীর সমগ্র বিদ্যালয়-শিক্ষা-কার্যক্রমকে (শিক্ষাসত্র-পাঠভবন-উত্তরশিক্ষাসদনকে) বর্তমানের চাহিদার নিরিখে পুনর্গঠন ক'রে নেবার কথা ভাবতে হয়। বিবেচনা করতে হয় :

দেশজ কুটীর-শিল্পের প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ,
নূতন পেশা ও জীবিকার উন্মেষ ও প্রণয়ন, শিক্ষার্থীর বিজ্ঞানভিত্তিক মানসিকতা গঠন,
সরকারী ও বেসরকারী নানা কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বৃত্তিনৈপুণ্য অর্জন,
স্বনিযুক্তি প্রকল্পের নানা কর্মোদ্যোগের সঙ্গে পরিচিতি ও তদনুরূপ সামর্থ্য-অর্জন,
মানবিক মূল্যবোধের জন্য ভাষা-সাহিত্য-চিত্র-সঙ্গীত পরিবেশচেতনার উপযোগী বিষয়শিখন,
বিদ্যালয়-উত্তর উচ্চশিক্ষার উপযোগী নানা পাঠের প্রস্তুতি দান, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজের সামগ্রিক কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়-সাধন ও শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি—

এই বিষয়গুলি হতে পারে শিক্ষাসত্রের মূলভাবনার আধুনিক রূপ। এবং এর প্রত্যেকটিই ডেলর্স কমিশনের বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়, প্রধানতঃ ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশের জনসমাজের চাহিদার কথা ও বৃত্তিবাজারের কথা মনে রাখলে এদের প্রাসঙ্গিকতা সহজেই ধরা পড়ে।

এবার আসা যাক U.G.C.-র কথায়।

১৯৯৫ সালে আবিদ হোসেন কমিটি (মূলতঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে) কর্মনিযুক্তি অভিমুখ শিক্ষা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেছেন। ভূমিকায় বলা হয়েছে, ভারতে বর্তমানে সমস্ত উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবৎসর প্রায় ৪৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রথম ডিগ্রী পেয়ে বেরিয়ে আসে, যার মাত্র দশ শতাংশ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হয়। বাকী প্রায় ৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ের অধিকাংশই বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলে। এজন্য the universities have to go beyond their traditional role and seek active collaboration with productive sector and offer programmes to meet the changing needs and aspirations of its clientele.

অধ্যাপক যশপালের পরামর্শক্রমে কমিটিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে,

> 'the first degree course needs to be remodelled and strengthened further in favour of vocation and job-oriented education so as to make the students more employable especially keeping in view the job opportunities in the market.'

AICTE-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস্. কে. খান্নার মন্তব্য ছিল :

> 'The first degree course could be remodelled such that there are say about half a dozen main channels offering a combination of discipline/subjects including adequate vocational/job-oriented ones.'

যে গুলি প্রস্তাবিত হয়েছে, সেগুলি হল :

Bachelor of Accountancy,
Bachelor of Food Technology,
Bachelor of Graphic Arts and Communication,
Bachelor of Computer Applications,
Bachelor of Fashion Design and Technology.

স্নাতকোত্তর পর্বের এরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য non-traditional course হ'ল,
Banking Services,
Communication and Mass Media,
Taxation and Law,
Insurance,
Advertising and Public Relations,
Administrative Services ইত্যাদি।

এর follow up-এর জন্য ও employment marketকে explore করার জন্য এবং Entrepreneurship-এর সুযোগ করে দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি CCOP— Centre for Career Oriented Programme অবশ্যই থাকবে— যার কাজ হবে :

(i) Curriculum and Material Development,
(ii) Research and Faculty Development,
(iii) Placement, Training and Monitoring.

এই CCOP-র সঙ্গে যুক্ত হবেন উপদেষ্টা হিসেবে বিভাগীয় প্রধানগণ, UGC-র প্রতিনিধি, AICTE-র প্রতিনিধি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান (Business and Industry)-এর প্রতিনিধিগণ এবং উপাচার্য।

প্রাতিষ্ঠানিকতাকে একমাত্র উদ্দেশ্য ধরে নিয়ে তাকে কৌলীন্য দিয়ে চলবার দিন শেষ হয়ে আসছে, এখন জীবনধর্মী চাহিদার কথা মনে রেখে সামনে পিছনে ও পাশে তাকাতে হবে। সব দেশেই এই পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। তথাকথিত বিশুদ্ধ 'মানবিকী বিদ্যা'র বিষয়-উপাদান পাশাপাশি চলুক, তার সঙ্গে যুক্ত হোক 'অ-মানবিক(!)' প্রযুক্তিবিজ্ঞান, প্রয়োগধর্মী উপযোগধর্মী পেশার দিশারী নানাবিধ বিষয়ের জ্ঞান ও নৈপুণ্য-বিধায়ক কার্যক্রম। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্র-প্রসঙ্গে বলেছিলেন,

'শিক্ষাসত্রকে সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না— গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান।... কলম ধরা ছাড়া আর সব বিষয়ে আমাদের ছেলেদের হাতদুটো থাকে আড়ষ্ট। সর্বদা কল নাড়াচাড়া করে এইটে ঘোচানো চাই।'

ক্ষোভের বিষয়, আমাদের বিজ্ঞানশিক্ষাভবনের কিছু অধ্যাপকের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ফলিত বিজ্ঞানের বিশেষ কোন শাখা আজও খোলা গেল না, কারণ তাতে নাকি বিশ্বভারতীর পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে।

শ্রীনিকেতনের শিল্পভবন কুটীর শিল্পের আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করছেন; মনে রাখতে হবে এর একটা উজ্জ্বল ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ছিল, (এর উৎপাদন এর বাজার-চাহিদা এখনো বিপুল) তাকে কাজে লাগাতে পারলে বিশ্বভারতী বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারে, অতীতে তার কাগুজে প্রমাণ আছে।

আধুনিক ব্যবসায়বিজ্ঞান, ম্যানেজমেন্ট-বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয়স্তর থেকে বৃত্তিপাঠক্রম শেষ ক'রে উঠে আসা আন্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থীদের সামনে entrepreneurship, স্বনিযুক্তিপ্রকল্প, প্রাইভেট ও পাবলিক সেক্টরে নিযুক্তির দরোজা খুলে দেওয়া যায়। নিবিড় যোগাযোগের পথ তৈরি হোক না শিক্ষাসত্র-পাঠভবন-উত্তরশিক্ষার অষ্টম-নবম শ্রেণী থেকে বৃত্তি-অভিমুখ নানা পাঠক্রমের সঙ্গে শিল্পভবনের সদ্য অনুমোদন-পাওয়া প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সের— তার সঙ্গে যুক্ত হোক শিক্ষাভবনের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরপর্বে UGC প্রস্তাবিত General-Professional কোর্সের নানা ঐচ্ছিক বিষয়ের, বিদ্যাভবনের প্রযুক্তিধর্মী অর্থশাস্ত্র, Management Sciences, বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক ভূগোল, সাংবাদিকতা— কলাভবনের থেকে কোর্স দেওয়া হোক Advertisement, Commercial Art ও Fashion Design-

এর, ফোটোগ্রাফির উন্নত প্রশিক্ষণের, বিনয়ভবনে এই সমস্ত বিভাগের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের in service training-এর Workship ও Refresher Course-এর ব্যবস্থা হোক, শান্তিনিকেতনে TV ও আকাশবাণী Centre এর সাহায্য নিয়ে Mass Communication ও Mass Media-র নিয়মিত কোর্স খোলা হোক। শ্রীনিকেতনে CAREER, Rural Extension Centre, Social Work Dept., কৃষিবিজ্ঞান ভবন Occupation generationএর ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গবেষণার পথ তৈরি করুন, শিক্ষক শিক্ষার্থীরা একযোগে সেই সব গবেষণায় কর্মী ও গবেষক হয়ে তার ফল পেয়ে সমৃদ্ধ হোন।

বিশ্বভারতীতে এইসব সম্ভাবনার Educational Web তৈরি হবার মত idea আছে। কার্যক্রম আছে, জনশক্তি আছে, দরকার coordination-এর। সরকারী সাহায্য যে আজ কোন সমস্যা নয়, বিশেষত এরকম challenging পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা সমাদর পাবে, এ কথা আমরা জানি।

শিক্ষাসত্র পরিকল্পনা শুধু শিক্ষাসত্রের জন্য ছিল না, রবীন্দ্রনাথের ২৪ বছরের শিক্ষা-অভিজ্ঞতা, সমাজচেতনা, দেশবিদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিতির ফলে ১৯২৪ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত নানা প্রবন্ধে চিঠিপত্রে যে জীবনচাহিদাভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষার স্বচ্ছ ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রয়োগ করলে স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষা-পুনর্গঠনে নূতন দিক্‌দর্শন মিলত।

এখন UGC বলছেন, বিদ্যালয়-স্তর থেকে পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হোক। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিকে, তার থেকে উচ্চমাধ্যমিকে, তার থেকে উচ্চশিক্ষার নানা শাখায় ও ধারায় শিক্ষার্থীদের গতীয়তা বাড়ছে, মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। এখন সাধারণ সাহিত্য, গণিত, বিশুদ্ধ সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ফলিত বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার নানা ঐচ্ছিক বিষয়ের provision বিদ্যালয় পাঠক্রমে থাকুক। তারই পথ ধরে বিভিন্ন ভবনের পাঠক্রম থেকে শিক্ষার্থীরা Menu/Cafeteria approach এ বিষয় বেছে নিক, তাতে Centre for Career-oriented বা CCOP পরামর্শদাতার ভূমিকা নিক।

বিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা— তা থেকে কর্মনিযুক্তির সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত হোক। আন্তর্জাতিক শিক্ষাকমিশন ও UGC-র প্রস্তাব ও সুপারিশ বিশ্বভারতীর আদর্শের কাছে নোতুন কিছু নয়; শিক্ষাসত্রও তার কর্মপরিকল্পনার আধুনিকীকরণ করলে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে Linkage স্থাপনের সহজ পথ মেলে। শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের কর্মধারা এই পথে পুনর্গঠিত হোক।

आगामी शताब्दी में रवीन्द्र-आदर्श की प्रासंगिकता

रूपकमल चौधरी
अध्यापक, शिक्षासत्र, विश्वभारती

गुरुदेव रवीन्द्रनाथ का मानवतावाद शाश्वत-सत्य पर आधारित है। अत: रवीन्द्र आदर्श की प्रासंगिकता आगामी शताब्दी में भी अक्षुण्ण रहेगी। इसका एक उज्जल प्रमाण यह है कि पश्चिम में विशेष रूप से ब्रिटेन में रवीन्द्र-साहित्य के प्रति पुन:रूचि जाग्रत हुई है। पिकाडोर इंडिया ने हाल में रवीन्द्रनाथ का एक संचयन अंग्रेजी में प्रकाशित किया है।[1] जिसमें उनकी कुछ कहानियाँ, नाटकाशं, उपन्यासांश, निबंधों, वक्तब्यों, कविताओं, चिट्ठियों आदि का एक बहुत अच्छा संचयन कृष्णा दत्त एवं एण्ड्रयू रोबिन्सन ने किया है। इसी पुस्तक में रवीन्द्रनाथ बिलीयम बटलर, यीट्स, एजरा पाउण्ड, बर्ट्रैंड रसेल, रोम्यां रोला, विक्टोरिया ओकेम्पो, योन नागुची जैसे संसार के मूधन्यों से संत्रादरत हैं। यह एक भारतीय के लिए, एक सुखद प्रसंग है।

1930 ई0 में रवीन्द्रनाथ जर्मनी में अलबर्ट आइंस्टीन से मिले थे, उन्होने बातचीत का प्रारम्भ संगीत पर किया था। एक महाकवि थे तो दूसरे महावैज्ञानिक। हम जानते हैं कि एक, रवीन्द्र-संगीत के प्रणेता थे और दूसरे बायलीन वादक थे। यह बातचीत संगीत से सचाई की ओर जब मुड़ी तो रवीन्द्रनाथ ने कहा था कि यदि मानवता से सर्वथा असम्बद्ध-कोई सत्य है तो हमारे लिए उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं हो सकता। विश्व के सबसे महान बैज्ञानिक आइंस्टीन से उन्होंने जो कुछ कहा था, वही अपनी सम्पूर्ण रचना में भी कहा है। अर्थात् सम्पूर्ण रवीन्द्र-साहित्य में मानवतावाद आरम्भ से अंत तक परिव्याप्त है। इसका प्रारम्भ व्यक्ति से होता है और पर्यवसान विश्व मानवतावाद में होता है। उनके शब्दों में—

> "Religion inevitably concentrates itself on humanity, which illuminus our reson, inspires our wisdom, stimulates our love, claims our intelligent service."[2]

रवीन्द्र-साहित्य में मानवतावाद की यह यात्रा व्यक्ति से समाज, समाज से विश्व और विश्व से असीम की ओर उन्मुख है। उन्हीं के शब्दों में—

> "From individual body to community, from community to universe, from universe to Infinity– this is the souls normal progress."[3]

उन्होंने विश्वभारती की प्रतिष्ठा लोक मङ्गल की भावना से प्रेरित होकर किया है। यदि कोई उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठावान है तो वह अपनी उत्कृष्टता पर गर्व कर सकता है। बुद्धि की अपनी उपयोगिता होते हुए भी श्रद्धा की शक्ति असीम है। इसीलिए श्रद्धा को ही जीवन कहा गया है। व्यक्तित्व श्रद्धा का ही प्रतिफलन है। गीता भी हमें प्राणिमात्र के कल्याण में युक्त होकर सर्वात्म-बोध और सर्वमंगल की भावना की ओर प्रेरित करती है। श्रीरामकृष्ण परमहंस ने गीता का सार 'त्यागी' बताया है और हम जानते हैं कि इस संस्था के लिए रवीन्द्रनाथने अनेक त्याग किया है।

रवीन्द्रनाथ पोथिगत शिक्षा के विरुद्ध थे। भारतीय परम्परा में भी इसकी निन्दा है। आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व जैन आचार्य कुंदकुंद ने प्राकृत भाषा में कहा था—

"पंडिय पंडिय पंडिय, कण छोडि वि तुस कंडिया।
पय-अत्थं तुट्ठोसी, परमत्थ ण जानइ मूढोसि॥"[4]

(हे पंडित!—3, तुम कण छोड़कर, तुसही कूटते हो। अर्थ और शब्द से संतुष्ट हो, परमार्थ नहीं समझते। इसलिए तुम मूर्ख ही हो।) हितोपदेश के अनुसार वहं विद्वान् है, जो सत्कर्म करता है। शास्त्र का अध्ययन मात्र करने से लोग मूर्ख बन जाते हैं। (शास्त्राष्य धीत्यापि भवति मूर्खा:। यस्तु क्रियावान्पुरुष: स विद्वान्) अमृतबिन्दुपनिषद में कहा गया है—मेधावी व्यक्ति पुस्तकों के गंभीर अध्ययन के बाद सच्चे ज्ञान और भीतरी विज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। वह सारी पुस्तकों को छोड़ दे, जैसे धान का दाना चावल चाहनेवाला भूसे को छोड़ देता है।

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद ग्रंथम शेषत:[5] विवेकानन्द ने कहा है— 'गधे की पीठ पर पुस्तकालय की सभी किताबें लादी जा सकती हैं, लेकिन इससे वह विद्वान नहीं बन सकता'[6] निरक्षर कबीरदास ने कहा है—

"पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढाइ आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय॥"

पोथी पढते पढते सभी मर गये, कोई पंडित नहीं हो सका। जिसने मात्र ढाइ अक्षर 'प्रेम' का पढ़ लिया, वही पंडित हो गया।

अमेरिका के प्रसिद्ध नृतत्वशास्त्री लेवी स्त्रास ने अपने शोध प्रबन्ध 'स्ट्रक्चरल एन्थ्रोपोलोजी' में निस्कर्ष रूप में कहा है कि जिन्हें हम असभ्य या मूर्ख कहते हैं, वे हमें विनम्रता और भद्रता का पाठ पढ़ाते हैं। उनमें विवेक बुद्धि अधिक होनी है। मंदबुद्धि होना, उदार हृदय होने का परिचायक है और प्राय: मूर्ख कहे जाने वाले लोग अपेक्षा अधिक प्रशंसा के हकदार होते हैं।[8] एडीसन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने शताधिक वैज्ञानिक आविस्कार किया था। पहिये का आविस्कार, कृषि कर्म, कपड़ा बुनना इत्यादि अनेक आविस्कार प्राचीन युग में इन्होंने ही किया था, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने साहित्य के क्षेत्र में वेद की रचना की, शिल्प के रूप में कई प्राचीन मंदिर हैं, जो इस बात के परिचायक हैं कि पोथिगत विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्राचीन युग में जब शिल्प और विज्ञान् इतना उन्नत नहीं था, तब उन्होने ऐसे आश्चर्य जनक उदाहरण प्रस्तुत किये थे।

रवीन्द्रनाथ ने स्वयं अपनी अनुभूति से एवं स्वाध्याय से ज्ञानप्राप्त किया था—वे यह चाहते थे कि शिक्षा जीवन से युक्त हो। यह बात भारतीय परंपरा से अनुमोदित है। राम विश्वामित्रा की सेवा में नियुक्त हुए और उन्होंने गुरु से शास्त्र और शस्त्र की ऐसी शिक्षा पायी कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम और रघुबीर कहलाये। कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही दिया था। इस संदर्भ में रवीन्द्रनाथ की उक्ति द्रष्टब्य है—

"शिक्षा के जीवनेर अंग हते हबे। ++ चेष्टा करेछि तादेर मने सबकिछु संबंधे औत्सुक्य जागाते—प्रकृतिर सौन्दर्ये, आशेपाशेर ग्रामे, अभिनयेर माध्यमे, साहित्ये, संगीते। प्रकृतिर राज्येर सब किछु दिये, शुधु क्लासेर पड़ा दिये नय, पर्यवेक्षण ओ सक्रिय सहयोगितार माध्यमे।"[9]

दिल्ली के एक स्कुल में बच्चों से पूछा गया कि ध्रुवतारा किस दिशा में अवस्थित होता है तो सभी ने ठीक उत्तर दिया और जब यह पूछा गया कि रात को क्या तुम इसे पहचान सकते हो, तो सभी ने नेहीं उत्तर दिया। यह आजकल शिक्षा की पद्धति है। हम जानते हैं कि ब्रह्मविद्यालय के शिक्षक जगदानन्द रात को तारों को दिखाकर ही, उनके संबंध में बताते थे।

रवीन्द्रनाथ चाहते थे शिक्षा का समुचित लाभ उनको भी मिले जो इससे वंचित रह गये हैं। उन्होंने कहा है—"आमादेर पाशेर ग्राम गुलिते आदिवासीदेर बास।++छेलेरा तार फले ग्राम जीवन के जानते पारे। कृषि ओ स्वास्थ रक्षार आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति दिये ग्रामवासीदेर कीभावे साहाय्य करा जाय, ता तारा शेखे। आमार मते प्रकृत शिक्षा हल शुधु पुँथिगत वि... नय, पूर्ण जीवनयापन।[10] इससे साक्षर और निरक्षर का भेद मिटता है और मनुष्य परस्पर सहयोगिता और प्रीति के बंधन में बंधता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति ने दो समुदाय के बीच दूरी को बढ़ा दिया है। रवीन्द्रनाथ का शिक्षादर्श मानवता के विकास के लिए है। यह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता।

हम जानते हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अनेक संशोधन और परिवर्तन के बाद भी मैकाले की शिक्षा नीतियों पर आधारित है। मैकाले भारत में लिपिक वर्ग तैयार करना चाहता था और वह मानता था कि भारत की लाखों पुस्तकें बेकार हैं, यूरोप की एक आलमारी ही उनके लिए पर्याप्त है। रवीन्द्रनाथ इन तथ्यों से परिचित थे। वे भारत की गौरवशाली प्राचीन शिक्षा प्रणाली को आधुनिक विज्ञान से शक्ति सम्पन्न बनाकर पुन: उसे प्रतिष्ठित करना चाहते थे। अतीत में विश्वभारती ने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया था, जब वह निरन्तर आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। इसलिए रवीन्द्रनाथ की शिक्षा प्रणाली खामखियाली नहीं है, इसे विश्वभारती ने प्राय: एक सौ वर्षों से प्रमाणित कर दिखाया है। भारत के अन्य शिक्षा प्रतिष्ठानों से आज भी इसकी एक अलग पहचान है।

वर्तमान समय में हमारे अखबार हिंसा और अपराध की खबरों से भरे रहते हैं। इन्हें पढ़कर हमारी संवेदना नहीं जागती है। खुशहाल लोगों के लिए यह एपीटाइजर है, इसे पढ़कर वे ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच का मुड बनाते हैं। उन्हें अपने बीबी वच्चों के लिए समय नहीं है, देश के लिए तो एकदम नहीं। रूपये कमाने के लिए ही वे समय का उपयोग करते हैं। नेता अपने भाषण में जनता को महान कहते हैं, किन्तु जाति और सम्प्रदाय में उसे बाँट कर भोट बैंक ही समझते हैं। घोटालों के दौर से देश गुजरता रहा और सजा किसी को नहीं हुई। आज प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन सच के अंदाज में कितने विश्वसनीय तरीके से झूठ बोलना है, राम बनकर रावण का आचरण करता है। आज मानव, दानव की अपेक्षा अधिक क्रुर, अविश्वसनीय, प्रवंचनशील, स्वार्थी और उपयोगितावादी जीव हो गया है। इसीलिए पश्चिम में फ्रॉयड ने इसे चिंतनशील पशु की कोटि में ही रखा था।

"ऐ आसमान! तेरे खुदा का नहीं है खौफ
डरते हैं ऐ जमीन! तेरे आदमी से हम।" —जोश

प्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री एवं मनीषी सोरोकीन की सम्मति में यदि अगली शताब्दी में जड़ प्रकृति के रहस्यों की खोज विज्ञान से विमुख हो जाय अथवा अनुसंधान कार्य स्थगित कर दे तो सभ्यता या संस्कृति की कोई क्षति नहीं होगी। परन्तु अब इस बातकी आवश्यकता हैकि हमारे अनुसंधान का विषय अब मनुष्य ही हो।[11]भारतीय चिंतन परंपरामें मनुष्य "अमृतस्य पुत्र:" के विशेषण से सम्मानित है।[12] आचार्य शंकर की दृष्टि से मनुष्य अनेक विशिष्टताओं से सम्पन्न प्राणी है, जिसका यदि संवर्धन किया जाय तो वह दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। बुद्धि की विभूति का विस्तार वस्तुत: दूसरे प्राणियों से अधिक मनुष्य को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है।[13]

प्रश्न यह है कि हमारे देश में इतनी हिंसा क्यों होने लगी? भारत सदियों से "अहिंसा परमोधर्म: " का विश्वासी था। दीर्घकाल तक चलने वाली हमारी स्वाधीनता की लड़ाई भी कुलमिलाकर अहिंसक ही था। इस विडम्बना का मात्र एक ही कारण है— आदर्शवादी आस्थाओं का पलायन और अंत:करण का अवमूल्यन। याद कीजिए, गुरुदेव ने कहा था—"अंतर मम विकसित करो हे अंतरतम हे।" साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं को जगाती है, साहित्यिक-पत्रिका धीरे-धीरे बंद होती चली गई। दूरदर्शन का प्रवेश हुआ। वह जिस प्रकार के जीवन यथार्थ को प्रस्तुत कर रहा है उससे अर्थ-लोलुपता, वासना-प्रियता, क्रूरता, हिंसा आदि अवांछित-वृत्तियों का प्रसारण कर रहा है। कुल मिलाकर इससे हमारे संस्कार दूषित हो रहे हैं। आज सुशिक्षित और सम्पन्न परिवार के लड़के अधिकाधिक हत्या जैसे अपराध कर रहे हैं, क्योंकि वे रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और सभी ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं।[14] भोगवादी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव उपग्रह चैनलों के माध्यम से अबाध जारी है।

भारतीय संस्कृति 'त्याग' को सम्मान्त्रित करती है— "त्येन त्यक्तेन भूंजीथा।" [15] प्राचीनकाल में हमारे पूर्वजों ने स्वल्प साधनों से गुजारा किया और महान आदर्शों को उपस्थित किया। वे मानते थे जीवन भोग के लिए नहीं, उच्चस्तरीय प्रयोजनों के लिए है। इन्हीं उच्च स्तरीय आस्थाओं के अवमूल्यन के कारण वर्तमानकाल की सारी समस्याएँ हैं। आचार्य शंकर का एक अद्भुत संदेश है— "मरुभूमि में पथ खोकर जैसे कोई पथिक वृथा पानी-पानी कहकर घूमता-फिरता है, पर पानी का संधान न मिलने पर वह अधिक दुर्दशाग्रस्त हो जाता है, वैसे ही संसार में अनेक प्रकार के मोह और भ्रांति से आच्छन्न मनुष्य की दुर्गति की सीमा नहीं रहती।"[16] आचार्य कुंदकुंद ने कहा है—

"त्रिहुयण सलिलं सयलं पीदं तण्हाये पीडि येण तुमे।
तो वि ण तिण्हाच्छेदो जादो चिंतेह भव महणं॥"(मोक्ख पाहुड़, 23)[17]

हे आत्मा! तृष्णा से पीड़ित होकर तू ने अब तक अनगिणत भवों में त्रिभुवन का सारा जल पी डाला, तो भी तेरी प्यास नहीं मिटी। अत: तू तृष्णाओं से चित्त हटाकर ससांर-छेद का उपाय कर।

त्याग के इसी आदर्श को ब्रह्मविद्यालय में अपनाया गया था। काँच-मंदिर के फाटक पर लौह-कपाट

पर एक भिक्षा-पात्र संलग्न था। उसके उपर लिखा था—"सभी धर्मों में त्याग-धर्म ही सार तत्व है, इस भुवन में। उनदिनों एक दरीद्र भाण्डार प्रतिष्ठित किया गया था। यह रवीन्द्रनाथ के अभीष्ट विषयों में से एक था। शिक्षकों द्वारा प्रदत्त मासिक चंदे से, रवीन्द्रनाथ की आर्थिक सहायता से एवं अतिथियों के दान से यह भाण्डार समृद्ध था। इस अर्थ का उपयोग गरीबों की सहायता के लिए किया जाता था।[18] इस प्रकार रवीन्द्रनाथ ने केवल "श्रेष्ठ भिक्षा" शीर्षक कविता ही नहीं लिखी थी। इसे व्यवहार में लाकर "त्याग धर्म" को पुन: प्रतिष्ठित भी किया था। आनन्द मेला भी इसी का एक उदाहरण है।

उपर्युक्त वर्णन और विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि आज रवीन्द्र-आदर्शों की आवश्यकता और अधिक बढ़ गयी है। इसकी अप्रासंगिकता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरह आगे बढ़ने के लिए मजबूती से एक पैर धरती पर रखना जरुरी होता है, तभी दूसरा पैर उठाया जा सकता है। उसी प्रकार रवीन्द्र-आदर्शों पर दृढ़ रहकर ही हम नवीन-प्रयोगों को अपना सकते हैं। शिक्षासत्र वर्तमान काल में जितना रवीन्द्र-आदर्शों पर आधारित है, वही अगामी सदी के लिए पर्याप्त है। ग्रहण और त्याग विकास का धर्म है।

पाद टिप्पणियाँ—

1. जनसत्ता हिन्दी दैनिक समाचार पत्र—(अशोक बाजपेयी) 24 जनवरी, 1999, पृ0 4.
2. The religion of Man, P. 114-16._Rabindranath Thakur
   London George Aelen & Unturn ltd., 4th Impression 1954.
3. वही, पृ0 121.
4. प्राकृत विद्या—शौरसेनी, प्राकृत एवं सांस्कृतिक मूल्यों की त्रैमासिक पत्रिका, जनवरी—मार्च, 1998 ई0, नयी दिल्ली, पृ0 5.
5. श्रीगीता तत्त्व चिंतन—सं0 कल्याण मल लोधजा, पृ0 406—07.
   नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली।
6. श्रीगीता माहात्म्य—विवेकानंद, वही, पृ0 73.
7. मिथकीय कल्पना और आधुनिक काव्य—पृ0 13—जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
8. वही, पृ0 362, उद्धृति— The out line literature Ed-Drinkwater, P 195-97.
9. शिक्षा सत्र, षष्टिवर्ष पूर्ति स्मारक ग्रंथ, पृ0 10 विश्वभारती ग्रंथन विभाग, कलकाता।
10. वही, पृ0 12.
11. श्रीमद्भगवद्गीता के शंकर भास्य का समालोचनात्मक अध्ययन, पृ0 294.
    डॉ॰ गगनदेव गिरि, ज्योति प्रकाशन, पटना।
12. "श्रीण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा/आ ये धामाणि दिव्यानि तस्थु:
    वेदाहण्येतं पुरुषं महान्तम/आदित्यवर्ण नम,: परस्तात्।
    तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति/नान्य: पन्था विघतेऽयनाय॥"
13. (ऐतरेय आरण्यक—3 2 3) धर्मयुग (हिन्दी पत्रिका) — अप्रेल, 1996.

14. इंडिया टु डे (हिन्दी पत्रिका) 20 जनवरी, 1999 ई0. नई दिल्ली।
15. ईशा पास्यमिदं यत किंच जगत्‌गंजगत्।
    तेन त्य क्तेन भूंजीथा मा धः कस्यश्चिद् धनम्॥
    —ईशा उपनिषद, श्लोक। उपनिषद—अतुल चन्द्र सेन, हरफ प्रकाशनी, कलकत्ता।
16. विवेक चूड़ामणि से उद्धृत, द्रष्टव्य धर्मयुग, हिन्दी पत्रिका, अप्रेल, 1996 ई0।
17. प्राकृत विद्या, जनवरी—मार्च, 1998 ई0, पृ0 41, नई दिल्ली।
18. रवि जीवनी—प्रशान्त कुमार पाल, पंचम खण्ड, पृ0 233.
    आनन्द पब्लिशर्स लिमिटेड, कलकत्ता 9.

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের মধ্যে শারীরশিক্ষা বা Physical Education-এর গুরুত্ব এবং আগামী শতাব্দীতে এর প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষাসত্রের ভূমিকা

ডঃ সমীরণ মণ্ডল
অধ্যাপক, ফিজিক্যাল এডুকেশন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

আজকের এই আলোচনাচক্রে আমার বিষয়বস্তু রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের মধ্যে শারীরশিক্ষা বা Physical Education-এর গুরুত্ব।

আগামী শতাব্দী—শুরু হয়ে গেছে কাউন্ট ডাউন বা সময় গোনা। কমপিউটারাইজেশন, অটোমেশন, গ্লোবালাইজেশন-এর যুগ। এই যে আগামী শতাব্দী এর সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে আপনাকে ফিট্ থাকতেই হবে। তাই আজ Health club বা Fitness centre খুলছে চারিদিকে। টিভিতে দেখানো হচ্ছে Fitnes show, Yoga, Meditation show। এই যুগে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা বিশেষ করে রবীন্দ্র-শারীরশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা আছে কি? এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবন, চিন্তা এবং কর্মে ফিরে গিয়ে তা খোঁজার একটু চেষ্টা করি।

ঠাকুরবাড়িতে শরীর-চর্চার বা শারীর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল— সেই দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে। রবীন্দ্রনাথের অন্য ভাইরাও শারীর-শিক্ষা নিতেন। রবীন্দ্রনাথ তো নিয়ম করে শারীর শিক্ষা নিতেন— সকালে কুস্তি, খালি হাতে ব্যায়াম, তারপর অ্যানাটমি ফিজিওলজি বা শরীরবিদ্যা শিক্ষা, তো বিকেলে জিমন্যাসটিক। লাঠি খেলা, সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চড়াও ছিল। টেনিসও খেলতেন। বিভিন্ন ধরনের নাচ জানতেন। তাছাড়া যোগাসন, প্রাণায়াম, ধ্যান করতেন নিয়মিত। ঠাকুরবাড়ির এসব ব্যবস্থাও তো অন্য এক শতাব্দীতে প্রবেশের প্রস্তুতি ছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ইংলণ্ডে গেলে তিনি হার্বার্ট স্পেনসরের অনেক প্রবন্ধ পড়েন। তার মধ্যে Essays on Education– Intellectual, Physical and Aesthetics এবং Physical Education বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলো তরুণ মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। ছেলেবেলায় Anatomy Physiology শেখার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যায়াম, কুস্তি, সাঁতার, টেনিস্, জিমন্যাসটিক, লাঠি খেলা এবং পরে স্পেনসরের Physical Education প্রবন্ধ তাকে এই বিষয়টি নিয়ে বেশ ভাবায়। ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা "জাতীয় মেলা" যাতে শরীর চর্চা, খেলাধূলাকে অন্যতম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জাতীয়তা গঠনের জন্য— তাও রবীন্দ্রনাথের মনে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

'বালকে'র সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যায় "ব্যায়াম" প্রবন্ধ ছাপেন। পরের সংখ্যায় রবিঠাকুর উত্তর দেন "ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়াম করিলে শরীর সুস্থ হয় এবং সুস্থ থাকিলেই ভাল, অসুস্থ থাকিলে কষ্ট পাইতে হয় ইত্যাদি।" আবার ১২৯৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা "ভারতী" ও "বালকে" হেঁয়ালী নাট্য প্রবর্তনকালে লিখলেন "সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভাল করিয়া বাড়িতে পারে না। আমোদ-প্রমোদ চাই এ কথা যে বলিতে হয় এই আশ্চর্য। কিন্তু আমাদের দেশে এ কথাও বলা আবশ্যক।

বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদকেই আমরা ছেলেমানুষি জ্ঞান করি— বিজ্ঞলোকের কাজের পক্ষে যেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তা আমরা বুঝি না যে যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে জানে। যাহারা কাজ করে না তাহারা আমোদও করে না। আসল কথা এই যে, বালকের মত না খেলিলে যুবার মত কাজ করা যায় না, যুবার মত কাজ না করিলে বৃদ্ধের মত জ্ঞান পাকিয়া উঠে না। ক্ষেতেই যেমন শস্য পাকিয়া থাকে—

জড়তার মধ্যে তাম্রকূটের ধোঁয়ায় পাকিয়া উঠে না। মানুষের মতো মানুষ হইতে গেলে বালক, বৃদ্ধ, যুবা এই তিনই হইতে হয়। কেবল বৃদ্ধ হইতে গেলে বিনাশ পাইতে হয়, কেবলই বালক হইতে গেলে উন্নতি হয় না। আমরা বাঙালীরা যদি যথার্থ মহৎ জাতি হইতে চাই তবে আমরা খেলাও করিব, কাজও করিব, চিন্তাও করিব। আমরা প্রফুল্ল হইয়া খেলা করিব, উদ্যোগী হইয়া কাজ করিব ও গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিব।"

অথচ আজকের বাবামারা নিজেরা এবং ছেলেমেয়েদের শরীরচর্চা, খেলাধূলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন। শুধু প্রতিযোগিতা আর পড়াশুনা। আগামী দিনে সত্যিই কি এরা যুঝতে পারবে। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট সমীক্ষার কথা বলি। যে সমস্ত বাচ্চারা মাঠে যায় খেলতে তাদের মধ্যে চশমা নেবার প্রবণতা বেশী না যারা মাঠে যায় না তাদের মধ্যে বেশী। খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যারা মাঠে আসে না তাদের মধ্যে চশমা নেওয়া ছেলেমেয়ে বেশী। দুনিয়ার অন্যতম ব্যস্ত মানুষ বিল ক্লিণ্টনও এক ঘণ্টা জগিং, শরীরচর্চা, খেলাধূলা করেন। আমাদের অমর্ত্য সেনও কলকাতায় এসে পাঁচতারা হোটেলে থাকার সময় হেল্‌থ ক্লাবে গিয়ে শরীরচর্চা করতে ভুলছেন না। শান্তিনিকেতনে এলে নিয়মিত সাইকেলও চালান। কারণ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং অবশ্যই শতাব্দীর প্রস্তুতি।

ভারতীর শ্রাবণ ১২৯৫ সংখ্যায় "আলস্য ও সাহিত্য" নাম প্রবন্ধে বললেন "সাধারণ লোকে অবসর ও আলস্যকে প্রায় প্রতিশব্দ মনে করে। সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার।" ১৮৯২ সালে "ইন্দ্রিয়সংযম" গ্রন্থ সমালোচনা করে বললেন "যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও ত তাহার পরিবর্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" আগামীতে এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

আগামী শতাব্দীতে রবীন্দ্রশিক্ষাদর্শ তাঁর "কাজ ও খেলা" লেখাতেই বোধহয় স্পষ্ট নির্দেশ আছে। তিনি বললেন "আমাদের মানবকার্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে কতকগুলি প্রবৃত্তি ও শক্তির চর্চা হইয়া আসিয়াছে। বংশানুক্রমে তাহারা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত, সঞ্চিত ও অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। সকলসময়ে আমরা তাহাদের হাতে কাজ দিতে পারি না। অথচ কাজ করিবার জন্য তাহারা অস্থির। অনেকসময় দীর্ঘ আলস্যের পর মাংসপেশীর বৃদ্ধি, উদ্যমকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খাটাইয়া লইতে ইচ্ছা করি। মানবহৃদয়ে একটা প্রতিযোগিতার প্রকৃতি আছে, দৈনিক কাজে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হয় না, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভান করিয়া হারজিতের খেলা গড়িয়া তাহার চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়। সভ্যতার বৃদ্ধি-সহকারে আমাদিগকে অনেক প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং খেলাচ্ছলে তাহাদের নিবৃত্তি সাধন করিতে হয়।

সত্যকার কাজে এত অধিক উত্তেজনা তাহার সহিত স্বার্থের এত যোগ, তাহাতে এত প্রাণপণ কঠিন চেষ্টার উদ্রেক হয় যে শুদ্ধমাত্র প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির সুখ তাহাতে লাভ করা যায় না। বিশেষতঃ তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করে। কার্যের কঠিন শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। খেলার মধ্যেও নিয়ম আছে নহিলে বাধা অতিক্রমের স্বাভাবিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় —কিন্তু সে নিয়মের বাধার মধ্যে কেবল ততটুকু দুঃখ আছে যতটুকু না থাকিলে সুখ নির্জীব হইয়া পড়ে।"

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের সময় লিখলেন "যাহাতে শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্রদের বুদ্ধি, শরীর, চরিত্রের উন্নতি হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইব। তাহা ছাড়া ব্যায়ামচর্চার যথেষ্ট আয়োজন থাকিবে।"

"যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে

এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানে মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।"

শান্তিনিকেতনে তিনি ছাত্রদের ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা, খালি হাতে ব্যায়াম করা, স্নান করা এবং কোদাল দিয়ে মাটি কোপান চালু করেন। বিকেলে নিয়মিত অন্য খেলাধুলা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ইত্যাদিও চালু করেন। তাছাড়া লাঠি খেলা, ছোরা চালনা, সাঁতার কাটা, বেড়াতে বেরনোও ছিল। জাপান থেকে দুজন জুডো বা জুজুৎসু শিক্ষক নিয়ে আসেন— ছাত্রদের বলিষ্ঠ করে তোলার জন্য। অনুমান ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নিজের উদ্ভাবিত Perception games চালু করেন। মাস ড্রিল, মৃদঙ্গ সহযোগে খালিহাত, ব্যায়ামও চলত। যোগাসন, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রার্থনা তো ছিলই। এই প্রসঙ্গে দুটি-তিনটি চিঠির উল্লেখ করছি। ১৯০৪ সালে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখছেন "আমার মনে হচ্ছে ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্য কিছুমাত্র ভাবতে হয় না যদি তাদের best sauce-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব কষে পরিশ্রম করিয়ে ক্ষুধার মুখে সাধাসিধা খাবার দিলে সেটা রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর হবেই। পূর্বে ওরা যখন সকালে বিকালে খুব কষে কোদাল পাড়ত তখন খাবার নিয়ে খুঁত খুঁত করত না এবং মোটা রুটি ও ডাল আশ্চর্য পরিমাণে খেতে পারত। ওদের শরীর তখন এখনকার চেয়ে ভালো ছিল। আমার তাই মনে হচ্ছে সকালে কোনো-এক সময়ে অন্তত দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখবেন। বিকালে যেসব ছেলে ফুটবল না খেলবে তাদেরও এইরকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ পরিশ্রমকালে বা বেড়াতে-বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে কোন অসুখ করে না, বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। দুই-একজন ছেলের এক-আধদিন একটু-আধটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ কড়া রৌদ্রটা খালি মাথায় ভালো নয়, রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তাহলে কোন ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি গা ভালো করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের সম্ভাবনা নেই। অবশ্য সতর্ক হ'তে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসায়। দু-একটি করে ছেলেকে সঙ্গে ক'রে বেড়াতে নিয়ে যাবেন— বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুত পদচালনা করে চলবেন— দুচার দিন এমন করলেই রৌদ্র বৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে বেড়ানোটা নানাকারণে বিশেষ হিতকর।" পরের চিঠিতে আবার লিখছেন "ছেলেদের ব্যায়াম সম্বন্ধে একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েছিলুম। Skipping জিনিসটা অত্যন্ত ভালো। প্রত্যেক ছেলেকে একটা Skipping rope করে দেবেন। বর্ষার সময় ঘরেও Skip করতে পারে। সুরের সঙ্গে তালে-তালে Skip করাই হচ্ছে দস্তুর। কোন এক সময়ে আপনাদের গাইয়েকে দিয়ে দ্রুত তালের গান জুড়ে দিতে পারেন, সেইসময় সার বেঁধে ইস্কুলের ছোট-বড়ো সমস্ত ছেলে তালে-তালে Skip করলে বেশ হয়।"

১৯০৪ সালের শেষের দিকে ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখছেন "তীব্র শীতের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইসময় ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি একটু বিশেষ সতর্ক হইবেন। স্নানের সময় আপনারা কেহ উপস্থিত থাকিয়া ইহাই দেখিবেন যে স্নানের সময় তেল মাখিতে জল ঢালিতে কেহ যেন অনাবশ্যক বিলম্ব না করে। তেলটা খোলা হাওয়ায় না মাখিয়া ঘরে মাখিলেই ভলো হয়— সেইসময় ভলো করিয়া যেন গা ঘষে। এমন করিয়া গা ঘষা আবশ্যক যাহাতে কিছু পরিশ্রম ও শরীরের উত্তাপ সঞ্চার হয়। তাহার পরে দ্রুত আসিয়া জল ঢালিয়া খসখসে তোয়ালে দিয়া গা বেশ করিয়া ঘষিয়া ফেলে। উপাসনা বস্ত্রের সঙ্গে একটা গরম কাপড় পরা বিশেষ দরকার। স্নানের পর ঠাণ্ডা লাগানো কোনমতেই হিতকর নহে। সত্যকে বলিবেন সকল ছেলেকেই প্রাতে ঘর হইতে বাহির করিয়া পাঁচ

মিনিটকাল breathing exercise করানো আবশ্যক— তাহা হইলে কাশির আশঙ্কা অনেক কমে। ছেলেদের সর্দি হইলেই রাতে পায়ের তেলোয় গরম সর্ষের তেল মালিশ করানো উচিত।”

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের মূলতত্ত্ব স্বাধীনতা ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মোচন। ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরনির্ভর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন রবীন্দ্রনাথ আকাঙক্ষা করতেন। বিদ্যায়তন সেই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রমাত্র। তাঁহার স্বদেশীসমাজ ও পল্লীসমাজ প্রবন্ধে স্বাস্থ্যচর্চার খেলাধূলার কথা বেশ জোর দিয়ে বলা ছিল। ব্যায়ামশালা, খেলার মাঠের কথাও ভেবেছেন। তিনি মনে করতেন “দেশ মানুষের সৃষ্টি দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়, মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, মানুষের তৈরী।” তার পথে চললে আজ হয়তো এশিয়ান গেমস্ বা অলিম্পিক গেমস্ থেকে পদক না পেয়ে এত অনুশোচনা করতে হত না।

তিনি মানতেন মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকলপ্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে এবং পরস্পর সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে। বললেন “দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে-সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার ও প্রবাহ বেগ পায় না। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোন-না-কোন হাতের কাজ যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজে শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এইরকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে। দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ করে নেয়। সে অসম্পূর্ণ মানুষ, এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে। দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে— এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উভয়ের মধ্যে ভালোরকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবন ছন্দ-ভাঙা হয়ে যাবে।”

তাই তিনি তৈরী করলেন শ্রীনিকেতন এবং শিক্ষাসত্র। এখানে ছেলেদের রান্নাবান্না, গৃহস্থালির কাজ, বাগান করা, তাঁত বোনা প্রভৃতি করতে হ'ত। পড়াশোনা থেকে হাতের কাজ সুকুমার কলাচর্চা থেকে ঘরদুয়ারের কাজ, নৃত্যগীতাদি থেকে শরীরকে কর্মঠ শক্তিশালী করার শিক্ষা দেওয়া হ'ত। শিক্ষাসত্রের দু বৎসর পরীক্ষার পর সন্তোষচন্দ্র লিখছেন “Physical vitality was our first concern. The gain of the boys in height, weight and strength has been very remarkable” কবির আদর্শ ছিল শিক্ষাসত্রে ছাত্ররা যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পাবে, তার দ্বারা তারা যে কেবল আপনাদের জীবিকা অর্জন করবে তা নয়, তারা গ্রামে গিয়ে উন্নতি করতে পারবে, তারা হবে village leaders. রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মানুষের জীবনকে তার জীবিকা থেকে বড়ো করে দেখে নি। তাই বলে জীবিকার সমস্যাকেও শিক্ষাদর্শ থেকে বাদও দেননি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাদর্শে শরীরচর্চা, খেলাধূলা, শরীরশিক্ষা এবং হাতে-কলমে শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যতই অটোমেশান, কমপিউটারাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন ঘটুক মানুষের শরীর কয়েক হাজার বৎসর আগে যা ছিল আজও প্রায় তাই আছে। সুতরাং এই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে শরীর-শিক্ষা খেলাধূলাকে নিতেই হবে। নইলে অতি কাজের ধকল যেমন সইতে পারবে না তেমনি কম কাজের জন্য যে ক্ষয় তা রোধ করতেও পারবে না। তাই আজ রবীন্দ্র-শারীরশিক্ষাদর্শ ভীষণ দরকার এবং প্রয়োজনীয়।

সবশেষে একটা ঘটনা দিয়ে শেষ করি। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে Basic National Educationএর syllabus তৈরী করার জন্য কবির মত চাওয়া হয়। কবির মত ছিল শিক্ষার মধ্যে ক্রীড়ার স্থান বড়। কিন্তু দেখা গেল অধিবেশনে প্রকাশিত syllabus-এ কিন্তু ক্রীড়াকে Extra curricular activity করা হল। পরবর্তীতে ভারত স্বাধীন হবার পরও ঐ মতই ছিল। বহু পরে WHO, UNISCO ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংগঠনের চাপে এবং সরকারী কিছু কমিশনের চাপে সরকার মত বদল করে। তাই আজ আমরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক,

কলেজ স্তরে শরীরশিক্ষাকে পাচ্ছি। দুর্ভাগ্য আরও কবি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানেও তাঁর মত মানাতে পারেন নি। বৎসর তিনেক আগে এই শিক্ষাসত্রই প্রথম শারীরশিক্ষাকে Additional হিসাবে চালু করার পথ দেখায়। পরে তা অন্য প্রতিষ্ঠান মানে। আমি শিক্ষাসত্রের পরিচালকমণ্ডলীকে অনুরোধ করব আপনারা আবার চেষ্টা করুন এই শারীরশিক্ষাকে Compulsory subject-এর মর্যাদা দেবার জন্য। তাতে যেমন রবীন্দ্রনাথের মতামত গুরুত্ব পাবে, সঙ্গে-সঙ্গে আগামী শতাব্দীর প্রস্তুতিও নেওয়া যাবে।

সেকালের আশ্রম বিদ্যালয়

দেবরাজ ভকত
নবমশ্রেণী, শিক্ষাসত্র

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে যে-ভাবে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন তার উল্লেখ পাওয়া যায় 'জীবনস্মৃতি'তে। তিনি বলেছেন যে, তাঁর থেকে বয়সে বড় ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ যখন স্কুলে ভর্তি হ'লেন তখন তিনি স্কুল থেকে বাড়ী আসা-যাওয়ার প্রতিদিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেশ রঙ চড়িয়ে বলতেন। তাঁর মজাদার কথা শুনে কবিও স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তাঁর ব্যাকুলতা দেখে তাঁকে অকালে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে' ভর্তি করা হ'ল। কিন্তু তিনি সেখানে বেশীদিন থাকতে পারেন নি। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়াশুনা ক'রতে তাঁর ভালো লাগত না। তাই কোনও স্কুলই তাঁর মনকে কোনওভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। কোনও বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে পড়াশুনা ক'রতে তিনি ভালোবাসেন নি। সেই স্কুলগুলির একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা, একঘেয়ে পরিবেশ তাঁর মনকে যেন তাড়া ক'রত। সেখানকার শিক্ষক এবং ছাত্ররাও তাঁর মনের অনুকূল ছিলেন না। সবকিছুই যেন অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে লাগল। তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশ, যেখানে পাখীদের কাকলি, তরুলতার স্নিগ্ধ ছায়া বিরাজমান তিনি সেখানেই তাঁর সময় কাটাতে চাইতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে সেই সুযোগ লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ঘটে নি। তাই তিনি আমাদের কথা চিন্তা ক'রে স্থাপনা করলেন আধুনিক যুগের তপোবন-স্বরূপ শিক্ষানিকেতন শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়। তাঁর মনের মধ্যে তপোবনের আশ্রমে থেকে পড়াশুনা করার ইচ্ছা সুপ্ত অবস্থাতেই ছিল। পরে যখন সুযোগ এল তখন তিনি তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়কে বাস্তবে রূপান্তরিত ক'রে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেই আশ্রম-বিদ্যালয়ে বর্তমানে আমরা পড়াশুনা করবার সুযোগ পেয়েছি।

প্রমথনাথ বিশীর লেখা, "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" গ্রন্থে আমরা সে-যুগের আশ্রমের কিছু খণ্ডচিত্র পাই। আশ্রম-বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিক্ষকতা ক'রতেন। ছাত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে, একাত্ম হয়ে তাঁর মনের ভাব তিনি ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কয়েকটি নিয়ম-কানুন ছিল। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ছাত্রদের সমবেতভাবে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ ক'রতে হ'ত। এরপর সারবন্দীভাবে জলযোগের জন্য রান্নাঘরে যেতে হ'ত। এরপর লেখাপড়ার পালা।

সেকালে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের পড়াতে বসতেন। মাঝখানে তিনি থাকতেন এবং তাঁর চারপাশে কয়েকটি ছাত্র। তিনি শিক্ষাদানের সঙ্গে-সঙ্গে রসিকতাও করতেন। তিনি শিশুমনের সঙ্গে সমসূত্রে নিজেকে অনায়াসে স্থাপন করতে পারতেন।

পড়াশুনার মাঝখানে তিনি কখনও-কখনও ছেলেদের নিয়ে গল্পগুজব করতেন এবং নানারকম খেলার উদ্ভাবন করতেন। কোনোদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ছাত্রদের ঘরে ঢুকে পড়তেন এবং তাদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কাটাতেন। একটা খেলা তিনি খেলতেন। একে মিলের খেলা বলা যেতে পারে। একটা শব্দ তিনি মনে ভাবতেন। সেই শব্দের সঙ্গে মিল রেখে অন্য একটা শব্দ ছাত্রদের বলতে হ'ত। তিনি বুঝেছিলেন পড়াশুনার ফাঁকে একটু আনন্দেরও প্রয়োজন আছে। তাই তিনি ছাত্রদের নিয়ে এইরূপ মজাদার এবং আনন্দদায়ক অনেক খেলা খেলতেন।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের শারীরিকভাবে পীড়নের কোনো নিয়ম ছিল না। যদি কোনো ছেলে বিশেষ কারণে শিক্ষকের কাছে মার খেত, তবে কেউ কিছু মনে ক'রতেন না। কারণ, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে যে যথার্থ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাতে মারের দাগ মনের মধ্যে পৌঁছত না। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যেন নাড়ীর টান ছিল। মা যেমন

তাঁর পুত্রকে বকাবকি ক'রলে বা মারলে পুত্র কিছু মনে করে না তেমনই গুরুরা যদি ছাত্রদের মারতেন বা বকতেন তবে তারাও কিছু মনে ক'রত না। তখনকার দিনে ক্ষুদ্র এই প্রতিষ্ঠানটিতে একটি নিবিড় পারিবারিকতার ভাব ছিল। যথার্থ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই পারিবারিক চৈতন্য একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন।

পড়াশুনা করার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের খেলাধূলা করাও উচিত, এর মাধ্যমে আমাদের মানসিক শক্তি আরও দৃঢ় হয়। তাই তখনকার দিনে আশ্রম-বিদ্যালয়ে খেলাধূলা করার রীতিও প্রচলিত ছিল। শীতকালে ক্রিকেট এবং গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলার প্রচলন ছিল। তবে সবদিনই যে খেলা হ'ত তা নয়। কোনোদিন ড্রিল শিখতে হ'ত, কোনদিন জঙ্গল পরিষ্কার বা ঐ জাতীয় কোনো কাজ করতে হ'ত। এর মাধ্যমে ছেলেদের মানসিক বিকাশ ঘটারও সুযোগ হ'ত। পড়াশুনার সঙ্গে যে বাহ্যিক জগতের জ্ঞান নেওয়ারও প্রয়োজন আছে তা তিনি বেশ বুঝেছিলেন।

তখনকার দিনে পড়াশুনার সঙ্গে সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, গল্পগুজব করার জন্য একটা নির্দিষ্ট দিন বা সময় থাকত। সন্ধ্যার সময় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মীদের নিয়ে বসত সাহিত্যসভা। এসবের মাধ্যমে ছেলেদের একটু আনন্দ দেওয়া সম্ভব হত, ছেলেদের প্রতিভা বিকাশেরও সুযোগ ঘটত।

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে নিজের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম-বিদ্যালয়কে পরিপূর্ণতা দান করতে চেয়েছিলেন তাঁর সময়ে তা সেইভাবেই সফলতা লাভ করে। আমিও এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের একজন পাঠরত ছাত্র। তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা এবং বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে হয়ত অনেক তফাত আছে, তবুও আজ অবধি আমরা সেই পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হই নি। পাখীদের কাকলি, আশ্রমের নিস্তব্ধতা, নীরবতা, স্নিগ্ধ বাতাস আজও যেন আমাদের হাতের কাছে। আমরা আজও সেই প্রকৃতির সঙ্গে থেকে লেখাপড়া করার সুযোগ পাই। তাই এককথায় ব'লতে গেলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাব্যবস্থা অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানে ঠিক তেমনই আছে এবং ভবিষ্যতে ঠিক তেমনই থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষাসত্র

সঙ্গীতা ঘোষ
নবমশ্রেণী, শিক্ষাসত্র

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সভায় উপস্থিত গুরুজনদের প্রণাম জানিয়ে আমার পাঠ শুরু করছি।

১৮৯০ সালের শেষদিকে বিলেত থেকে দেশে ফিরে জমিদারী দেখাশোনার ভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যান শিলাইদহে। এখানে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হ'ল গ্রামের মানুষদের। এইসমস্ত সরলপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর হ'তে লাগল। কবি এবিষয়ে মন্তব্য করেছেন :

"... পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাই নি। এজন্য যখন আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হ'তে হ'ল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি একাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে।... কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, তখন কাজ আমাকে পেয়ে বসল।" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পল্লীজীবনের উন্নতি ঘটাতে না পারলে দেশের উন্নতি হবে না। তাই তিনি নানাভাবে চেষ্টা ক'রতে লাগলেন পল্লীর উন্নতির জন্য। পল্লীর মানুষদের সংস্পর্শে থাকাকালীন তিনি উপলব্ধি করলেন যে বাইরে থেকে সদুপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু কাজের মধ্যে সেটা ঘটিয়ে তোলা কঠিন। তিনি সংকল্প নিলেন পল্লীর উন্নতি ঘটাতে হবে। পল্লীবাসীদের মন কুসংস্কারমুক্ত ক'রতে হবে। তাদের অজ্ঞতা, অক্ষমতার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে।

শিলাইদহ পতিসরে গ্রাম-কল্যাণের কাজে তিনি সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থই হয়েছিলেন বেশী। কবির চিন্তাধারার সঙ্গে এই অভিজ্ঞতাবোধের সংযোগের পরিণতি শ্রীনিকেতন। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ সুরুল গ্রামে এক পুরনো কুঠিবাড়ী ক্রয় করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্র রথীন্দ্রনাথ সুরুল কুঠিতে কৃষি-গবেষণার কাজ করবেন। ১৯২১ সালে এল্‌ম্‌হার্স্ট সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। এল্‌ম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন চিন্তাধারায় গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এল্‌ম্‌হার্স্টের সহযোগিতায় ও আমেরিকার ভদ্রমহিলা মিসেস ডরোথির আর্থিক আনুকূল্যে সুরুল কুঠিকে কেন্দ্র করে পল্লীসংগঠন কাজের সূত্রপাত ঘটে। কৃষি ও গো-পালন নিয়ে সুরুল কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। প্রথমদিকে এর নাম ছিল সুরুল ফার্ম। পল্লীজীবনের সর্বাঙ্গীণ শ্রী ফিরিয়ে আনাই ছিল রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তাই সুরুল কেন্দ্রের নামকরণ হয় শ্রীনিকেতন। তিনি আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে সংযোগের অভাব বোধ করলেন। তিনি স্থির করলেন, এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা তিনি গড়ে তুলবেন, যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ। যেখানে শিক্ষক, ছাত্র, কর্মী সবাই হবে এক পরিবারের সদস্যের মতো। এই আদর্শে তিনি 'শিক্ষাসত্র' বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কবির মতে পুঁথিগত শিক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ শিক্ষা নয়। তাই তিনি শিক্ষার পাশাপাশি হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে ছাত্রদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে চেয়েছিলেন, যাতে তারাই পরে গ্রামের উন্নতিবিধান ক'রতে পারে। আশ্রমবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকেরা পুঁথিগত বিদ্যার উপরই জোর দিতেন বেশী। তাই রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন, শিক্ষাসত্রে তিনি এমনসব ছাত্র নেবেন, যাদের অভিভাবকদের তরফ থেকে পরীক্ষা পাশ করানোর কোনো দাবী উঠবে না।

কবির নির্দেশে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শান্তিনিকেতনে তাঁর নিজের বাড়িতে শিক্ষাসত্রের গোড়াপত্তন করেন। আশেপাশের গ্রামের গরীব ঘরের ছয়জন ছাত্রকে নিয়ে শিক্ষাসত্রের কাজ প্রথম শুরু হয়। এঁরা হ'লেন— অতুলচন্দ্র ঘোষ, বেণুকর ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ সাহা, চিত্তরঞ্জন কর, কিরীটী কর এবং রামেশ্বর লাল। এঁরা সন্তোষচন্দ্রের বাড়িতে একটি খড়ের চালাঘরে থাকতেন। ১৯২৬ সালে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের অকালমৃত্যুর পর ১৯২৭ সালে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে আসে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, শিক্ষাসত্রে গ্রামের ছেলেদের জন্য শিক্ষার

রুটিন্ শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের ছেলেদের রুটিনের মতো হবে না। তাদের পরীক্ষা পাশ ক'রতে হবে না। তাদের তিনি দেবেন হাত-কলমে পূর্ণ শিক্ষা। তিনি চেয়েছিলেন, শিক্ষাসত্রে শিক্ষা পাবার পর ছাত্ররা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিজেরাই বেছে নেবে। কবির ইচ্ছায় ছাত্ররা বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে সম্পন্ন ক'রত। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, ফুলের ও সব্জীর বাগান করা, মুরগীপালন ও গো-পালন করা ছাড়াও নিজেদের পরনের জামা ও পাজামা নিজেদের হাতে তৈরী ক'রত। এইসব কাজের সঙ্গে চলত নানারকম সাধারণ জ্ঞান ও পড়াশুনার কাজ। এছাড়া চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষের নিমিত্ত নাটকের অভিনয়, গান, ছবি ইত্যাদি কলার চর্চা হ'ত। পড়াশুনা চ'লত গাছের তলায় মাটিতে নিজেদের হাতে তৈরী আসন পেতে। ছাত্ররা যখনই কোনো গ্রামে যেত সেই গ্রামের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ক'রত নিজেদের উৎসাহে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং সন্ধ্যায় দিনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের পর সমবেতভাবে উপাসনা ও মন্ত্রপাঠ করা হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন চিত্তের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ছাত্ররা দেহের কর্মশক্তি ও বিচিত্রকাজের ভিতর দিয়ে নিজেদের প্রকাশ করুক। এজন্য তিনি ছাত্রদের বিবিধ কাজে লিপ্ত থাকতে বলেছিলেন। যেমন, কাঠ, মাটি, শস্য প্রভৃতির পরিজ্ঞান ও পরিমাণ সংগ্রহ করা, পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার ও ফল লিপিবদ্ধ করা। কারণ তিনি গাছপালা, পশুপাখী, গ্রামের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে ছাত্রদের অনভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত ক'রতে চেয়েছিলেন। এছাড়া ছাত্রদের ভ্রমণের দ্বারা কর্মক্ষম ও ক্লেশসহিষ্ণু হওয়া, নানাস্থানে লোকযাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন ও রক্ষাযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করা, উদ্ভিদ, কৃষি ও আবহবিদ্যা এবং ডাক্তারের সাহায্যে শরীর ও যন্ত্রাধ্যক্ষের সাহায্যে যন্ত্রশিক্ষার চর্চা করা, ঘর তৈরী, ঘর মেরামত, ছুতোরের কাজ, তাঁতের কাজ শেখা ছাড়াও গৃহস্থ জীবনের যাবতীয় কার্যাবলী অনুধাবন ক'রে বিনয়, শৃঙ্খলা, দয়া ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের সচেতন হ'তে হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন প্রকৃতির সান্নিধ্যে। তাই পড়াশুনা এমনকি সাগিত্যসভা, ঋতু-উৎসব, নাটক-অভিনয়, সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান, অভ্যর্থনা ইত্যাদি নানারূপ সভাসমিতি উৎসব হ'ত আকাশের তলায় বা বাগানের ছায়ায় মাটিতে।

এরপর ১৯৫৪ সালে বালিকা বিদ্যালয় যেটা ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শিক্ষাসত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে একত্রে বর্তমানে 'শিক্ষাসত্র'রূপে পরিচিতি লাভ করে। এরপর থেকে যাবতীয় কাজ ছাত্রছাত্রীরা মিলিতভাবে করত।

এমনি করে শত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বর্তমানে শিক্ষাসত্র এক বিশাল কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছে। বর্তমানে শিক্ষাসত্রে হয়ত অনেক পরিবর্তন এসেছে কিন্তু এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী অনেকখানি সময়। তবুও শিক্ষাসত্র তার পূর্ব ঐতিহ্য সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে নি এখনও। রবীন্দ্রনাথ যেসমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন, সেগুলি এখনও নিয়মিতভাবে পালিত হয়। ভ্রমণ, বনভোজন, সাহিত্যসভা প্রভৃতি নিয়মিত সুসম্পন্ন হয়। মাঝে কয়েকবছর গ্রামপরিদর্শন বন্ধ ছিল। কিন্তু এবছর তা পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা আছে। এছাড়া শিক্ষাসত্র N.C.C. প্রশিক্ষণ ও ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের এবিষয়ে সচেতনতা অনেকখানি কমে গেছে। এরকম চলতে থাকলে শিক্ষাসত্রের আদর্শ বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

শিক্ষাসত্রের মূল আদর্শকে মনে রেখে আমাদের সবাইকে চ'লতে হবে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ যাতে বজায় থাকে তার জন্য ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রত্যেককেই সচেতন থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই বিদ্যালয় অন্য পাঁচটা বিদ্যালয়ের মতো নয়। এর আলাদা ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্য বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব আমাদের সবাইকেই বহন ক'রতে হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিজয় দাস, মহঃ মজহারুল হামিদ, অদিতি বসু, আলোক সেনশর্মা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অনির্বাণ রায়, মেঘমিত্রা মাহাতো, দীপান্বিতা ঘোষ, শ্বেতা মুখোপাধ্যায়, মোম মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য যাঁরা আলোচনা-চক্রের ভাষণগুলি যথাযথভাবে মুদ্রণের কাজে নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।
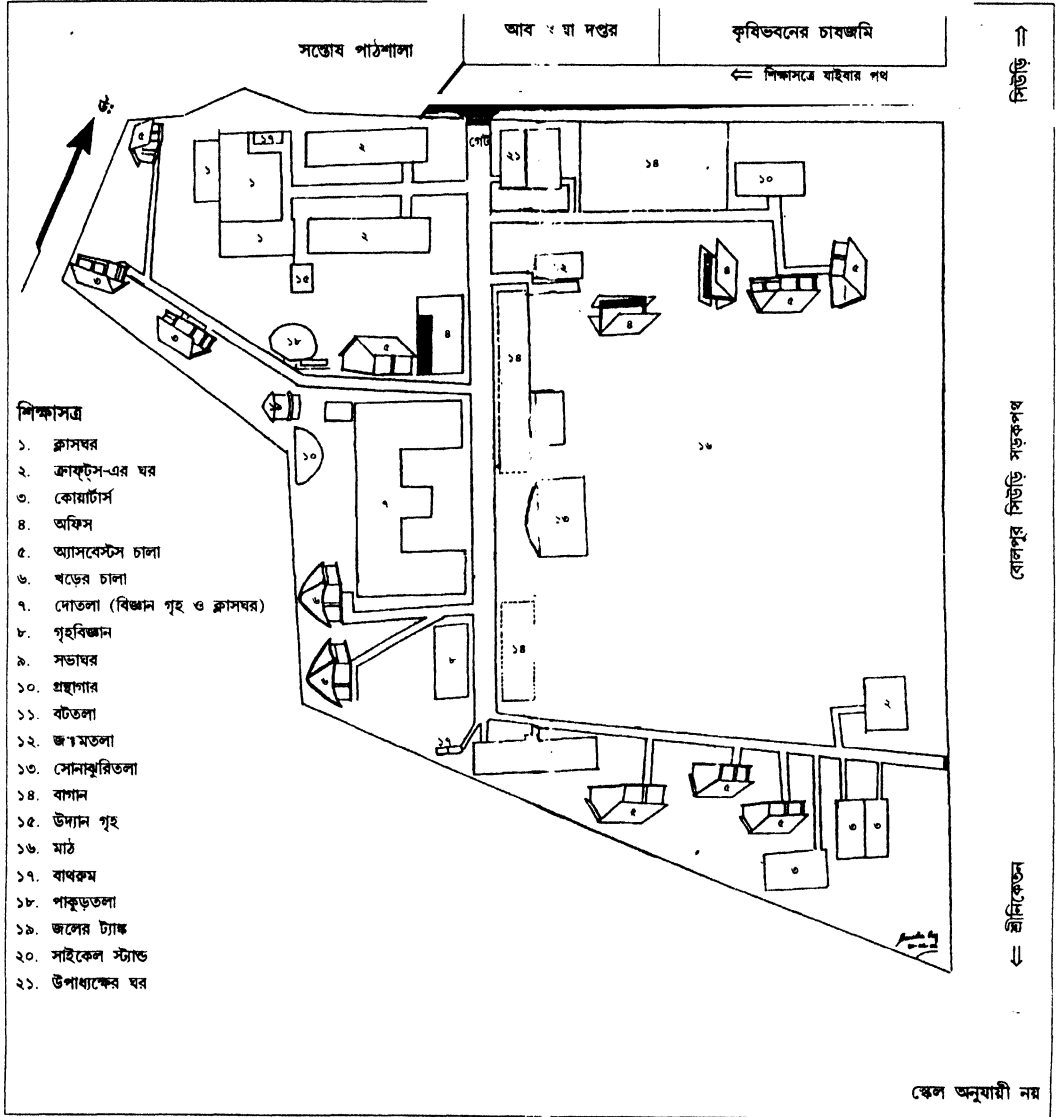
শঙ্খমিত্র রায়
দশম শ্রেণী (২০০১)

"Thank you very much indeed for your kindness in sending me your two distinguished publications. I can see at once that the collection for your sixty year anniversary has been put together with great care and will be a boon to historians, while the other collection of popular scientific essays will be widely appreciated as a pioneering effort..."

Ashin Dasgupta
Director, National Library.

"... আপনার প্রেরিত 'শিক্ষাসত্র' স্মারক-গ্রন্থটি পেলাম। দেখে মনে হ'ল রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সম্পর্কে এইটি একটি আকরিক গ্রন্থের স্থান নিতে পারে। সুন্দর হ'য়েছে। উদ্যোক্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বইটির বহুল প্রচার প্রয়োজন।

শিক্ষাসত্রের মূল আদর্শ শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়ের 'প্রাক্ কথনে' সুস্পষ্ট হ'য়েছে। আপনার নেতৃত্বে এই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ্যপূরণের দিকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হোক্ এই কামনা করি।..."

হিমাংশু মজুমদার

"... বহু পরিবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিক্ষাসত্র অদ্যাবধি এগিয়ে চ'লেছে। ১৯৮৪ সালে শিক্ষাসত্রের ষাট বৎসর পূর্ণ হ'ল। ষষ্টিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'শিক্ষাসত্র' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ ক'রেছেন। একটি অতি শোভন রুচিরোচন প্রকাশন। এ হ'ল বহিরঙ্গের কথা এর অন্তরঙ্গ পরিচয় আরোও হৃদয়গ্রাহী। বহু মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ এই স্মারকগ্রন্থটি। জন্মকাল থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাসত্রের বিচিত্র ইতিহাস এর মধ্যে বিধৃত আছে। তারও চাইতে মূল্যবান, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসত্র সম্পর্কে প্রবন্ধে চিঠিপত্রে যখন যা ব'লেছেন, তার সমস্তই এখানে সংকলিত হ'য়েছে। এছাড়া যাঁরা এককালে শিক্ষাসত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যাঁরা যুক্ত না হ'য়েও ভক্ত এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই উক্তি এই গ্রন্থে সংকলিত হ'য়েছে। এদিক থেকে এটিকে অতি মূল্যবান ডক্যুমেন্ট বলা যেতে পারে এবং সেই হিসাবে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন-প্রেমিকদের ঘরে-ঘরে সংরক্ষণের যোগ্য।..'

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

'... আজ শিক্ষাসত্রের ষষ্টিবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ পেলাম। অশেষ ধন্যবাদ। এইরকম একটি বইয়ের প্রয়োজন খুবই ছিল। এই স্মারক গ্রন্থ থেকে আমি অনেক উপকৃত হব।...'

পান্নালাল দাশগুপ্ত